প্রকাশক
ডি. মেহরা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ
ছি পাই-শ্র
এবং
নবেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৬।

মুদ্রক
দ্বিজেন বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

সূচিপত্র

ভূমিকা		[৭]
আশীর্বাদ	লু শুন	১
খুং ই-চী	”	২৫
এসে গেল	”	৩১
ওষুধ	”	৩৩
বিবাহচ্ছেদ	”	৪৪
লেমনেডওয়ালা	চৌ ৎসো-রেন	৫৬
কাঁটালতা	য়্যু তা-ফু	৬০
আত্মহত্যা	মাও-তুন	৭৮
জীবনে হতাশ্বাস এক বন্ধুকে লেখা	শ্যু চ্র-মো	৯৩
আমার আদর্শ পরিবার	লাও-শ	৯৭
সন্তান লাভের পর	”	১০২
বাঁদী-মা	রৌ শ্র	১০৯
স্বামী	শেন ৎসুং-ওয়েন	১৩৪
বন্যা	তিং লিং	১৫৬
আ আও	শুন শি-চেন	১৬৭
সরাইখানা	লি কোয়াং-থিয়েন	১৮১
ধর্মান্তর	শিয়াও ছিয়েন	১৮৬
লাল মাছ	শ্যু মাও-ইউং	২০৩
বাঘা	তুয়ান-মু হুং-লিয়াং	২০৬
আমার কাকা ও তাঁর গরু	ইয়ে চুন-চিয়েন	২২৩
অনুবাদক পরিচিতি		২৩৩

ভূমিকা

চীনদেশের আধুনিক কালের বিখ্যাত রচয়িতাদের লিখিত গল্প এবং রম্যরচনার একটি সংগ্রহ আজকের দিনের বাঙালী পাঠকমণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দেবার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমার মনে হয়। হিমালয়ের উত্তরে আমাদের পড়শী প্রকাণ্ড চীনদেশ। গত কয়েকশ' বছর ধরে এদের সম্বন্ধে কোন খবরই আমরা রাখতুম না—তার ফলে চীনের মানুষকে আমরা এমনই ভুল বুঝতুম যে তার আর কোনো ক্ষমা নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে চীনা মানুষকে চেনবার ও তার সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকে জানবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চীনভবন স্থাপন করেন। চীনদেশকে গভীরভাবে জানবার প্রচেষ্টা এখানে এই প্রথম। অন্য অনেক কিছুর মতো এদিক দিয়েও বাংলাদেশ ভারতের অগ্রণী এটি আমাদের বিশেষ গর্বের বিষয়।

চীনা সাহিত্যের নিদর্শন রূপে যে-রচনাগুলি এই সংগ্রহে দেওয়া হল সেগুলিকে অনুধাবন করে পাঠক চীনা আধুনিক সাহিত্যের গতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবেন বলে আমার বিশ্বাস। চীনের মানুষকে ভুল বোঝার পর্দাও এরই দ্বারা অনেকখানি উন্মোচন হবে। উপরন্তু গল্প-সাহিত্য ও রম্যরচনার জগতে প্রবেশ করা মাত্র চীনা লেখকেরা কি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্বের দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন তা দেখে চমৎকৃত এবং তাঁদের সৃষ্ট রসে পূর্ণপাত্র আকণ্ঠ পান করে পাঠক পরিতৃপ্ত হবেন।

স্নেহভাজন অমিতেন্দ্র আর আমি যে-রচনাগুলি এই গ্রন্থে সংযুক্ত করেছি সেগুলি আমাদের উভয়ের ভালো লেগেছে বলেই করেছি। এ-ছাড়া এদের বাছাই-এর আর কোনো মানদণ্ড নেই। অমিতেন্দ্র পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা লাভ করে ভারতে ফিরে উক্ত চর্চ্চাকেই উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই কারণে অনেকগুলি লেখা মূল চীনা থেকে অনুবাদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। যে-লেখাগুলি ইংরেজী থেকে অনূদিত হয়েছে তারও অনেকগুলি মূল চীনা পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছি আমরা।

আধুনিক চীনা সাহিত্যের ইতিহাস মাত্র ত্রিশ বছরের। অথচ এই সামান্য সময়ের মধ্যেই সেই সাহিত্য পৃথিবীর সমকালীন যে-কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের তুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রচনাগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, সমসাময়িক ঘটনার ছাপ এই লেখাগুলির উপর স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। প্রায় সব লেখকই তাঁর চারপাশের দৈনন্দিন ঘটনাগুলিকেই বেশী করে বুঝতে চেয়েছেন, প্রকাশ করতে চেয়েছেন ; যার ফলে চীনা গদ্য সাহিত্যে আজ ভাবালুতার স্থান একেবারে নেই। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যে-দুজন লেখক এই প্রত্যক্ষবাদের বিরোধিতা করেছিলেন শ্যু তি-শান ওরফে লো হুয়া-শং ও শ্যু চ্র-মো, তাঁদের একজনের একালের লেখা একটি রম্যরচনা এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যে ভাবালু কাব্যের স্থান নেই এই ঐতিহাসিক সত্য যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে সেই সত্য যে চীনা সাহিত্যিকেরা আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের অনেক আগেই জেনেছিলেন এটাই আশ্চর্য করে। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে খুং-ই-চী বা বন্যা-র মতো গল্প লেখা চীনা রচয়িতার পক্ষে এই জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। এই ছোট্ট গল্পগুলির মধ্যে বিরাট চীনদেশের সবটুকুই যেন ধরা পড়েছে।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চীনা লেখকেরা বিদেশী ছোট গল্পের তর্জমা দিয়ে হাত মক্‌সো করতে শুরু করেন। জাপানী, রুশ, ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী সাহিত্য থেকে যাঁরা অনুবাদ করতেন তাঁরা বেশীর ভাগই ইয়োরোপ অথবা জাপান-ফেরত। ঠিক এই সময় চীনদেশে ভাষা-সংস্কারের এক প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। চীনের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো তাদের পণ্ডিতী ভাষা বহুকালই চীনদেশের অগ্রগতি, সংস্কার এবং প্রকর্ষের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চল্‌তি কথ্য-ভাষার সংগ্রাম যখন জয়ী হল, ‘পাই-হুয়া’ ভাষা যখন সাহিত্যের কোঠায় উঠল, ঠিক তখনই চীনা ছোটগল্পের লেখকদের মধ্যে যে অভিনব উন্মেষ দেখা গেল তাতে করে সারা পৃথিবীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেই দিকে।

অনুবাদ-সাহিত্যের প্রভাবেই যে চীনদেশে ক্রমে এক স্বতন্ত্র গল্প-সাহিত্য গড়ে উঠেছে এটাও যেমন ঠিক, তেমনি আবার চীনের যুগ-যুগান্তরের ঐতিহ্যে পুষ্ট দেশজ গল্প-উপন্যাসের যে-সুগভীর বুনিয়াদ ছিল তা না থাকলে কোনো উন্মেষই সম্ভব হত না এটা আরো সত্য।

অমিতেন্দ্রের মতে—“প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীর

গোড়া অবধি চীনদেশে গল্প লিখিয়েদের স্থান সাহিত্যের আসরে ছিল না। চীনের সাহিত্য-সিংহাসনের উপর একাধিপত্য ছিল কবি এবং নিবন্ধ-রচয়িতাদের। অথচ এরই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মুখে-মুখে নানা গল্প দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে কথিত হত। প্রাচীন ঐতিহাসিক ভিত্তিতে লেখা উপন্যাসের মধ্যে 'তিন দেশের কাহিনী'-র বীরগাথা, পুরাকালের যোদ্ধাদের জয়গান এখনও চীনাদের মনে উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। 'জলের ধারে' উপন্যাসের ডাকাতের দল এখনও তাদের দুষ্টের দমন আর দুর্বলের পালন নীতির সমর্থক চীনদেশে পাবে। শোয়ান চোয়াং-এর ভারত-ভ্রমণের বৃত্তান্ত নিয়ে লেখা 'পশ্চিম তীর্থ'-র রূপক পৃথিবীর যে-কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে স্থান করে নিতে সক্ষম। পু শুং-লিং-এর লেখা আলৌকিক কাহিনী 'লিয়াও চাই-এর গল্প-সংগ্রহ' তার ভাষার মাধুর্যে ও রচনাশৈলীর প্রখরতায় চীনা সাহিত্যের একটি সুমহান সৃষ্টি বলে স্বীকৃত। 'লাল প্রাসাদের স্বপ্ন' উপন্যাস-টিতে তার চারিশত চরিত্রের ভিতর দিয়ে লেখক যে সমাজ-চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন তার কিয়দংশও যদি আধুনিক কালের ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের লেখায় ধরতে পারতেন তবে আমরা তাঁদের ঔপন্যাসিক ছাড়াও সমাজ-সংস্কারক বলতে দ্বিধা করতেম না। 'পণ্ডিতদের অদ্ভুত ইতিহাস' তার শ্লেষ আর ব্যঙ্গের বাণে প্রাচীন চীন সমাজের তথাকথিত পণ্ডিতদের যে কি নিদারুণ আঘাত হেনেছিল তা আজও বইটির প্রতি ছত্র থেকে বোঝা যায়। এই দেশজ গল্প-সাহিত্যের ধারা যদিচ রাজভবন গ্রন্থাগারে বড় একটা আমল পায়নি, তবু সেটা বজায় ছিল সম্পূর্ণ তার জন-আকর্ষণের উপর।

"১৯১৯ সালের '৪ঠা মে' আন্দোলনের পর কথ্যভাষা যখন পুরাকালের পণ্ডিতী ভাষাকে চীনা সাহিত্যের আসর থেকে সম্মার্জনীর সাহায্যে বিদায় করে দিল, তখন এই সব পুরাকালের উপন্যাস, মুখে-মুখে-চলা গল্প, সাহিত্যের ঘরে তাদের যোগ্য আসন অধিকার করে নিলে। এইগুলিই হল চীনা আধুনিক গল্প সাহিত্যের ভিত্তি। এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পড়েছে বিদেশী গল্পের ছাপ। অনুবাদ সাহিত্য চীনদেশের আধুনিক সাহিত্যের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে সেটা শুধু বহিরাবরণ। আধুনিক চীনা সাহিত্যের যে প্রাণস্পন্দন আজ আমরা শুনছি তার জীবন-গ্রন্থি বাঁধা আছে পুরাযুগের চীনা-কথকদের গল্প উপন্যাসের মধ্যে।"

এই পুস্তক প্রণয়নে আমরা শ্রী সিয়াও লিং উ ও শ্রীমতী পার্ব্বতী উ-র

কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তার জন্যে তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এই দম্পতীটি এক সময়ে শান্তিনিকেতনে চীনভবনে ছিলেন। অধুনা পেইচিং-এ চীনা বিজ্ঞান সমিতির সাহিত্য বিভাগে নিযুক্ত।

আর শেষ কথা, অমিতেন্দ্র আমার সঙ্গে না লাগলে আমি এ-কাজের মধ্যে প্রবেশই করতে পারতুম না। তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

খুব কম বয়স থেকে লেখার চর্চা করে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। শিশুদের জন্যে লেখা তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় এবং সেই থেকেই তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু বলা চলে। ইনি নিয়মিত লিখে আসছেন ‘মৌচাক’ ও অন্যান্য কিশোর পত্রিকায়। এঁর সাহিত্য প্রতিভা কিছুটা পুরুষানুক্রমিক এ-কথা বল্‌লে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ, পিতা ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন স্বনামধন্য কথাশিল্পী এবং মাতামহ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশিষ্ট সাহিত্য ও শিল্পরুচির পরিবেশে পুষ্ট এঁর লেখনী।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে সেখানকার স্ট্যাটিসটিক্‌স-এর ডিগ্রি গ্রহণ করে প্রত্যাবর্তন করেন। বর্তমানে ইনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত।

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র এবং শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতামহের সাহিত্যিক সংস্কৃতির অধিকারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর শিক্ষা শেষ করে অমিতেন্দ্রনাথ চীনদেশে গমন করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত চীনদেশের পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। চীনদেশ থেকে ফেরবার পর ইনি কিছুকাল ভারতের জাতীয় সামরিক অকাদেমীতে এবং পরে বিশ্বভারতীতে চীনাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। কিছুদিন হলো আমেরিকার পেনসিল্‌ভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও চীনাভাষায় অধ্যাপনার কাজ নিয়ে ইনি ভারতবর্ষের বাইরে রয়েছেন। চীনা সাহিত্য থেকে বহু গল্প ও কবিতার অনুবাদ এবং চীনা সাহিত্য বিষয়ে এঁর বহু প্রবন্ধ বাংলা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি নূতন দিল্লীর সাহিত্য অকাদেমী এঁর অনূদিত লাও-ৎসর দর্শন “তাও-তে-চিং” প্রকাশ করেছেন।

আশীর্বাদ

লু শ্যুন

(১৮৮১-১৯৩৬)

ল্যু শ্যুন ছদ্মনাম। এই সুবিখ্যাত চীনা সাহিত্যিকের প্রকৃত নাম চৌ স্থ-রেন্। চেচিয়াং প্রদেশে শাও শিং নগরে এক প্রাচীন বিদ্বৎ-বংশে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম। শিশুকালে চৌ স্থ-বেন্ উচ্চশ্রেণীর চীনা-সাহিত্যে শিক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর বাবার মৃত্যুতে অকস্মাৎ তাতে ছেদ পড়ে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা-ও সঙ্গীন হ'য়ে ওঠে। অনেক চেষ্টায় অনেক কষ্টে লূ শ্যুন নানচিং-এর স্কুলে ভর্তি হন। চীনদেশেব পড়া শেষ ক'রে তিনি জাপানে যান ডাক্তাবি পড়তে। চৌ স্থ-বেন্ কিন্তু ডাক্তাবি করলেন না, করলেন শুরু শিক্ষকতা। সেটা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ। শিক্ষা-সচিবেব বিভাগে তিনি সবকাবী চাকরী নেন এবং একই সময়ে পেইচিং-এর তিনটি বিশ্ববিদ্যালযে পড়াতে থাকেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনার ভারও তিনি পেয়ে যান এবং বহু জার্মান, রুশ ও জাপানী বই তর্জমা করেন্। এই সময়কার তাঁর বৃহত্তম অবদান সুবিখ্যাত 'নব যৌবন' পত্রিকার মারফৎ 'পেই-হুয়া' (চলতি চীনাভাষা) আন্দোলনকে জয়-যুক্ত কবা। এব আগে পর্যন্ত পুবাতন যুগের সুকঠিন বিশুদ্ধ 'ওয়েন-লি' ছিল চীনা সাহিত্যের একমাত্র বাহন। লূ শ্যুন ছিলেন এই আন্দোলনেব পুরোভাগে। 'নব যৌবন' পত্রিকার আরম্ভ থেকেই তিনি এতে লিখেছেন। লূ শ্যুনের বই যখন সংস্করণের পর সংস্করণ হাজারে হাজারে বিক্রী হ'যে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময কর্তৃপক্ষের টনক নড়লো। ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করা এবং বিদ্রোহে প্ররোচিত কবা এই নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'লো। বন্ধুরা তাঁকে আগে থেকে সতর্ক ক'রে দেওয়ায় অ্যাময়-এ পালিয়ে গিয়ে তিনি বাঁচেন। শাংহাই-এ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

চান্দ্রমাস পঞ্জিকায় যেদিন বর্ষশেষ ব'লে ধবা হয় সেই দিনটি বছরের পক্ষে শেষ হবার সব চেয়ে উপযুক্ত সময়। অপরূপ এক আবহাওয়া সেদিন সব কিছুকে আচ্ছন্ন ক'রে বাথে, মনে হয় যেন নতুন বছর এলো ব'লে। সন্ধ্যায় আকাশে হালকা ধূসর মেঘ, তার কোলে ফুটতে থাকে হাউই বাজি, আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় তার বজ্র-নির্ঘোষ—'হেঁসেল-দেব' (১) যে স্বর্গপথে চলেছেন তাই জানিয়ে। যতই কাছে এগিয়ে আসা যায় দৃশ্যটি ততই হ'য়ে ওঠে শব্দময় আর বাতাস হ'য়ে ওঠে বারুদের গন্ধে ভরপুর।

---

(১) এই সময় হেঁসেল-দেবতা ইন্দ্রের কাছে বিগত বছরের পরিবারের ব্যবহার সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করেন। সাত দিন পরে তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

এই রকম এক রাত্রে আমি লো চিং-এ ফিরে আসি। লো চিংকে আমি বলি আমার 'দেশ' কিন্তু আসলে ওখানে আমার বাড়ি ঘর কিছুই নেই। আমি এসে উঠি আমার আত্মীয় লো সি লাও ইয়ের ওখানে। আমার এক-পুরুষ আগের মানুষ তিনি, চীনে পারিবারিক গণনা মতে এঁকে বলা উচিত 'চৌঠো খুড়ো'। ইনি হচ্ছেন একজন চিয়েন-সেং (১) আগেকার দিনের যা কিছু ভালো, যত কিছু গুণ সমস্তক্ষণ সেই বিষযেই কথা বলেন।

দেখলুম তিনি ঠিক সেই আগেব মানুষটিই আছেন, বয়স অবশ্য একটু বেড়েছে কিন্তু এখনও দাড়ি রাখেন নি। প্রণামাদি সেরে কুশল সংবাদ নেবার পর তিনি বলেন আমাকে একটু মোটা দেখছেন। এ-কথা শেষ করেই তিনি 'নয়া দলের' বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শুরু করেন। কিন্তু আমি জানি এই 'নয়া দল' শব্দটার অর্থে উনি এখনও সেই বেচারা কাং ইউ-ওই (২) আন্দোলন বুঝে থাকেন। এটা যে পুনর্জাগরণের আন্দোলন এ হয়তো উনি শোনেনেই নি। যাই হোক আমাদের দুজনেব কোনো জায়গাতেই কোনো মিল না থাকায় শীঘ্রই পড়বার ঘরে আমায় একলা রেখে তিনি চলে যান।

পরদিন উঠতে আমাব খুব দেরি হ'য়ে যায়। দুপুরের খাওয়া সেরে আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পডি। পরের দিনও একই রকম, তার পরের দিনও তাই। কেউই বিশেষ বদলায় নি, কেবল বয়স একটু বেড়েছে, আর সর্বত্রই ওরা নববর্ষের আশীর্বাদী-প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হ'তে ব্যস্ত। লো চিং-এ এটা হচ্ছে একটা বিরাট ব্যাপার, সকলেই ভক্তি দেখাবার জন্য উঠে-পড়ে লাগে, অনুষ্ঠান সারতে সারতে হদ্দ হ'য়ে যায় তারপর আশীর্বাদ-দেবতার সামনে লুটিয়ে পড়ে সামনের বছরের জন্য অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'রে নেয়। দেদার মুর্গী মারা, হাঁস কাটা হয় আর শূয়োরের মাংস কেনাবেচা চলে, মুর্গী রাঁধতে রাঁধতে মেয়েদের হাতে ফোস্কা পড়ে যায়। পরিপাটি রান্না হ'য়ে গেলে পরে বেদীর উপর সেগুলো রাখা হয়, তার চার পাশে গোঁজা থাকে 'চপ-স্টিক', ষষ্ঠ প্রহরে উৎসর্গ করার জন্য। ধূপ আর লাল মোমবাতি জ্বালা হয়, আর

---

(১) 'চীযেন-সেং' হচ্ছে 'সীউৎসাই'-এরই মতন মানসূচক উপাধি। তফাৎ এই যে 'সীউৎসাই' উপাধি শুধু সত্যিকারের পণ্ডিতদেরই প্রাপ্য আর 'চীয়েন-সেং' উপাধি টাকা থাকলে কেনা যায়।

(২) ইনি হচ্ছেন একজন পণ্ডিত যিনি মাঞ্চু রাজাদের শেষ সময়ের সম্রাট কুয়াং স্যু-র কালে নতুন একটি আন্দোলন আনতে চেষ্টা করেন। সম্রাটের মা এ-আন্দোলন দমন করেন।

পুরুষরা (মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ) প্রণাম জানিয়ে পরম ভক্তিভরে আশীর্বাদী-আত্মাকে খাবার নিমন্ত্রণে ডাকে। এই সব হ'য়ে গেলে তারপর পটকাবাজি তো আছেই।

প্রতি বছরই ঠিক এই রকম, প্রতি ঘরেই এই এক ব্যাপার—কেবল গরীব-দুঃখীদের ঘরে ছাড়া। তারা উৎসর্গের অর্ঘ্য জোটাতে পারে না, না পারে মোমবাতি আর পটকা কিনতে। এ-বছরেও ঠিক অন্যান্য বছরেরই মতো। আকাশ ঘোলাটে অন্ধকার হ'য়ে আসে—বিকেলে বরফ পড়ে—ছোটো ছোটো ফুলের মতন বরফের স্তবক চারদিকের গোলমাল হুড়োহুড়ি ধোঁয়ার মধ্যে নেচে মেতে লাফিয়ে সব কিছুকে আরও যেন বিশৃঙ্খল ক'রে তোলে। আমার ফেরবার আগেই ছাদের টালিতে টালিতে শাদার পোঁচ পড়ে যায়। আমার ঘরের ভিতরটা মনে হয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। ঘরের দেওয়ালের গায়ে কাঠের পাতে ঝোলানো বড় বড় লাল অক্ষরে একটা লেখা ঝুলছে—'দীর্ঘজীবন', বরফের আলোর প্রতিফলনে সেটাও উজ্জ্বল। এটা পুরাণ-কথিত চেন তুয়ান্ লাওৎসোর হাতের কাজ ব'লে লোকের ধারণা। দেয়াল থেকে ঝোলানো একখানা লিখন খসে পড়ে গেছে, সেটা আলগা ক'রে গুটিয়ে লম্বা টেবিলটার উপর রাখা। কিন্তু অন্য আর একটা লিখন দেয়াল থেকে এখনও যেন আমায় তিরস্কার করছে: 'বস্তুর নিমিত্ত কী তা গভীর ভাবে বুঝতে শেখো, মিতাচারী হও, মনে ও ব্যবহারে কোমল হও।' জানলার নীচে, ডেস্কের উপর, খাংসি অভিধানের অসম্পূর্ণ কয়েকটা খণ্ড, সংগৃহীত ভাষ্য-সমেত 'অধুনা চিন্তা' এক-সারি, এবং 'চতুষ্কাণ্ড'। সব দেখে শুনে মন বড় দমে যায়!

যত তাড়াতাড়ি পারি কালই শহরে ফিরে যাব ঠিক ক'রে ফেলি।

সিয়াং-লিন সাও-এর ঘটনাটাও আজ আমার মনটাকে বড় নাড়া দিয়েছে। আজ বিকেলে শহরের পুব কোণে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম, ফেরবার পথে খালের ধারে ওর সঙ্গে দেখা। ও যেমন ক'রে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে আমার কাছেই আসছে, তাই দাঁড়িয়ে গেলুম। লো চিং-এ যাদের চিনতুম তারা কেউই বিশেষ বদলায় নি, কিন্তু এই সিয়াং-লিন সাও দেখলুম আগেকার মতো একেবারেই নেই। তার সমস্ত চুল শাদা হ'য়ে গেছে, গাল এত ব'সে গেছে, মুখের রঙ এমন হলদেটে হ'য়ে গেছে যে দেখে ভয় হয়। বয়স তার চল্লিশও হয় নি কিন্তু দেখে মনে হয় একেবারে

নিঃশেষিত। যেন একটা বিষাদের মূর্তি কাঠে খোদাই করা। শুধু তার নিঃপ্রভ চোখের সঞ্চালন দেখে বোঝা যায় যে, সে এখনও বেঁচে আছে। এক হাতে তার একটা বাঁশের চুপড়ি, ভিতরে একটা শূন্য ভাঙা বাটি। নিজের দেহটাকে খাড়া ক'রে রেখেছে একটা বাঁশের লাঠির উপর ভর দিয়ে। দেখেই বোঝা যায় যে ভিখারিনী ব'নে গেছে।

আমি দাঁড়িয়ে থাকি ও পয়সা চাইবে তারই অপেক্ষায়।

“তুমি ফিরে এসেছ তাহলে?”

“এসেছি।”

“ভালো, ভালো—ঠিক সময়েই এসেছ। আচ্ছা, বলো দিকি, তুমি তো একজন পণ্ডিত, জগতকে দেখেছ, জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা দুই-ই তোমার আছে”—ওর ঝাপসা চোখে একটুখানি দীপ্তি দেখা যায়—“বলো দিকিন, আমি তোমায় কেবল একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।”

হাজারবার চেষ্টা করলেও ও কী যে জিজ্ঞেস করতে চায় আমি তা অনুমান করতে পারতুম না। একটু ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, কিছুই বলি না।

ও কাছে ঘেঁষে আসে। গলার স্বরটা খাটো ক'রে, খুব গোপনে খুব ব্যগ্র হ'য়ে বলে, “ব্যাপারটা হচ্ছে এই : মানুষ যখন মরে যায় তার পরেও কি তার আত্মা ব'লে কিছু থাকে?”

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার শিউরে উঠি। ওর চোখ দুটো আমার মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে যায়। বেশ কাণ্ড! ইস্কুলের ছেলেকে পাশে দাঁড় করিয়ে হঠাৎ পরীক্ষা করলে যত না সে বোকা ব'নে যায় তার চেয়েও বেশি বোকা বোধ করি নিজেকে। ‘আত্মা’ ব'লে কোনো জিনিস আছে কি নেই এ-নিয়ে কোনোদিন মাথাও ঘামাই নি, এ-নিয়ে বিচার বিবেচনাও বিশেষ করি নি। উত্তর দিই কী ক'রে? ওরই মধ্যে মনে পড়ে যায় লো চিং-এর অনেকে কোনো না কোনো রকম ভূতে বিশ্বাস করে, আর খুব সম্ভব এও তাই করে। হয়তো আমার বলা উচিত—এটা সন্দেহের বিষয়—কিন্তু না-থাক, তার চেয়ে ওর আশা যেমন আছে তেমনি থাকুক, সেই বরং ভালো। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ও শেষ পথের পথিক, কেন আর তার কষ্টের বোঝা বাড়াই? ওর খাতিরে না হয় স্বীকারই করা যাক।

আমি আমতা-আমতা ক'রে বলি, “হ্যাঁ, বোধ হয়—আমার মনে হয় আত্মা আছে।”

"তাহলে একটা নরকও নিশ্চয় আছে।"

"ও, নরক?" এইবার আমাকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। তাই আমাকে তখন ইস্তফার স্বরে বলতে হয়, "নরক? ন্যায়শাস্ত্রের দিক দিয়ে দেখতে গেলে নরক একটা থাকা উচিত। কিন্তু আবার নাও থাকতে পারে তো। কীই বা আসে যায় তাতে?"

"তাহলে এই নরকে পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আবার মুখোমুখি দেখা হয়?"

"হুঁ? মুখোমুখি দেখা?" এইবার বোকা ব'নে যাই। যত জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, মনের যত তৎপরতা অর্জন করেছি, সব একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে যায়। কেবল তিনটি সহজ সোজা প্রশ্ন আমাকে হতবুদ্ধি ক'রে দেয়। এই গোলমালের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ঠিক করি যা বলেছি সব অস্বীকার করতে হবে। কিন্তু তার সেই করুণ চোখের অতি-ব্যগ্র চাউনির সামনে কেন জানিনা তা করতে পারি না।

"মানে···আসলে, ঠিক ক'রে কিছু বলাই মুস্কিল। আত্মা আছে কি নেই শেষ পর্যন্ত তা স্বীকারও করা যায় না, অস্বীকারও করা যায় না।

এ-নিয়ে সে বেশিক্ষণ লেগে থাকে না। সে চুপ ক'রে গেলেই সেই সুযোগে লম্বা লম্বা পা ফেলে আমি সরে পড়ি। তাড়াতাড়ি চৌঠো-কাকার বাড়ি গিয়ে পৌছই; কিন্তু মনটা ভারি দমে যায়। আমার কেবলই মনে হয়, আমার জবাবের ফলটা ওর পক্ষে ভালো হবে না। এই সময় যখন আর সকলেই আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করছে ওর নিঃসঙ্গতা আর দুঃখ নিশ্চয়ই তাই ওর কাছে আরো অসহ্য হ'য়ে উঠেছে—হয়তো বা ওর মনে অন্য কিছু একটা ছিল। বোধ হয় সম্প্রতি ওর কিছু একটা ঘটেছে—তাই! তাই যদি হয় তাহলে আমার উত্তরগুলির উপরেই নির্ভর করবে···কী নির্ভর করবে? সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিই। বাজে ঘটনাকে এমনি ক'রে বাড়িয়ে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে দেখা যেন আমার স্বভাব। শিক্ষা-বিজ্ঞানবিশারদরা নিশ্চয়ই বলবেন আমার মনের সাম্য নষ্ট হ'য়ে গেছে। আচ্ছা, এত ক'রেও কি আমি শেষ পর্যন্ত শুধু এইটুকুই বলি নি যে "ঠিক ক'রে আমি কিছুই বলতে পারি না?" আমার সব উত্তরও যদি অপ্রতিপন্ন হ'য়ে থাকে, স্ত্রীলোকটির যদি কিছু হ'য়েও থাকে তাতে আমার কীই বা এসে যায়!

* * * *

“ঠিক ক’রে কিছুই বলতে পারছি না” কথাটা ভারি সুবিধের। অন্যের পক্ষে যে-সব প্রশ্ন গুরুতর তার সোজা জবাব দিতে পারে কেবল দুঃসাহসী বেপরোয়া ছোকরারা। কিন্তু রাজকর্মচারী বা ডাক্তারদের (১) মতন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কথা বলতে হয় ভেবে চিন্তে, কেননা, তাদের কথা মিথ্যা হ’লে ব্যাপারটা সঙ্গীন হ’য়ে দাঁড়াতে পারে। “ঠিক ক’রে কিছু বলতে পারছি না” বলা অতএব অনেক শ্রেয়; কারণ এর মধ্যে সকল সমস্যার অতি সহজ সমাধান আছে। ওই ভিখিরী মেয়েটার সঙ্গে দেখা হবার পর এটার প্রয়োজন আরও ভালো ক’রে যেন বুঝলাম। কেননা এরকম ব্যাপারেও অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে মত দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

যাই হোক, মনটা বিগড়ে রইল। রাত্রি শেষে ঘুম থেকে যখন উঠলুম ঘটনাটা তখনও মনের মধ্যে রয়েছে। এটা যেন ভাগ্যবিবর্তনের একটা অশুভ পূর্ববোধ। বাইরে দিনটা এখনও বিষণ্ণ, বরফের মাতামাতি চলেছে। এই নিরানন্দ পড়বার ঘরে ব’সে ব’সে আমার অস্থিরতা ক্রমে বেড়ে চলে। কাল আমায় শহরে ফিরতেই হবে···কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে ফু সিংলুর দোকানের নামকরা বিশুদ্ধ প্রণালীতে প্রস্তুত মাছের আঁশ আমি চাখি নি—এটাও একটা কথা। সেটা যেমন চমৎকার খেতে তেমনি সস্তা—মাত্র এক ডলারে একটা বড় পাত্র পাওয়া যায়। এর ভিতর দাম কি কিছু বেড়েছে? যদিও আমার ছেলেবেলাকার অনেক বন্ধুই মেঘের মতো আকাশে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু তা হ’লেও লো চিং-এর সেই অতুলনীয় মাছের আঁশ সেটা নিশ্চয়ই আছে--ওটা আমাকে খেতেই হবে, একাও যদি খেতে হয় তাহলেও···সে যাই হোক আমি কিন্তু কাল ফিরছিই···

আমার জীবনে এতবার দেখেছি যে অমঙ্গলের পূর্ববোধ যখনই আমার মনে জেগেছে তা ঠিকঠাক মিলে গেছে, যদিও মনে মনে চেয়েছি না মিলুক, এবং বিশ্বাস করতে চেয়েছি যে ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব; কাজেই এবারকার ঘটনাতেও যে একটা ব্যতিক্রম হবে না এর জন্যে আমি প্রস্তুতই ছিলুম। সন্ধ্যার দিকে পরিবারের কয়েকজন ভিতরের ঘরে জমা হলেন। কথার ছিটে-ফোঁটা যা কানে আসতে লাগল তার থেকে মনে হ’ল একটা বিষম বিরক্তিকর বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চলেছে। হঠাৎ চৌঠো খুড়ো ছাড়া আর সকলের কণ্ঠ থেমে যায়। তাঁর দুম্‌দাম্ পায়ের শব্দ ছাপিয়েও গলার শব্দ ওঠে।

---

(১) লেখক নিজে আগে ডাক্তার ছিলেন। জাপানে ডাক্তারী পড়েছিলেন।

"একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়—ঠিক এই আজকের দিনটিতেই কিনা কাজটা করলে ! এর থেকেই বোঝা যায় ও হচ্ছে সেই জাতের যাদের মাথায় মনুষ্য-বুদ্ধি একেবারেই নেই !"

আমার কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা অস্বস্তি জেগে ওঠে—যেন এই কথাগুলোর একটা বিশেষ মানে আমার কাছে আছে। বাইরে গিয়ে সেই ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখি কেউই আর নেই। আমার বর্ধমান অস্থিরতাকে দমন ক'রে আমি ব'সে থাকি যতক্ষণ না চাকরটা গরম জল দিয়ে চা-দানি ভরতে আসে।

"চৌঠো কাকা কার উপর অমন ঝাল ঝাড়ছিলেন—এই একটু আগে ?"

"সিয়াংলিন সাও ছাড়া আবার কার উপর ?" চীনা ভাষায় সহজ সংক্ষিপ্ত কায়দায় সে উত্তর দেয়।

উদ্বিগ্ন হ'য়ে আমি জিজ্ঞেস করি—"কী হয়েছে তার ?"

"বয়েস হয়েছে !" (১)

"মারা গেছে ?" আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন যন্ত্রণা পেয়ে লাফিয়ে ওঠে। মুখমণ্ডল জ্বালা করতে থাকে। ও কিন্তু আমার মানসিক অবস্থা ধরতে পারে না। মাথাই তোলে না। কাজেই আমি সংযত হ'য়ে নিয়ে আরো কয়েকটা প্রশ্নের জন্যে তৈরি হই।

"কখন মারা গেল ?"

"কাল রাত্রে। আজও হ'তে পারে। ঠিক বলতে পারি না।"

"কিসে মারা গেল ?"

"কিসে আবার ? অভাবে। অভাব এসে টুঁটি টিপে ধরল।"

কথাগুলো ওর একেবারে শাদা। আমার দিকে না তাকিয়েই ও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রথমটা আমার বড় ভয় ক'রে ওঠে। কিন্তু তার পরে নিজেকে নিজে বোঝাই যে যা হয়েছে তাকে তো বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যেত না ; তা ছাড়া ঘটনাটা যে আমার গোচর হ'ল এও আকস্মিক ভাবেই হ'ল—কাজেই কী এসে যায় ? নিজের বিবেককে সান্ত্বনা দিই আমার সেই অর্ধমতামতের কথা মনে

---

(১) ঠিক এই সময়টায় "মৃত্যু" এই শব্দ এবং তার প্রতিশব্দগুলি ব্যবহার করা বারণ। মৃত্যু হয়েছে বলতে হ'লে "বয়েস হয়েছে" বলতে হয়। সাধারণ চীনেরা মৃত্যুকে বলে "এখানে নেই" বা "বাইরে"।

ক'রে—"ঠিক ক'রে কিছু বলতে পারছি না।" আমার চাকরের ধাক্কাটা আর একবার স্মরণ করি। তবু মনের মধ্যে কেমন একটা অপরাধের খোঁচা কেন জানি না থেকে থেকে লাগে। যখন সুগম্ভীর চৌঠো কাকার পাশে গিয়ে বসি তখন আমার কেবলই সিয়াং লিন সাও-এর বিষয়ে কোনো একটা আলোচনাকে টেনে আনতে ইচ্ছে করে ; কিন্তু কী ক'রে সেটা আরম্ভ করা যায় ? উনি তো এখনও ধর্মের বিধি নিষেধের রাজ্যে বাস করেন ; আর, বছরের এই সময়টায় সেগুলো তো দুর্ভেদ্য অরণ্যের মতো। একেবারে অতি প্রয়োজনীয় না হ'লে এ-সময়ে মৃত্যু, অসুখ, অপরাধ, এ-সব প্রসঙ্গ উত্থাপনই করা যায় না। এবং প্রসঙ্গ তুললেও ঐ সব শব্দগুলোকে এমন একটা ধাঁধাটে ভাষায় লুকিয়ে রাখতে হবে যাতে আকাশে পূর্বপুরুষদের যে-সব আত্মারা সঞ্চারণ ক'রে বেড়াচ্ছেন তাঁরা চটে না ওঠেন। মাথা খুঁড়েও কোনো একটা প্রয়োজনীয় সূত্র বার করতে পারি না। ঠিক কথাগুলোও মনের মধ্যে আসে না! অবশেষে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

খাবার সময় চৌঠো খুড়ো সারাক্ষণ কঠিন মুখ ক'রে বসে থাকেন। শেষটা আমার ভয় হয় আমাকেও কি "সেই জাতের যাদের মাথায় মনুষ্য-বুদ্ধি নেই" তাদের দলে ফেললেন নাকি ? কারণ, "একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়, ঠিক আজকের দিনেই" আমিও এসে উদিত হয়েছি। তাঁর মনটাকে হালকা করবার অভিপ্রায়ে আর তাঁকে আরো দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যে আমি জানাই যে কালই আমি শহরে ফিরে যাবার সংকল্প করেছি। আমার থেকে-যাওয়া সম্বন্ধে তিনি খুব বেশি উৎসাহ প্রকাশ করেন না, কাজেই আমিও সিদ্ধান্ত করি আমার অনুমানই ঠিক হয়েছিল। এই রকম নিরানন্দ মনে আমি আমার খাওয়া শেষ করি।

ছোটো দিনটা শেষ হ'য়ে গেছে ; তার উপর ঝরা বরফের পর্দা। বরফ পড়াটা এ-মাসের পক্ষে যেন একটু তাড়াতাড়িই। কালো রাত্রি সারা শহরটার উপর যেন একটা আচ্ছাদনের মতো নেমে আসে। বাতির তলায় মানুষ এখনও কর্মে ব্যস্ত, কিন্তু আমার জানলার বাইরে রয়েছে স্তব্ধতা, মৃত্যুর মতো। মাটির উপর লেপের মতো বিছিয়ে থাকে বরফ আর তার উপর পড়ন্ত তুষারের হু হু শব্দ গভীর নিঃসঙ্গতাকে, অসহ্য বিষণ্ণতাকে আরও যেন নিবিড় ক'রে তোলে। সর্ষের তেলের হলদে আলোর তলায় একলা ব'সে ব'সে আমার মন চলে যায় সিয়াং-লিন সাও-এর কাছে. যে প্রদীপের শিখার মতো নির্বাপিত হ'য়ে গেছে।

যে-মেয়েটি একদিন আমাদের বাড়িরই একজন ছিল, আজ সে যেন ছোটোছেলের ধুলোর গাদায় ফেলে দেওয়া পুরোনো খেলনার মতন। যাদের কাছে পৃথিবীটা আমোদের জায়গা, যাদের জন্যে সেই মেয়েটি সৃষ্টি হয়েছিল তাদের যদি আজ ওর বিষয় ভাববার কিছু থাকে, তাহলে সে ভাবনা হবে এই যে, কোন সাহসে এতদিন পর্যন্ত ও টিকে ছিল। যাই হোক, অবশেষে লোপ পেয়ে গিয়ে সে সবাইকে অনুগৃহীত করেছে। উচাং (১) অবশেষে তাকে পরিষ্কার ঝাঁট দিয়ে নিয়ে গেছে—সাফা কাজ। মৃত্যুর পর আত্মা ব'লে কোনো কিছু থাকে কিনা জানি না তবে সিয়াং-লিন সাওয়ের মতন মানুষ জন্ম না নিলেই পৃথিবীর মস্ত উপকার হ'ত। তাহলে যে-ঘৃণিত এবং যারা ঘৃণা করে তাদের কারুরই মাথা ঘামাবার দরকার হ'ত না।

হেমন্তের ঝরফের স্থ স্থ শব্দ শুনতে শুনতে আমি চিন্তা করতে থাকি এবং ক্রমশঃ আমার ভাবনার মধ্যে একটা আরাম খুঁজে পাই। এ যেন এক জটিল সমস্যাকে একে একে জোড় লাগিয়ে দেওয়া। শেষ অবধি ওর জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো একটা সম্পূর্ণ চিত্র হ'য়ে ওঠে।

সিয়াং-লিন সাও লো চিং-এর বাসিন্দা ছিল না। এক বছর শীতের গোড়ার দিকে বুড়ি ওএই, যার ব্যবসা ছিল ঝি-চাকর সরবরাহ করা, তার সঙ্গে ও এসে উপস্থিত হয়। চৌঠো খুড়ো ঠিক করেছিলেন একজন দাসী বদলাবেন, সিয়াং-লিন সাও ছিল বুড়ি ওএই'র তরফের পদপ্রার্থিণী। তার মাথায় জড়ানো ছিল একটা শাদা রুমাল, গায়ে ছিল নীল রংএর কোর্ত্তা আর ফিকে সবুজ রংএর আঙ্‌রাখা, পরণে কালো ঘাঘরা। তখন ওর বয়স হবে ছাব্বিশ কি সাতাশ। কাঁচা বয়েস, দেখতেও ভালো—তামাটে রং, লালচে গাল। বুড়ি ওএই বলেছিল, ও হচ্ছে ওর মায়ের পাড়ার লোক। ওর স্বামী মারা গেছে ব'লে বাইরে চাকরির চেষ্টায় বেরতে হয়েছে।

চৌঠো খুড়োর ভুরু দুটো কুঁচকে ওঠে। খুড়িমা সেদিকে চেয়ে বুঝলেন স্বামীর মনোভাবটা। বিধবাকে চাকরিতে বহাল করতে তাঁর মন চায় না।

---

(১) যমদূত যে জীবনের শেষ-নিঃশ্বাসে আত্মাকে "ঝাঁট দিয়ে" নিয়ে যায়।

কিন্তু চৌঠো খুড়ি ওকে বেশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন। তাতে দেখেন তা হাত-পাগুলি বেশ কাজের এবং সমর্থ; চোখের চাউনি বেশ সরল সোজা দেখে মনে হয় এ অল্পে সন্তুষ্ট হবে আর কাজের চাপ পড়লেও নালি করবে না। সুতরাং চৌঠো খুড়োর ভুরু কোঁচকানো সত্ত্বেও খুড়িমা তা নিয়ে পরখ ক'রে দেখতে রাজি হলেন। তিন দিন সে এমনভাবে কা করল যে দেখে মনে হ'ল ছুটি তার কাছে যেমন বিস্বাদ এমন আর কি নয়। প্রমাণ হ'য়ে যায় ও অতি উদ্যমশীল আর মর্দ্দের মতো শক্তিমান চৌঠো খুড়ি তখন আর দ্বিধা না ক'রে তাকে বছরে পাঁচশো মুদ্রা হিসে বহাল ক'রে ফেল্লেন।

সবাই তাকে সিয়াং-লিন সাও ব'লে ডাকতো, পদবীর কথা কেউ জিগেস করেনি। বুড়ি ওএই কিন্তু ছিল ওএই চিয়া সান্-এর লোক (ওএই বংশে পর্ব্বত) এবং যেহেতু সে বলত সিয়াং-লিন সাও এসেছে ঐ একই গ্রা থেকে তখন তাব পদবীও নিশ্চয় ওএই (২)।

অধিকাংশ পাহাড়ীরা যেমন, সিয়াংলিন সাও-ও তেমনি কথা বল কম, আর অন্যের কথার উত্তর দিত শুধু 'হ্যাঁ' আর 'না' ব'লে। তাই তা ঘরের নানা টুকিটাকি খবর তার পেট থেকে বার করতে দশদিনেরও বেশি সময় লেগেছিল। যেমন, বাড়িতে তার একজন দজ্জাল শাশুড়ি আছেন; তা ছোটো দেওর কাঠ কেটে খায়; গত বছর বসন্তকালে সে তার স্বামী হারিয়েছে; সে ছিল ওর চেয়ে দশ বছরের ছোটো; তার স্বামীর জীবনে উপায় ছিল জ্বালানি কাঠ কেটে আনা। এর চেয়ে বেশি কিছু খবর তা কাছ থেকে কেউ বার করতে পারেনি।

দিনের পর দিন যায়, সিয়াং-লিন সাও-এর কাজও চলে ঠিক ঘড়ি কাঁটার মতো। কখনও আলগা দেওয়া নেই, খাবারের জন্যে কোনো নালিশ নেই, কোনোদিন ওকে শ্রান্ত দেখা যায়নি। সকলেই স্বীকার করল বুড়ো কর্ত্তা লো সি একটা কাজের লোক পেয়েছেন বটে—মর্দ্দ মানুষের থেকেও চটপটে আর পরিশ্রমী। নববর্ষের দিনেও আর কারুর সাহায্য বিনা-ই সে ধোওয়া, মোছা, ঝাড়া, কাপড়-কাচা আর ঘরের অন্যান্য কাজ করত; ত ছাড়া হাঁস মুর্গী এসব দিয়ে উৎসর্গের ব্যবস্থাও করত। কাজেই ছি

---

(২) সাও মানে হচ্ছে শ্যালিকা। চীনেরা বড় ছেলের সঙ্গে যার বিয়ে হয় তাকে ঐ ছেলে নামের সঙ্গে 'সাও' যোগ ক'রে ডাকে। সুতরাং ওর স্বামীর নাম ছিল বোধ হয় ওএই সিয়াংলিন।

যেন তার জীবন। ওর গায়ের চামড়া একটু পরিস্কার হ'য়ে এল, এমন কি একটু গায়েও সারল।

এমনি একটা নববর্ষের ঠিক পরেই একদিন খালের ধারে চাল ধুতে গিয়ে সে হন্তদন্ত হ'য়ে ফিরে এল। বেচারা বিষম উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। বল্ল, খালের অপর পারে তার স্বামীর এক ভাইএর মতো দেখতে একটি লোককে সে দেখেছে ; খুব সম্ভব ওকে নিয়ে যেতে এসেছে। চৌঠো খুড়ি ঘাবড়ে যান ; তাঁর মনে সন্দেহ জাগে। কেনই বা সে সিয়াং-লিন সাওকে নিতে আসবে ? ব্যাপারটা ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলতে বলায় সিয়াং-লিন সাও কিছুই বলতে পারে না। চৌঠো খুড়ো সব শুনে ভুরু কুঁচকে জানালেন—

"এত বড খারাপ হ'ল। মনে হচ্ছে অনুমতি না নিয়েই ও এখানে পালিয়ে এসেছিল।"

তাঁর কথাই পরে সত্যি হ'ল। সে একজন পলাতকা বিধবা।

দিন দশেক পরে ব্যাপারটা সকলে যখন প্রায় ভুলতে বসেছে হঠাৎ একদিন বুড়ি ওএই একটি মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হ'ল ; বল্লে, এই হচ্ছে সিয়াং-লিন সাওএর শাশুড়ি। শাশুড়িটি পাহাড়ীদের মতো মোটেই মুখচোরা নন, কথা কী ক'রে বলতে হয় তা বেশ ভালোই জানা। কয়েকটা ভদ্রালাপের পরই একেবারে কাজের কথা পেড়ে বসে। সে এসেছে ওর বৌ-কে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বসন্তকাল পড়েছে, বাড়িতে এখন কাজ অনেক—কাজ করবে কে ? বাড়িতে আছে শুধু বুড়োবুড়িরা আব কাচ্চা-বাচ্ছারা। সিয়াং-লিন সাওএর ফিরে যাওয়া নিতান্ত দরকার।

চৌঠো খুড়ো ব'লে ওঠেন—"নিজের শাশুড়িই যখন বলছে তখন এর বিরুদ্ধে কোনো কথা চলে না।"

সুতরাং সিয়াং-লিন সাওএর মাইনের হিসেব করা হয়। দেখা যায় তার পাওনা হয়েছে এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ মুদ্রা। সবই সে তার মনিবের কাছে জমা রেখেছিল। কোনোদিন নিজের জন্যে একটি পয়সাও নেয়নি। আর কথা না বাড়িয়ে এই টাকাটা শাশুড়ির হাতে দিয়ে দেওয়া হ'ল, যদিও সিয়াংলিন সাও সেখানে উপস্থিত ছিল না। সিয়াং-লিন সাওএর কাপড়গুলি শুদ্ধ নিয়ে চৌঠোখুড়োকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে চলে গেল। তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে······

"আঃ হাঃ! চাল কোথা? সিয়াং-লিন সাও তো চাল ধুতে গিয়েছিল, না?" খানিক পরে এই প্রশ্নটা হঠাৎ চৌঠোখুড়ির মনে জাগে; তিনি চেঁচিয়ে সেই কথাই জিজ্ঞাসা ক'রে ওঠেন। সিয়াং-লিন সাওএর বিষয় তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন; হঠাৎ খিদে পাওয়ায় ভাতের কথা মনে পড়ে; ভাতের কথা মনে পড়তেই পুরোনো চাকরাণীর কথা স্মরণ হয়। তোলপাড় ক'রে সবাই চালের চুপড়ির খোঁজ শুরু করল। চৌঠো খুড়ি প্রথমে হেঁসেলে খুঁজলেন, পরে খুঁজলেন সামনের বড় ঘরটায়, তারপর শোবার ঘরে, কিন্তু হারানো জিনিসটার ছায়াও দেখতে পেলেন না। চৌঠো খুড়ো বাইরে খুঁজতে বেরলেন। খুঁজতে খুঁজতে খালের ধারে পৌছে দেখলেন চুপড়িটা পড়ে আছে জলের পাড়ে খাড়া, পাশে একটা বাঁধাকপি।

বোঝা গেল যে সিয়াং-লিন সাও যে তার শাশুড়ির সঙ্গে কি ভাবে চলে গেল এ-বিষয়টা নিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত কেউই মাথা ঘামায় নি। এইবার সব স্বচক্ষে-দেখা সাক্ষী বেরতে লাগল। তারা বল্লে যে ভোরবেলা শাদা চাঁদোয়া খাটানো একটা নৌকো খালে লঙ্গর ক'রে অনেকক্ষণ বসেছিল। পালের আড়ালে আরোহীরা ছিল—তারা যে কে তা কেউ জানে না। একটু পরেই সিয়াং-লিন সাও জলের পাড়ে আসে এবং যেই সে জল নিতে হাঁটু গেড়ে বসতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোক লাফিয়ে এসে তাকে জাপটে ধ'রে জোর ক'রে নৌকোর মধ্যে নিয়ে যায়। তাদের দেখে পাহাড়ী লোক ব'লেই মনে হয়েছিল; তা হ'লেও, সিয়াং-লিন সাওকে তারা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে। বার কয়েক সে সাহায্যের জন্যে চীৎকারও করেছিল। পরে তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হয় খুব সম্ভবত মুখ বেঁধে দিয়ে। তারপর বুড়ি ওএই আর আর একজন স্ত্রীলোক আসা পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি। সিয়াং-লিন সাওএর যে কী হ'ল তা কেউই পরিস্কার ক'রে দেখেনি, কিন্তু যারা উঁকিঝুঁকি মেরেছিল তারা বলে তাকে হাত-পা বেঁধে নৌকোর পাটাতনে ফেলে রাখা হয়েছিল।

চৌঠো খুড়ো ব'লে ওঠেন—"একি অত্যাচার!" পরে একটু ভেবে নিস্তেজ স্বরে বলেন—"যাই হোক কিন্তু……"

চৌঠো খুড়িকে নিজের হাতে সেদিন রান্না করতে হয়, আর তাঁর ছেলে আ নিউ উনুনে আগুন দেয়।

বিকেলবেলা বুড়ি ওএই আবার দেখা দিল।

"এ কিরকম অত্যাচার।" এই বলে চৌঠো খুড়ো তাকে সম্ভাষণ জানালেন।

"চমৎকার! তোমার পায়ের ধুলো পেয়ে আমরা আর একবার ধন্য হলুম!" থালা ধুতে ধুতে চৌঠো খুড়ি রাগের সুরে দালাল-বুড়িকে বলে ওঠেন—"তুমি নিজেই সুপারিশ করে ওকে কাজে ঢোকালে, তারপর নিজেই একদিন লোক নিয়ে এলে তাকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। এ যেন একেবারে আগ্নেয় প্রপাত! পাঁচ জনে কী ভাববে শুনি? তুমি কি আমাদের সঙ্গে তামাসা জুড়েছ? না ব্যাপারটা কী?"

"আই-আ! আই-আ! আমায় বোকা বানিয়েছে—ঠকিয়েছে! তাই তো তোমাদের কৈফিয়ৎ দিতে এলুম। ও যে এমন পালিয়ে এসেছে তা আমি কী ক'রে জানবো? আমার কাছে এসে হাতে-পায়ে ধ'রে পড়লো চাকরি জুটিয়ে দিতে। আমি ভাবলুম সত্যিই বা! শাশুড়িকে কিছু না জানিয়ে তার বিনা হুকুমেই যে ও এটা করবে তা আর আমি কী ক'রে জানবো? কত্তাবাবু! গিন্নিমা! তোমাদের মুখের দিকে আর আমি চাইতে পারছি না! আমারই সব দোষ। যেমন আমার বুদ্ধি, তেমনি আমার হুঁস। তোমাদের মুখের দিকে কেমন ক'রে আমি চাইব?······তোমাদের বংশ দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্যে বিখ্যাত তাই আমার মতো একটা তুচ্ছ মানুষকে নিশ্চয়ই কঠিন শাস্তি দেবে না। আর আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এর পর যে লোক দেব সে যেন দ্বিগুণ ভালো হয়······"

চৌঠো খুড়ো বলে ওঠেন—"কিন্তু·········" বলে আর বেশি এগোতে পারেন না।

সিয়াং-লিন সাওএর ব্যাপারটা এইভাবে শেষ হ'ল। তার কথা সকলেরই মন থেকে সম্পূর্ণই মুছে যেত যদি-না পরের চাকরগুলোকে নিয়ে চৌঠোখুড়ি এত বিব্রত হ'য়ে পড়তেন। তারা ছিল অলস, নৈলে রাক্ষসের মতো পেটুক, আর সবচেয়ে চরম হ'ত যখন তারা হ'ত অলস আর পেটুক দুই-ই। চৌঠোখুড়ি হয়রাণ হ'য়ে গিয়ে কেবলই সিয়াং-লিন সাওএর উদাহরণ দেখাতেন। বলতেন "সে কেমন আছে কে জানে?" মনে মনে ইচ্ছে একটা কিছু অঘটন ঘটে আবার যাতে সে কাজ করতে আসতে বাধ্য হয়। পরের বছর নববর্ষ যখন ঘুরে এল চৌঠো খুড়ি ততদিন ওকে ফিরে পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

ছুটির শেষের দিকে বুড়ি ওএই এল "কউ-টউ"(১) ক'রে শুভেচ্ছা জানাতে। তখন তার অর্দ্ধ-মত্ত অবস্থা, খুব বক্‌বক্ করছে। সে বুঝোতে বসল ওএই গ্রামে

---

(১) এই সময় শুভেচ্ছা জানাবার জন্য যে-প্রণাম করার রীতি তাকেই বলে "কউ-টউ"।

তার মায়ের বাড়িতে কিছুদিন থাকার দরুণ তার এ-বছর লৌকিকতা করতে আসতে দেরি হ'য়ে গেল। কথায় কথায় সিয়াং-লিন সাওএর কথা উঠল।

"সে ছুকরি ?" বুড়ি ওএই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে ওঠে; তারপর মাতালদের যেমন উৎসাহ দেখা যায়, তেমনি উৎসাহে বলতেথাকে—"ভাগ্যবতী বটে! ওর শ্বাশুড়ি যখন ওকে নিতে এল তার আগেই ওর সঙ্গে হু গ্রামের হু লাও-লিউএর বিয়ের কথা ঠিক হ'য়ে গেছে। বাড়িতে কয়েকটা দিন মাত্র থেকেই আবার ওকে ফুলের দোলায় চাপিয়ে নিয়ে গেল।"

"আই-ইয়া! শ্বাশুড়ি বটে!" চৌঠো খুড়ি ব'লে ওঠেন।

"আই-ইয়া গিন্নিমা! তুমি কথা বলছ উঁচু দরজার (২) পিছন থেকে। আমরা পাহাড়ী মানুষ ছোটো দরজার বংশ, আমাদের এতে কী-ই বা এসে যায়। হয়েছিল কি, ওর একজন ছোটো দেওর ছিল, তার তো বিয়ে দিতে হবে ? যদি সিয়াং-লিন সাওএর বিয়েটা আগে দিয়ে ঘরে কিছু টাকা আসে তবেই না ওর দেওরের কন্যাপণের ব্যবস্থা হয়! কাজেই বুঝছো, শ্বাশুড়িটি মোটেই বোকা নন্, বরং বিশেষ বিচক্ষণ এবং হিসেবী। তারপর ছ্যাখ, বৌ-এর বিয়ে দিল সে কোন বন-গাঁয়ে এক পাহাড়ীর সঙ্গে। কেন, বুঝলে না ? আশপাশের গাঁয়ের কারুর সঙ্গে বিয়ে দিলে বিয়ের যৌতুক পেত সামান্যই; কিন্তু দূর বন-গাঁয়ে যেখানে মনিষ্যি নেই সেখানে কোন মেয়ে প্রাণ ধ'রে বিয়ে করতে চায় ? বিয়ের কণে পাওয়া যায় না তাই কন্যের দরও বেশি। সিয়াং-লিন সাওএর জন্যে তার বরকে দিতে হয়েছে নগদ আশীটি হাজার। তারপর বাড়ির ছোটো ছেলেটিরও বিয়ে হ'ল, তার বৌকে যৌতুক দিতে হ'ল মোট পাঁচ হাজার। তারপর বিয়ের খরচ-খরচা বাদে শ্বাশুড়ির হাতে রইল নগদ দশ হাজারের উপর। কেমন হিসেবী, কেমন বুদ্ধিমান মেয়েমানুষ ব'ল তো ?"

"সিয়াং-লিন সাও কী করলে ? ঘাড় পেতে সব মেনে নিল ?"

"মেনে নেওয়ার কথাই ওঠে না। এরকম অবস্থায় সবাই প্রতিবাদ করবে। ওরা করল কি, ওকে জোর ক'রে বেঁধে ফুলের দোলায় চাপিয়ে বরের বাড়ি নিয়ে গেল; জোর ক'রে মাথায় ফুলের মুকুট পরিয়ে দিল; পুর্ব্বপুরুষদের ঘরে জোর ক'রে কউ-টউ করালো; তারপর জোর ক'রে বরের সঙ্গে একঘরে চাবি বন্ধ ক'রে দিল।"—ব্যাপারটা এইখানেই শেষ।

---

(২) অর্থাৎ বনিয়াদি বংশ। চৌঠোখুড়ি যে শ্বাশুড়ির দৌরাত্মের উপর রাগ করছেন, তা নয়। তিনি দোষ ধরছেন বিধবা বৌকে আবার ধরে বিয়ে দেওয়ার পাপের জন্য।

"আই-ইয়া!"

"কিন্তু সিয়াং-লিন সাও দারুণ বিদ্রোহ করেছিল। লোক-মুখে শুনলুম ও যা ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিল সে সাংঘাতিক। সবাই বল্লে, এ যে ছিষ্টি-ছাড়া মেয়ে। তার কারণ, তোমাদের মতো পণ্ডিতদের বাড়িতে এতদিন কাজ করেছে কিনা তাই। গিন্নিমা, ক'বছরে অনেক কিছুই দেখেছি। বিধবার বিয়েতে অনেককেই দেখেছি চীৎকার করতে আর কাঁদতে। আত্মহত্যার ভয় দেখায় তাদেরও দেখেছি। এর উপর আর একরকম আছে তারা বরের বাড়িতে গিয়ে স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যকে কউ-টউ করতে চায় না, এমন কি বাসর ঘরের ফুলের মোমবাতি পর্য্যন্ত ভেঙে চুরমার ক'রে দেয়; তাদেরও দেখেছি! কিন্তু সিয়াং-লিন সাও এদের কারুরই মতো ছিল না।

"গোড়া থেকেই সে লড়তে থাকে বাঘিনীর মতন। চীৎকার আর গালাগালি, চীৎকার আর গালাগালি—এমন চেঁচিয়েছিল যে হু গ্রাম পৌছতে পৌছতে ওর গলা ভেঙে আর শব্দই বার হচ্ছিল না। ফুল-দোলা থেকে ওকে টেনে বার করে কার সাধ্য! পিতৃপুরুষদের ঘরে ওকে ঢোকাতে দুজন লোক লেগেছিল—তবু কোনোমতেই কউ-টউ করবে না! হঠাৎ অসাবধানে একটুখানি যেই না হাত আলগা হওয়া, অমনি—আই-ইয়া, বলব কি বুদ্ধের দিব্যি! দড়াম ক'রে ধুনোর বেদীতে এমন কপাল ঠুকলো যে মাথা ফেটে রক্তের স্রোত ব'য়ে গেল! দুমুঠো ধুনোর ছাই দিয়ে আর দু'পুরু শালু দিয়ে ফাটা মাথা বাঁধা হয়, তবু রক্ত থামে না। সত্যি সত্যি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ও লড়েছে। এমন কি যখন বাসর ঘরে বরের সঙ্গে ওকে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল তখনও পর্যন্ত সে কি গালাগালির ছটা! একেই বলে বিদ্রোহ! আই-ইয়া!"

জট-পাকানো মাথাটা নেড়ে মাটির দিকে চেয়ে ওএই বুড়ি চুপ ক'রে যায়।

"তারপর কী হ'ল?"

"লোকে বলে একদিন সে বিছানা ছেড়েই ওঠেনি। দুদিনের দিনেও তাই হ'ল।"

"তারপর?"

"তারপর? পরে একদিন উঠলো। বছর ঘুরতে একটা ছেলেও হ'ল। আমি যখন মায়ের ওখানে ছিলুম, তখন একদিন হু গ্রাম থেকে কয়েকজন লোক ফিরল; তারা বল্লে সিয়াং-লিন সাওকে তারা দেখেছে। মায়ে-পোয়ে দুজনেই বেশ মোটা-সোটা হয়েছে। মাথার উপরে শাশুড়ি নেই, এই যা ভাগ্যি।

স্বামীটি বেশ মজবুত, খাটতেও পারে। নিজেরই বাড়ি আছে। আই-ইয়া, একেই বলে ভাগ্যবতী!”

তারপর থেকে চৌঠোখুড়ি সিয়াং-লিন সাও যে কেমন কাজের মেয়ে ছিল সে কথা ভুলে গেলেন। মোটের উপর ওর নাম আর করতেন না।

৩

বুড়ি ওএই-এর কাছে সিয়াং-লিন সাওএর এই আশ্চর্য ভাগ্যের খবর পাবার দু’বছর পরে আর এক হেমন্তের দিনে আমাদের সেই পুরোনো দাসী একেবারে সশরীরে চৌঠো খুড়োর দরজায় এসে দাঁড়াল। টেবিলের উপর একটা গোলমতো ঝুড়ি আর একটা ছোট্ট বিছানার পুঁটলি সে নামিয়ে রাখলে। মাথায় তার এখনো একটা শাদা রুমাল বাঁধা, কালো ঘাঘরা, নীল কোর্ত্তা আর ‘চাঁদের-শাদা’ আঙরাখা। গায়ের রং আগেকারই মতো আছে, কেবল গাল দুটো একেবারে ফ্যাকাসে! চোখের কোণে জলের দাগ। সে চোখ থেকে আগেকার সমস্ত উজ্জ্বলতা, সমস্ত দীপ্তি একেবারে ধুয়ে গেছে। তার সঙ্গে এল আবার সেই বুড়ি ওএই মুখে একটা অনুকম্পার ভাব নিয়ে।

চৌঠো খুড়ির কাছে বুড়ি বক্‌বক্ শুরু করে:

“তাইতো কথায় বলে ‘অজানা হাওয়া আর অচেনা মেঘ আকাশের মাঝে অনেক থাকে জমা।’ অমন জোয়ান মরদ স্বামী ছিল, কেই বা ভেবেছিল এই কাঁচা বয়সে জ্বরে কাটা পড়বে? সেরেই তো উঠেছিল, তারপর যেমনি না একবাটি পান্তা-ভাত খাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে পড়লো আবার জ্বরে। ভাগ্যে তবু একটা ছেলে ছিল—তাই কাঠ কেটে, চায়ের পাতা তুলে, গুটি-পোকার চাষ ক’রে কোনোরকমে দিন চালাচ্ছিল। এ-সব কাজেই সিয়াং-লিন সাও আমাদের বেশ পাকা। কেই বা জানতো যে শেষে ছেলেটাকেও নেকড়ে বাঘে নিয়ে যাবে? সত্যি বলছি! নেকড়ে বাঘ!

“যখন বসন্তকাল শেষ হ’য়ে গেছে, নেকড়ের কোনো ভয়ই আর নেই সেই সময় এই নেকড়েটার যে এত বুকের পাটা হবে কে তা ভাবতে পেরেছিল? আই-ইয়া! এখন বাকি আছে শুধু ওর নিজের দেহখানা। ওর স্বামীর বড় শালা এসে বাড়ি দখল ক’রে বসল। ওর হাতে একটি পয়সাও না দিয়ে তাড়িয়ে দিল। ওর এখন ‘ন যযৌ ন তস্থৌ’ অবস্থা। এখন তোমাদের এখানে

হাত-জোড় ক'রে এসেছে যদি আর একবার ওকে কাজে নিয়ে নাও। শাশুড়িই বল আর যাই বল ওর আর এখন সংসারে কোনো বন্ধনই নেই। তোমরা দাসী বদলাবে জেনে আমি ওকে নিয়ে এলুম। তোমাদের ধরন-ধারন ওর জানাই আছে, তাই বলি কাঁচা হাতের চেয়ে ও-ই ভালো হবে।"

সিয়াং-লিন সাও কাঁদো কাঁদো স্বরে তার নিষ্প্রভ চোখটা মুহূর্তের জন্যে তুলে বলতে থাকে—"সত্যি আমার মতো হাবা আর নেই! আমি জানতুম পাহাড় যখন বরফে ঢাকা পড়ে তখনই বুনো জন্তরা নাবাল জমিতে খাবারের সন্ধানে আসে, এমন কি গ্রামের ভিতরেও আসে। বসন্তকালের এত পরেও যে ওরা এমন হিংস্র থাকতে পারে তা'তো আর আমি জানতুম না। একদিন ভোরবেলা উঠে ছোটো একঝুড়ি শিমের বিচি নিয়ে আমি মাও-মণিকে বল্লুম, দরজার গোড়ায় ব'সে দানাগুলো সুতোয় গাঁথো তো বাবা। যেমনি চালাকটি ছিল সে, তেমনি আবার কথাও শুনতো। সব সময় যা বলতুম তাই কানে নিত। সেদিন সকালেও তাই ওকে দরজার কাছে বসিয়ে আমি চ'লে গেলুম। আমি গেলুম বাড়ির পিছনে জ্বালানি কাঠ কাটতে আর চাল ধুতে। চালগুলি হাঁড়িতে চাপিয়ে দিয়ে শিম-বিচিগুলো সিদ্ধ করবার ব্যবস্থা ক'রে আ-মাওকে চেঁচিয়ে ডাকছি—ও মা, কোনো সাড়াও নেই, শব্দও নেই। সামনের দরজার কাছে গিয়ে দেখি আ-মাও নেই, শুধু বিচিগুলো মাটিতে ছড়ানো। সে কোনোদিন যে খেলা করতে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায় তা নয়, তবু প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে তাকে খুঁজে এলুম। কেউই তাকে দেখে নি। আমি তো ভয়েই মরে গেলুম। সবাই-এর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম ওকে খুঁজে বার ক'রে দেবার জন্যে। সারা সকাল সারা বিকেল আমরা তন্ন তন্ন ক'রে অলি-গলি কিছুই আর বাদ দিলুম না। তার এক পাটি ছোটো জুতো একটা কাঁটা ঝোপের উপর ঝুলতে দেখা গেল। সেই দেখে সবাই বল্ল, ওকে নেকড়েতে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমি তা কিছুতেই মানতে চাইলুম না। কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের আরো ভিতরে···আমরা···ওকে···পেলুম। দেহটা একটা ঘাসের চাপড়ার উপর পড়ে রয়েছে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ঝুড়িটি তখনও তার হাতের মুঠোয় শক্ত ক'রে ধরা।" এতখানি ব'লে সে একেবারে ভেঙে পড়ে, মুখ দিয়ে কেবল কতকগুলি ছাড়া-ছাড়া শব্দ বের হয়, কিছুই আর গুছিয়ে বলতে পারে না।

চৌঠো খুড়ি প্রথমে একটু হুঁ, না, করেছিলেন কিন্তু এই গল্প শোনবার পর তাঁর চোখ ভিজে উঠল। তিনি তক্ষুণি সিয়াং-লিন সাওকে ঝিদের ঘরে তার

জিনিসপত্র নিয়ে যেতে বল্লেন। বুড়ি ওএই একটা মস্ত নিঃশ্বাস ছাড়লো, যেন তার কাঁধ থেকে একটা প্রকাণ্ড বোঝা নেমে গেল। সিয়াং-লিন সাও একটু শান্ত হ'য়ে আর দ্বিতীয়বার বলার অপেক্ষা না রেখেই তার পরিচিত ঘরে বিছানার পুঁটলি নিয়ে চ'লে গেল।

এইভাবে আবার সে লো চিংএ ফিরে এল ভৃত্য হ'য়ে। সবাই তখনো তাকে তার প্রথম স্বামীর পদবী ধ'রে সিয়াং-লিন সাও বলেই ডাকত।

কিন্তু সে আর সেই আগেকার মতো নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই কর্তা আর গিন্নি দেখলেন যে তার হাত-পা আগের মতো আর চট্‌পটে নেই, কাজের সময় সে অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়, কিছু মনে রাখতে পারে না, আর ওই মড়ার মতো মুখে সারা দিনমানে এক ফোঁটা হাসি ফোটে না। চৌঠো খুড়ির গলার আওয়াজ থেকেই বোঝা যায় যে তিনি এরই মধ্যেই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। চৌঠো খুড়োও তাই। সিয়াং-লিন সাও এসে পৌছতেই চৌঠো খুড়ো তাঁর অভ্যাস মতো ভুরু কুঁচকেছিলেন। তবে সম্প্রতি চাকর-বাকর নিয়ে তাঁদের যে নিরন্তর গোলমাল চলেছে তারই জন্যে সিয়াং-লিন সাওকে চাকরিতে নিতে তিনি বিশেষ আপত্তি করেন নি। কিন্তু সব দেখে শুনে এইবার চৌঠো খুড়িকে তিনি জানালেন যে যদিও ওর অবস্থা অতি শোচনীয় সন্দেহ নেই, আর সেই কারণেই ওকে চাকরি দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ওর মধ্যে থেকে স্বর্গ আর মর্ত্যের তার কেটে গেছে। সেই কারণে ওর অশুচি হাতে পুজোর বাসন-কোসন যেন কলুষিত করতে না দেওয়া হয়, আর বিশেষ ক'রে অনুষ্ঠানাদির সময় চৌঠো খুড়িকে নিজেই সব কিছু রান্না করতে হবে। অন্যথা পিতৃপুরুষদের আত্মা ক্রুদ্ধ হবেন এবং উপচারের এক টুকরো খাদ্যও মুখে ছোঁবেন না।

এই পিতৃপুরুষদের উৎসর্গের ব্যাপার ওঁর বাড়িতে ছিল অতি গুরুতর ঘটনা; কারণ, পুরাতন রীতিনীতিতে তিনি ছিলেন একেবারে গোঁড়া। আগেকার দিনে এই সময়টা সিয়াং-লিন সাওএরও ছিল সবচেয়ে খাটুনির সময়। কাজেই সেবারে যখন ঘরের মাঝে বেদী পড়ল, বেদীর উপর পাতলা কাপড়ের আস্তরণ বিছানো হ'ল, সিয়াং-লিন সাও-ও তখন আগেরই মতো সেখানে মদের পাত্র, বাটি, চপ্-স্টিক্ সব গুছোতে আরম্ভ করলো।

চৌঠো খুড়ি ছুটে ঘরে ঢুকে বল্লেন—"সিয়াং-লিন সাও, ও সব থাক্। জিনিসপত্র আমি নিজেই গুছিয়ে দেব।"

ঘাবড়ে গিয়ে সে স'রে এসে মোমবাতি বার করতে গেল।

চৌঠো খুড়ি আবার ব'লে উঠলেন—"ওগুলো রেখে দাও। মোমবাতি আমি নিজেই বার ক'রে নেব।"

সিয়াং-লিন সাও হতবুদ্ধি হ'য়ে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি ক'রে শেষে দেখে কিছুই আর করবার নেই। চৌঠো খুড়িই সব কিছু ক'রে ফেলেছেন। একটা সন্দেহ মনে নিয়ে সে চ'লে যায়। সিয়াং-লিন সাওএর সেদিন হেঁসেলে উনুন জ্বালিয়ে ব'সে থাকা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজই রইল না।

লো চিংএর লোকেরা যদিও তখনও তাকে সিয়াং-লিন সাও ব'লেই ডাকতে লাগলো কিন্তু তাদের ডাকটা যেন এখন অন্যরকম। ওরা এখনও তার সঙ্গে কথা বলে কিন্তু কেমন একটু যেন বিমুখ হাসি, কেমন যেন তাচ্ছিল্য। সে সেটা দেখেও দেখে না, হয়তো গ্রাহ্যই করে না। তার দৃষ্টি চ'লে যায় ওদের ছাড়িয়ে বহুদূরে এবং যে-কথা তার মনে দিবারাত্র লেগে রয়েছে সেই কথাই সে বারে-বারে বলে। "সত্যি আমার মতো হাবা আর নেই, সত্যি! আমি জানতুম পাহাড় যখন বরফে ঢাকা পড়ে তখনই বুনো জন্তুরা নাবাল জমিতে খাবারের সন্ধানে আসে, এমন কি গ্রামের ভিতরেও আসে। বসন্তকালের এত পরেও যে ওরা এরকম হিংস্র হ'তে পারে তা তো আর আমি জানতুম না…"

সেই এক ভাবে এক কথায় তার নিজের গল্প বলা আর শেষকালে কান্না আর বুক চাপড়ানো!

যে শুনেছে তারই মন গলে গেছে, এমন কি যে-সব লোক সবেতেই বিদ্রূপ করে তারাও শোনবার পর পরিহাস বন্ধ ক'রে বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরেছে। মেয়েছেলেরা শুনলে তো তাকে ঘৃণা করবার কথা ভুলেই যেত, এমন কি, সে যে বিধবা-বিবাহের পাপেই তার স্বামীর এবং পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়েছে তাও ক্ষমা ক'রে ফেলতো। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গল্প শেষ হ'লে তার সঙ্গে কান্না জুড়ে দিত। ঐটিই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তার জীবনের কেন্দ্রীয় ঘটনা; এ-ছাড়া সে আর কোনো বিষয়েই কারুর বিষয়েই কথা বলত না। বার বার শুধু ঐ একই প্রসঙ্গ।

কিছুদিনের মধ্যেই সারা লো চিংএর প্রত্যেকেই, একবার নয়, বহুবার তার গল্প শুনলো। তখন হল কি, গ্রামের উদারমতি মহিলাদের পক্ষে, এমন কি, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে পর্যন্ত তার গল্প শুনে এক ফোঁটা চোখের জল বার করা

দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠল। শহরের সকলেই গল্পটা একেবারে কথামালার মতো মুখস্থ বলে যেতে পারত এবং সেটা বার বার শুনতে তাদের বিরক্তিকর লাগত।

সে আরম্ভ করে—"সত্যি, আমার মতো হাবাঁ আর নেই।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, তুমি কেবল জানতে পাহাড় যখন বরফে ঢাকা পড়ে তখনই বুনো জন্তুরা নীচে নাবাল জমিতে খাবারের সন্ধানে আসে, এমন কি গ্রামের ভিতরেও…" এই ব'লে নিষ্ঠুরভাবে তাকে থামিয়ে দিয়ে তার শ্রোতারা নিজের পথে চ'লে যেত।

হাঁ ক'রে সিযাং-লিন সাও কিছুক্ষণ হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকত। লোকের দিকে এমন ভাবে তাকাতো যে মনে হ'ত এর আগে কখনও তাদের দেখে নি। তারপর নিজের দেহটাকে টেনে টেনে এমন ভাবে চলতে থাকত যে মনে হ'ত বেঁচে থাকার উপর তার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। কিন্তু তার জীবনের সেই বিশেষ ঘটনা—তাকে আর সে ভুলতে পারত না। তাই সে নানা কৌশলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই বিষয়টার প্রতি অপরের আগ্রহ জাগাবার চেষ্টা করত। শিমের বিচি দেখতে পেলে অথবা ছোটো ঝুড়ি বা পরের ছেলে দেখলেই নিজেরই অজ্ঞান্তে আ-মাওএর কথা পেড়ে বসত। যেমন ধরো, বছর তিন চারের ছেলে দেখলেই সে বলে উঠত "আ-মাও যদি আজ থাকতো তাহলে ঠিক অত বড়টি হ'ত।"

সিয়াং-লিন সাওএর চোখে একটা ক্ষ্যাপাটে ভাব দেখে বাচ্ছারা মায়ের ঘাঘরা আঁকড়ে ধরত। কেউই বেশিক্ষণ তার কাছে থাকত না, শীঘ্রই সে একলা পড়ে যেতো। তারপর টলতে টলতে চলে যেতো। খুব শীঘ্রই তার এই চালটাও সবাই ধ'রে ফেলে। তখন লোকে তাকে নিয়ে মজা করতে থাকে। তাকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে কোনো ছেলেব দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলে লোকে মস্করা ক'রে বলতো—"সিয়াং-লিন সাও, আ-মাও এতদিন বেঁচে থাকলে ঠিক অত বড়টি হ'ত, না?"

খুব সম্ভবত সে সন্দেহই করে নি যে তার দুঃখের কথায় কারুরই আর এখন মন ভেজে না। আগে যারা বরং তাকে করুণা করত তারা আজকাল তার গল্পটাকে বিশ্রি নীরস ব'লে বোধ করে। অবশেষে এই ধরনের উপহাস তার অবোধ মনের বর্ম ভেদ করল। তখন থেকে সে পরিহাসকারীদের দিকে একবার তাকাতো কিন্তু তাদের একটি কথাও ফিরিয়ে দিত না।

৪

নববর্ষের উৎসবের আনন্দ লো চিংএ কখনও বাদ পড়ে না। শেষ চান্দ্রমাসেব বিশ তারিখের পর থেকেই আনন্দোৎসব শুরু হয়।

পরেব বছর এই সময়ে চৌঠো খুড়ো একজন বাড়তি চাকর রাখলেন আর তা ছাড়া মুর্গী আর হাঁস রাঁধার জন্যে লিউ-মা বলে আব একজন এলো। এই লিউ-মা বেশ "নির্দোষ" মেয়ে। বৌদ্ধ, ফলমূলাহারী, এবং প্রাণীহত্যা কোনো দিন করবে না এই সত্য সে দৃঢ়ভাবে পালন ক'রে এসেছে। সিয়াং-লিন সাও তার "অশুচি" হাত দিয়ে কেবল আগুন জ্বালাতে পেত, আর দেখতে পেত লিউ-মা পুজোর হাঁড়ি-কুড়ি নিয়ে ব্যস্ত। বাইরে পাতলা বরফের চাদরে মাটি ঢাকা পড়ছে। "আই ইয়া, সত্যি, আমার মতো হাবা" বলে সিয়াং-লিন সাও হতাশভাবে আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

লিউ-মা একটু বিরক্ত হ'য়ে তাকে বাধা দিয়ে বলে "সিয়াং-লিন সাও, আবার তুমি আগের মতো শুরু করেছ? আচ্ছা, বলো দেখি, তোমার কপালের ঐ যে দাগ, ওটা কি রাগ করে বেদীতে মাথা ঠুকে হয়েছে?"

"হুঁ।"

"আচ্ছা, তবে বলি। অতই যদি তোমার ঘৃণা, তো পরে বশ হ'লে কী ক'রে?"

"কে, আমি?"

"হ্যাঁ তুমি! আমার মনে হয় পেটে পেটে তোমার একটু ইচ্ছে ছিল, তা নৈলে…"

"হাঃ হাঃ! তুমি তো আর দেখনি তার গায়ে কী জোর ছিল।"

"না, তা দেখি নি। তবে তোমার নিজের গায়ে যে-রকম জোর তাতে ক'রে যে তাকে রুখতে পারতে না এ আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যে এর জন্যে প্রস্তুত ছিলে তা একেবারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।"

"হ্যাঁঃ, তুমি নিজে হ'লে যে কতক্ষণ তার সঙ্গে লড়াই করতে তা একবার আমার দেখবার ইচ্ছে আছে।"

লিউ-মা-র বুড়ো মুখ হাসিতে কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল। অনেকটা যেন চকচকে আখরোটের মতো দেখতে হ'ল। তার শুকনো চোখ দুটো সিয়াং-লিন সাওএর

কাটা দাগটার উপর মুহূর্তের জন্যে পড়ল, তারপর তার চোখের দিকে চেয়ে সে ব'লে উঠল—

“সত্যি, তেমন চালাক তুমি নও। সেই সময় আর একবার চেষ্টা করলেই নিজেকে হত্যা করতে পারতে, আর সে-ই বোধ হয় তোমার পক্ষে ভালো হ'ত। তার বদলে কী হলো? তোমার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে তো ঘর করলে দু-বছরও নয়। তোমার পাপ-কর্মের বদলে ঐটুকুই তোমার লাভ। এখন ভেবে দেখ, পরজগতে যখন তুমি যাবে, তোমার দুই স্বামীর আত্মা যে তোমায় নিয়ে ঝগড়া করবে! ব্যাপারটার কিনারা হবে কী ক'রে? কেবল একমাত্র উপায় আছে। যম-দেব ইয়েন্‌-লু-থা তোমাকে করাত দিয়ে চিরে দুজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ ক'রে দেবেন। আমার মনে হয় ঠিক তাই-ই হবে।”

সিয়াং-লিন সাওএর মুখে ভয় আর বিস্ময় মেশা একটা ছবি ফুটে উঠল। এ-দিকটা সে কোনোদিন ভেবে দেখে নি, পাহাড়ী গ্রামে এ-ভাবে কেউ কোনো কথা বলে নি।

“আমি বলি কি, সময় থাকতে এর একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল। তুতি মন্দিরে গিয়ে একটা চৌকাঠ বানাবার মতো টাকা দিয়ে এসো। হাজার দশহাজার লোক সেই চৌকাঠ মাড়িয়ে(১) তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দেবে। তাহলে মৃত্যুর পর কষ্ট নাও পেতে পারো।”

সিয়াং-লিন সাও একটিও কথা বল্লে না। কিন্তু তার ভিতরটা ব্যথায় যেন মুচড়ে ভেঙে গেল। পরদিন তার চোখের তলায় কালি পড়ল। প্রাতরাশের পরই তুতি মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতের কাছে চৌকাঠ বানাবার আর্জি পেশ করলে। প্রথমটা পুরোহিত দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর যখন সে অনেক চোখের জল ফেলল তখন তিনি বিবেচনা করলেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করলেন নগদ বারোহাজার মুদ্রা দিলে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অনেক কাল হ'ল সিয়াং-লিন সাও গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে। ওরাও সিয়াং-লিন সাওকে এবং সেই সঙ্গে আ-মাওএর একঘেঁয়ে গল্পকে একেবারে বর্জন করেছে, কিন্তু খবর রটতে দেরি হ'ল না যে সিয়াং-লিন সাওকে নিয়ে কথা কইবার একটা নতুন বিষয় বেরিয়েছে। অনেকেই

---

(১) সাধারণের বিশ্বাস এই যে মন্দিরের দরজায় পাথরের চৌকাঠ বানিয়ে দিলে সেই চৌকাঠই হ'য়ে যায় যেন যে বানিয়েছে তার পাপ-দেহ। সেই দেহের উপর ভক্তের প্রতি-পদক্ষেপ পাপীকে নরকের শাস্তির হাত থেকে ধাপে ধাপে মুক্ত ক'রে আনে।

কৌতূহলী হ'য়ে এসে খালি তার কপালের দাগের বিষয়ে আলোচনা শুরু করল।

“বলি, সিয়াং-লিন সাও, বল দেখি কী বলে তুমি লোকটার কাছে আত্মসমর্পণ করলে ?”

আর একজন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লে “বড়ই দুঃখের কথা, মাথার ঠোক্করটা যথেষ্ট গভীর হয় নি।”

এই সব কথাগুলোর মধ্যে যে-উপহাসের স্বর আছে তা সে বেশ বুঝতে পারত, কিন্তু কোনো কথা বলত না। সে শুধু নিঃশব্দে নিজের কাজ ক'রে চলত। পরের বছর শেষ হবার সময় সে চৌঠো খুড়ির কাছ থেকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে সেটাকে বারোটি রূপোর ডলারে গেঁথে শহরের পশ্চিম প্রান্তে যাবার অনুমতি চেয়ে নিল। খাবার সময়ের আগেই সে যখন ফিরে এলো মনে হ'ল একেবারে বদলে গেছে। মুখের উদ্বিগ্ন ভাবটা আর নেই, কত মাস পরে চোখ যেন কিছুটা জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। তার মনটাও বেশ খুশি। সে চৌঠো খুড়িকে জানিয়ে দিল যে সে মন্দিরে একটা চৌকাঠ কিনে দিয়েছে।

শীত আসার উৎসবের সময় ও আপ্রাণ খাটলো এবং উৎসর্গের দিন মনে হল সে যেন জীবনীশক্তিতে ফেটে পড়ছে। চৌঠো খুড়ি পুজোর বাসন-কোসন বার করলেন আর আ-নিউ ঘরের মাঝে বেদীটাতে সেই সব বসালো। সিয়াং-লিন সাও তাড়াতাড়ি সুরাপাত্র আর চপ-স্টিক বার করে আনতে গেল।

চৌঠো খুড়ি চেঁচিয়ে উঠলেন “থাক্, থাক্, ওসবে তোমায় হাত দিতে হবে না।”

হাতে যেন ছেঁকা লাগল, এইভাবে সে হাত সরিয়ে নিলে। মুখ হ'য়ে গেল ছাইএর মতো শাদা। একেবারে স্থাণুর মতো সে দাঁড়িয়ে রইল, একপাও নড়তে পারল না। ঐখানেই সে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ পর্যন্ত না চৌঠো খুড়ো ধুনো জ্বালবার জন্যে সেখানে এসে ওকে বাইরে যেতে বল্লেন।

সেইদিন থেকে সে খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ল। শুধু যে শারীরিক দুর্বলতা তা নয়, তার জীবনের শিখাটাই যেন ভিতর থেকে প্রায় নিবু নিবু হ'য়ে এলো। তার স্নায়ু অত্যন্ত দুর্বল হ'য়ে পড়ল, ভয়ে তার মন ছেয়ে গেল, অন্ধকারের ভয়, মানুষ দেখলে ভয়, এমন কি কর্তা-গিন্নিকে দেখলেও। নেংটি ইঁদুর তার গর্তের মধ্যে থেকে বেরিয়ে দিনের প্রখর আলোয়

এসে যেমন ভয়ে ছট্‌ফট্ করে তার অবস্থাটাও এখন অনেকটা সেই রকম। ছ'মাসের মধ্যে তার চুলের রং গেল চলে। তার স্মৃতিশক্তি এতো দুর্বল হ'য়ে এলো যে সময় সময় চাল্ ধুতেও সে ভুলে যেত।

চৌঠো খুড়ি তার সামনেই বলতে আরম্ভ করলেন "ওর হয়েছে কি ? এ রকম হলো কী ক'রে ? এখানে ওর না থাকাই ভালো।"

কিন্তু ঐ যে কেমন হ'য়ে গেল তার থেকে আর সে কোনো নিস্কৃতি পেলো না, কোনো উন্নতিরও আশা রইল না। তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার কথা উঠলো ; বুড়ি ওএই-এর হেফাজতে পাঠিয়ে দেবার কথাও আলোচনা হ'ল। আমি যতদিন লো চিংএ ছিলুম ততদিন এ দুইএর কিছুই করা হয় নি, তবে তার কিছু পরেই মৎলবটা কাজে খাটানো হয়েছিল। আমি চৌঠো খুড়োর বাড়ি ত্যাগ করবার পর কিছুদিনের জন্যে বুড়ি ওএই তার ভার নিয়েছিল, না সঙ্গে সঙ্গেই সে ভিক্ষাব্রত নিয়েছিল সে খবর আমি পাই নি।

বিরাট পটকার শব্দে জেগে উঠি। আগুনের হলদে শিখা দেখতে পাই, আর ঠিক তার পরই বাজী ফাটার "পি পি পাপাও" শব্দ। পাঁচটা বাজে, প্রার্থনা আর আশীর্বাদের সময় আসন্ন। অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় পৃথিবীটাকে দেখি। শুনতে পাই দূরে একটার পর একটা পটকা ফাটছে। ক্রমে সেই শব্দ দ্রুত এবং উচ্চ হ'তে হ'তে সমস্ত আকাশকে প্রতিধ্বনিত ক'রে তোলে, আর বিচ্ছিন্ন তুষারের স্তবক আকাশ থেকে ছোঁড়া ছোটো ছোটো শুভ্র গোলকের মধ্যে থেকে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে চারিদিক ছেয়ে ফেলে। এই শব্দের ভিড়ে আর মৃদু ঝড়ের আবেষ্টনে কেমন একটা ঘরোয়া আরাম পাই। চারিদিককার এই আলোড়নে আর গৃহে গৃহে আশীর্বাদ-বর্ষণের আসন্নতায় যে-হাওয়া বইতে থাকে তারই ঝাপটায় আমার সারাদিনের সারা সন্ধ্যার মনমরা ভাবটা কেটে যায়।

স্বর্গ-মর্ত্যের দেবতারা আজ মনের সুখে ধুনোর গন্ধে উৎসর্গের মদ আর মাংস খেয়ে মাতালের মতো বাতাসের মধ্যে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন এটা জেনেই না কত পরিতৃপ্তি। এই মেজাজে তাঁরা যে লো চিংএর এইসব পুণ্যাত্মাদের অক্ষয় সমৃদ্ধি দান ক'রে যাবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

খুং ই-চী

লু শুন

লো চিংএর মদের দোকানগুলো চীনের অন্যান্য জায়গার দোকানগুলোর থেকে একটু স্বতন্ত্র। যেমন ধর, দোকান ঘরের কাঠের গণ্ডির মধ্যে গরম জলের একটা চৌকোনা পাত্র সব সময় তৈরি থাকে যখন খুশি মদ গরম করবার জন্যে। দুপুরে বা বিকেলে ছুটির পরে মজুররা এখানে আসে এক পাত্র মদের জন্য।—বিশ বছর আগে এই মদেরই দাম ছিল নগদ চার; এখন প্রতি পাত্রের জন্য দিতে হয় নগদ দশ। তারা কাঠের গণ্ডির ধারে দাঁড়িয়ে গরম গরম মদ আয়েস ক'রে চুমুক দেয়। এক সেণ্ট দিলে পাওয়া যায় 'মদের সঙ্গী' নোনতা বাঁশের কোঁড অথবা মশলাদার কড়াইশুঁটি। দশ সেণ্টের কিছু বেশি দিলে এক থালা মাংস পাওয়া যায়। কিন্তু খদ্দেরদের মধ্যে বেশির ভাগই 'ছোটো কোর্তা'র দল—তাদের পকেটে নগদ থাকে খুব কমই। কেবল কয়েকজন জোব্বা-পরা লোক গণ্ডির পাশ দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পিছনের ছোটো ঘরটায় গিয়ে বসেন, তাঁরাই মাংস আর মদ নিয়ে সময় কাটান।

আমার যখন বারো বছর বয়েস তখন 'সবার সৌভাগ্য' নামে লো চিংএর এক মদের দোকানে আমি ছোকরার কাজ নিয়ে ঢুকেছিলুম। দোকানটা ছিল শহরে ঢোকবার মুখেই। দোকানদার ভেবেছিল জোব্বাওয়ালাদের সামনে আমার এই মূর্তি বড়ই বেমানান হবে তাই আমায় কাজ দিয়েছিল গণ্ডির পিছনে। 'ছোটো কোর্তা' খদ্দেরদের নিয়ে কারবার করা সহজ কিন্তু তারা যেমন করতো বকবক্, তেমনি করতো জ্বালাতন। ভাঁড় থেকে মদ ঢালবার সময় ঝুঁকে পড়ে দেখে নিত গেলাশের তলায় জল আছে কিনা। তারপর আরও কড়া দৃষ্টি রাখতো গরম জলে গেলাশটা ডোবাবার সময় যেন মদের সঙ্গে জল না মেশে। এই সব শ্যেন-দৃষ্টি এড়িয়ে মদের সঙ্গে জল মেশানো আমার পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য। তাই কিছুদিন পরেই দোকানদার আমাকে অকেজো বোকা ঠাওরালে। যাক্! যাঁর চিঠির জোরে কাজে ঢুকেছিলুম দোকানে

তাঁর নাম ছিল ব'লে আমাকে আর ছাড়ানো হ'ল না, আমি ব'সে ব'সে কেবল মদ গরম করবার একঘেঁয়ে কাজে বহাল হলুম।

সারাদিন উনুনের পিছনে দাঁড়িয়ে একমনে আমি কর্তব্য ক'রে যেতুম। কাজ ভালোই করতুম কিন্তু মাঝে মাঝে এই একঘেঁয়েমির চোটে একেবারে হাঁপিয়ে উঠতে হ'ত। দোকানদার ছিল গম্ভীর চেহারার লোক, আর গোমড়ামুখো। খদ্দেররা কর্কশ অপ্রীতিকর শব্দে কথা কইতো, কাজেই সাধারণত সেখানে প্রফুল্ল হ'য়ে থাকবার কোনো উপায়ই ছিল না। কেবল মাত্র যখন খুং ই-চী মদ খেতে আসতো তখনই খুব এক চোট সকলের সঙ্গে হেসে নিতুম। আর সেই জন্যই বোধহয় এখনও তাকে আমার মনে আছে।

জোব্বাওয়ালাদের মধ্যে এই খুং ই-চীই ছিল একজন, যে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে মদ খেতো। দীর্ঘায়তন বিরাট পুরুষ--একটু নীলচে রঙের কেমন-ধারা ফ্যাকাশে মুখ আর কুঞ্চিত মুখ-চর্মের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই কয়েকটা কাটার আর ঘায়ের দাগ। ছাই-রঙের সামান্য একটু দাড়ি। গায়ে একটা জোব্বা আছে বটে তবে সেটা এতই জীর্ণ যে দেখলে মনে হয় বছর দশেক এর সংস্কার বা পরিষ্করণ কিছুই হয়নি। সারাক্ষণ কথার সঙ্গে নিরর্থকভাবে "চু", "হু", "চে", "ইয়ে" এইসব শুদ্ধ ভাষার শব্দ ব্যবহার করে চলতো, যা চলতি কথার মধ্যে মোটেই চলে না এবং সাধারণ লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অবোধ্য। খুং ই-চী দোকানে ঢুকলেই সকলের মুখে একটা চাপা হাসি দেখা যেতো। কেউ বা ব'লে উঠতো, "খুং ই-চী, তোমার মুখে নতুন একটা দাগ পড়েছে!"

যেন শোনেইনি এই ভাব দেখিয়ে খুং ই-চী গণ্ডির দিকে ঘুরে বলতো, "দু' গেলাশ মদ গরম কর আর এক থালা মশলা মাখা শিমের বিচি!" তারপর গুণে গুণে তার নগদ ন' সেন্ট সার দিয়ে সাজিয়ে রাখতো।

"আবার চুরি করেছে নিশ্চয়!" পিছন থেকে একজন, যতটা দরকার নেই তার চেয়েও উঁচু গলায় চেঁচিয়ে ওঠে।

চোখ বড় বড় করে সে জবাব দেয়, "না জেনে শুনে, লোকের সততায় কি ক'রে তুমি সন্দেহ কর?"

"সততা আবার কি? নিজের চোখে কি দেখিনি হো পরিবারের বই চুরি করার জন্য সেদিন বেদম মার খেলে?"

খুং ই-চীর বিকৃত মুখের উপর নীল শিরাগুলো ফুটে ওঠে, সে তর্ক করে, "বই হাতানোকে চুরি ব'লে গণ্য করা যায় না! বই নেওয়া, পণ্ডিতদের ব্যাপার

—তাকে কি চুরি বলা যায় ?” তারপর সে নানারকম বয়েৎ আওড়াতে থাকে যা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, যেমন “খাঁটি মানুষ সে দুঃখেও সন্তুষ্ট”, তারপর কথা শেষ করে “চ্র”, “হু”, “চে” আর ‘ইয়ে’র মতো অদ্ভুত সব শব্দ, যত তার মুখ থেকে বেরতে থাকে, ঘর শুদ্ধ লোকও ততই হো-হো ক’রে হেসে উঠতে থাকে। তার পরেই সকলকে বেশ একটু তৃপ্ত এবং প্রফুল্ল মনে হয়।

খুং ই-চীর আড়ালে সবাই বলাবলি করতো যে খুং ই-চী এককালে পুরাণ অধ্যয়ন করেছিল কিন্তু সরকারী বিদ্যালয়ে কোনোমতেই ঢুকতে পারেনি। জীবন-ধারণের আর কোনও উপায় না থাকায় ক্রমে তাকে প্রায় ভিক্ষুকের পর্যায়ে নেমে আসতে হয়। চমৎকার হাতের লেখা ব’লে লেখা নকল ক’রে কোনোরকমে সে পেটের ভাতটা জোটাতো। কিন্তু শুধু ভাত হ’লে তো চলে না, সে ছিল বড্ড বেশি মদের ভক্ত, তা ছাড়া কাজে ফাঁকি দিত। কিছুদিন নকল করবার পরই বই, কাগজ, তুলি, কালি ঘষার পাথর এইসব নিয়ে ডুব মারতো। বার বার এইরকম করার দরুণ ইদানিং তার পক্ষে কাজ পাওয়াও অসম্ভব হ’য়ে উঠেছিল। তাই হাতে আর কোনোও কাজ না থাকায় খুং ই-চী মাঝে মাঝে ছিঁচকে চুরি করতো।

আমাদের মদের দোকানে তার ব্যবহার ছিল একেবারে চমৎকার। কোনোদিন সে ধার শোধ দিতে কসুর করেনি। অবশ্য কখনও কখনও নেহাৎই তার হাতে নগদ কিছু না থাকলে তার ধারের হিসাবটা শাদা একটা কাঠের ফলকে আমরা এঁটে রাখতুম। সেখানে অন্যান্য পাওনাদারের হিসাবও সাঁটা থাকত। মাসের শেষে খুং ই-চীর নামটা মুছে দেওয়া হতো, কেননা সে বরাবরই তার দেনাটা শোধ ক’রে দিত।

যেদিনের কথা হচ্ছে সেদিন আধ গেলাশ মদ চুমুক দেবার পর যখন তার মুখের রক্ত ফিরে এলো, কে একজন তাকে জিগ্‌গেস করলে, “সত্যি তুমি চীনা অক্ষর চেনো ?” সে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। “তাই যদি চেনো তাহলে তুমি যে সিউৎসাই উপাধির দিকে আধ পা-ও এগুতে পারলে না এ কী ক’রে হয় ?”

সঙ্গে সঙ্গে খুং ই-চী দমে যায়, তার কুঞ্চিত মুখচর্মের উপর একটা পাণ্ডাশ পর্দা যেন নেমে আসে। অস্ফুট উচ্চারণে অসংলগ্নভাবে খানিকটা বকে, কিন্তু তার এক বর্ণও বোঝা যায় না। আবার সকলে উচ্চহাস্য করে, আবহাওয়াটা উল্লসিত হ’য়ে ওঠে।

এই সময়ে অন্য সকলের সঙ্গে আমিও যদি কৌতুকে যোগ দিতুম তাহলে দোকানদার কিছু বলতো না। দোকানদারের ইচ্ছা খদ্দেররা বেশ আমোদে থাকুক—তাই মাঝে ম্যঝে লোক হাসাবার জন্য খুং ই-চীকে অনুরোধও করতো। কিন্তু খুং ই-চী খদ্দেরুদের সঙ্গে কথা বলার নির্বুদ্ধিতা ত্যাগ ক'রে আশপাশের দুরন্ত ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমাতো।

একদিন সে আমায় জিজ্ঞেস করলে আমি কোনো বই পড়েছি কিনা? আমি মাথা নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ পড়েছি।

“বেশ, যখন পড়েইছো তখন একটা পরীক্ষা হোক্। আচ্ছা মশলামাখা শিমের বিচি তো হচ্ছে ‘ওএই’—সেটা লেখে কী ক'রে বলতো?”

মনে মনে ভাবলুম এই ভিখিরীর মতো দেখতে লোকটা কি আমাকে পরীক্ষা করবার উপযুক্ত? তাই আমার মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে ওকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলুম। খানিকক্ষণ দেখে তারপর সে উৎসাহভরে বললে, “পারলে না তো? এসো তোমাকে শিখিয়ে দি। মনে রেখো! ‘মশলামাখা শিমের বিচি'র মতো কথা একেবারে মুখস্ত ক'রে রাখা উচিত। বড় হ'য়ে যখন দোকান করবে তখন হিসেব লেখবার সময় দরকার লাগবে।”

মনেমনেই বললুম দোকানদার হ'তে এখনও আমার ঢের দেরি, আর তা ছাড়া আমার কর্তাকে তো খাতায় কোনোদিন মশলামাখা শিমের বিচির কথা লিখতে দেখিনি। মজা লাগলো, রেগেও গেলুম; নিরুৎসাহের সুরে বললুম, “কে তোমাকে শেখাতে বলছে? যাই হোক ওএই ধাতুর উপর ‘ঘাসের’ ধাতু লাগালেই তো ওটা লেখা যায়।

খুং ই-চী খুশি হয়, লম্বা দুটো নখ গণ্ডির কাঠের উপর ঠুকে বলে, “ঠিক! কিন্তু এই ‘ওএই’ অক্ষরটা চার রকম ভাবে লেখা যায়। সেগুলো জানা আছে?” আমি রেগে মুখ বেঁকিয়ে চলে যাই। খুং ই-চী তার লম্বা নখটা মদে ডুবিয়েছিল। তার ইচ্ছা গণ্ডির তক্তার উপর দেগে দেখায় অক্ষরগুলো। কিন্তু আমার উৎসাহ নেই দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে—চোখে একটা আক্ষেপ লেগে থাকে।

মাঝে মাঝে যখন সে আসতো আর সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসতো হাসির ঢেউ তখন আশেপাশের বাড়ি থেকে ছেলেরা তাকে ঘিরে দাঁড়াতো। প্রত্যেককে একটা ক'রে শিমের বিচি দেবার পরও তারা আরো পাবার লোভে খুং ই-চীর থালার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। খুং ই-চী তখন আঙুল দিয়ে শিমের বিচিগুলি ঢাকা দিয়ে ছেলেদের দিকে নীচু হ'য়ে ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিস্‌

করে বলতো, "আর কটাই বা বাকি আছে, আমি তো বেশি খাইনি।" তারপর খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই বলতো, "বেশি নয়! বেশি নয়! বেশি হুৎসাই! কম ইয়ে!" তারপর আবার সেই সব শুদ্ধ ভাষার অপ-প্রয়োগ। হাসির বন্যায় ছেলেরা এদিকে ওদিকে ছিট্‌কে পড়ে যেত।

একদিন, 'মধ্য-হেমন্ত-উৎসবের' কিছুদিন আগে, দোকানের কর্তা হিসেব মেলাচ্ছিলেন। দেয়াল থেকে শাদা ফলকটা নামিয়ে বল্‌লেন, "খুং ই-চী অনেকদিন আসেনি। ওর কাছে উনিশ সেণ্ট্ পাওনা রয়েছে।" এইটে শুনে মনে হ'ল, তাইতো, খুং ই-চী যে কতদিন আসেনি তাতো খেয়ালই করিনি এতদিন।

"আসবে কী করে? মার খেয়েছে! এবার দুটো ঠ্যাঙ ই ভেঙে গেছে।" —একজন খদ্দের খবরটা দেয়।

"অ্যাঁ!"

"হ্যাঁঃ, আবার চুরি করেছে। লোকটা এমনই বদ্ধ পাগল যে হাকিম তিংএর বাড়িতে গেছে চুরি করতে! এ কখনো সম্ভব?"

"তারপর কী হ'ল?"

"হল আবার কী? দোষ স্বীকার ক'রে খৎ লিখে দিতে হ'ল; তারপর প্রহার! মাঝ রাত পর্যন্ত প্রহার চললো, তাইতেই দুই ঠ্যাঙ খোঁড়া!"

"তারপর?"

"তারপর আর কি? ঠ্যাঙ দুটো ভেঙে গেল?"

"এখন কী রকম আছে?"

"কে জানে কেমন আছে? মরেই গেছে বোধ হয়।" দোকানদার আর কিছু না ব'লে একের পর এক হিসেবে ঠিক দিয়ে চল্‌লো।

মধ্য-হেমন্তের উৎসব শেষ হ'য়ে গেছে, এখন দিন দিন বাতাস ক্রমেই ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে। শীতের গোড়া এসে পড়ল। যদিও সারাদিন আমি উনুনের ধারেই দাঁড়িয়ে থাকতুম, তাহলেও আমাকে তুলোভরা কোর্তা চাপাতে হতো গরম থাকবার জন্য। একদিন বিকেলবেলা দোকানে একটিও খদ্দের নেই, আমি চোখ বুজে বসেছিলুম।

"এক গেলাশ মদ গরম করো।"

চমকে চোখ চাইলুম। গলার আওয়াজটা খুবই ক্ষীণ কিন্তু যেন চেনা চেনা। চারদিকে চেয়ে দোকানে কাউকে দেখতে পেলুম না। দাঁড়িয়ে গণ্ডির উপর দিয়ে ঝুঁকে চৌকাঠের দিকে চেয়ে দেখি খুং ই-চী মাটিতে ব'সে আছে।

মুখ কালো হ'য়ে গেছে, রোগা ডিগডিগ করছে—হতভাগার মতো চেহারা। একটা শতছিন্ন কোর্তা গায়ে, কাঁধ থেকে খড়ের দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটা ঘাসের চুপড়ি। তার মধ্যে ভাঙা পা দুটো গুটিয়ে বসেছে। আমায় দেখে নীচু গলায় সে আর একবার বললে, "এক গেলাশ মদ গরম করো।"

দোকানদার গণ্ডির উপর থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে নীরসভাবে বললো, "খুং ই-চী, তোমার কাছে এখনও উনিশ সেণ্ট পাওনা রয়েছে।"

নিঃসাড়ে মাথা তুলে খুং ই-চী বললো, "সেটা—পরের বার দিয়ে দেবো। এখন আমি নগদ দিয়ে দিচ্ছি, ভালো মদ চাই।"

আগেকারই মতো হেসে দোকানদার টিপ্পনি কাটলে, "খুং ই-চী, তুমি আবার চুরি আরম্ভ করেছ?"

সে কোনোরকম তর্কও করলো না, অস্বীকারও করলো না, কেবল সংক্ষেপে বললে, "ঠাট্টা রাখো!"

"ঠাট্টা? চুরি নয় তো কী? তবে তোমার ঠ্যাঙ্ ভেঙেছে কে শুনি?"

খুং ই-চী ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, "ভেঙেছে? পড়ে ভেঙে গেছে, পড়ে……" তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হয় তার সকাতর অনুরোধ এ-বিষয়ে আর যেন কোনো আলোচনা না চলে।

ততক্ষণে অনেকে এসে জুটেছে, তারা সবাই দোকানদারের হাসিতে যোগ দিল। আমি মদ গরম ক'রে নিয়ে গিয়ে খুং ই-চীর সামনে রাখতুম। সে পকেট হাতড়ে চার সেণ্ট বার ক'রে আমার হাতে দিল। সেই সময় চোখে পড়ল তার কাদা মাখা লম্বাটে হাত দুটো। বুঝলুম, সে রাস্তা দিয়ে নিজেকে হেঁচড়ে টেনে এনেছে। মদটা খেতে যতটুকু সময় লাগে, শুধু ততক্ষণ সে দোকানে রইলো। তারপর দোকান যখন পরচর্চায়, জল্পনায় আর হাস্যরবে মুখর হ'য়ে উঠেছে, তখন সে উঠে ব'সে হাতের উপর ভর দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে বাইরে চ'লে গেলো।

তারপর বহুদিন তাকে আর দেখা যায়নি। বছরের শেষ দিনে দেয়াল থেকে শাদা ফলকটা নামিয়ে দোকানদার বললো, "খুং ই-চীর এখনও উনিশ সেণ্ট পাওনা।"

পরের বছর ড্রাগন নৌকো উৎসবের দিন ঠিক সেই কথাটিই সে আর একবার বললো। হেমন্তের সময় এ-বিষয়ে আর কোনো কথা বললো না। তারপর খুং ই-চীকে আর কোনোদিন দেখিনি। বোধ হয় সত্যিই সে মরে গেছে।

এসে গেল

লূ-শ্যুন

সম্প্রতি লোকের মুখে প্রায়ই শোনা যায় "বলশেভিজ্‌ম্ এসে গেল।" খবরের কাগজেও প্রায়ই লেখে "বলশেভিজ্‌ম্ এসে গেল।"

যারা কিছু টাকা জমিয়েছে, তাদের ভারি মন খারাপ। সরকারী চাকুরেরাও ভারি ব্যস্ত—চীনে শ্রমিকদের সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে, রুশীয়দের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, এমন কি পুলিসেও খোঁজাখুঁজি করছে যে এখানে বলশেভিকদের কোনো আফিস-টাফিস আছে কি না।

ব্যস্ত হওয়াটা মোটেই আশ্চর্য্যের নয়, আবার খোঁজাখুঁজিটাও স্বাভাবিক, কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন করা দরকার যে বলশেভিজ্‌ম্ জিনিসটা কী?

এটা কিন্তু তারা কেউই পরিষ্কার ক'রে বলে না, আমারও জানবার কোনো উপায় নেই। তবে, যদিও আমি জিনিসটা কী জানি। না তবু এটা সাহস ক'রেই ব'লতে পারি যে বলশেভিজ্‌ম্ আসতে পারে না, তার আসবার প্রয়োজনও নেই। কেবল এই "এসে গেল, এসে গেল" এইটে এসে প'ড়লেই ভয়ের কারণ ঘটবে।

আমরা চীনেরা কোনো বিলিতি 'ইজ্‌ম্' দেখে ভুলবো এটা অসম্ভব, বরং তাকে মুছে সাফ ক'রে দেবো, আর নইলে তার তেজটাকে দমিয়ে দেবো। মিলিটারিজ্‌ম্? আমরা অন্যের সঙ্গে কি কখনো লড়িনি? নন্ রেসিস্‌টেন্স? আমরা তো যুদ্ধ করতেই চাই না। স্বাধীনতাবাদ? আমাদের তো মনের ভাব প্রকাশেই দোষ, দুটো কথা কওয়াই শক্ত। মানবতাবাদ? আমরা তো মানুষের শরীর নিয়ে এখনও বেচা-কেনা করি।

তাই যে-'বাদ'ই আসুক না চীনকে তা ঘাঁটাতে পারবে না। সেই আদ্যিকাল থেকে আজ অবধি যতো গোলযোগ এ-দেশে হ'য়েছে তা যে-কোনো 'ইজ্‌ম্' নিয়ে হ'য়েছে তা তো শুনিনি। চোখের সামনের কয়েকটা উদাহরণ নিলেই টের পাওয়া যাবে। যেমন ধরা যাক সিয়াসির[১] পড়ুয়া মহলে প্রচারিত

---

[১] সান্‌তুং প্রদেশের একটি জায়গা।

বাণী, বা হুনানের নিপীড়িত বাসিন্দাদের প্রচারিত বাণী—এগুলো তো বেশ ভয়ের। কিন্তু বেলজিয়ামে জার্ম্মান সৈন্যদের অত্যাচার, বা রাশিয়াতে অন্যদলের প্রচার মতো লেনিন সরকারের অত্যাচার ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের গুলোকে মনে হবে যেন তারা মহাশান্তির বাণী। জার্মানি তবু বলবে 'মিলিটারিজ্‌ম্‌' আর লেনিন বলবে 'বলশেভিজ্‌ম্‌'।

এ তাহলে "এসে গেল" এসে পড়েছে। যদি "ইজ্‌ম্‌"ই হয় তাহলে সে তো শুধু ইজ্‌ম্‌-এই পর্য্যবসিত হয়েছে, কিন্তু কেবল যদি "এসে গেল" হয় তাহ'লে সে-আসার আদ্যও নেই অন্তও নেই, আর যে-রকম ভাবেই আসুক না কেন, যা এলো সেটা অজ্ঞাতই থাকবে।

চীনে গণতন্ত্রের যখন প্রতিষ্ঠা হ'লো, আমি তখন একটা ছোটো মফঃস্বলের শহরে। বহু আগেই শাদা নিশেন টাঙিয়েছে। একদিন দেখি একদল ছেলে-মেয়ে এদিক-ওদিক লাফালাফি ক'রে বেড়াচ্ছে। শহর থেকে গ্রামে ছুটছে আবার গ্রাম থেকে ছুটে আসছে শহরে। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করতে তারা বল্লে "শোনা যাচ্ছে এসে গেল।"

তাহ'লে বোঝাই যাচ্ছে যে আমারই মতো সবাই কেবল ঐ "এসে গেল"-কেই ডরায়। তাও সে-সময় তো কেবল ছিল "সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ"; "বলশেভিজ্‌ম্‌" তখন ছিল কোথায়?

ওষুধ

লু শ্যুন

হেমন্তের রাত্রি। রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এলো, চাঁদ ডুবেছে আগেই। আকাশটা একটা অন্ধকার নীল চাদর-মোড়া। সব ঘুমিয়ে আছে এখনও; জেগে আছে কেবল নিশাচরেরা, আর হুয়া লাও-স্যুয়ান। হঠাৎ সে বিছানার উপর উঠে বসে। ঝুঁকে পড়ে দেশলাইটা ঘষে সেটা তেল-চিটে একটা বাতিদানে ছোঁয়ায়। ফ্যাকাশে সবুজ রঙের একটা আলো মিটমিট ক'রে ওঠে। সেই আলোয় চোখে পড়ে একটা চটির তুটি মাত্র ঘর।

মেয়েলি গলায় প্রশ্ন হয়, "ও সিয়াও-স্যুয়ানের বাপ, বেরোচ্ছ নাকি?" পিছনের ছোটো ঘরটা থেকে একটা একটানা খ্যান্‌খ্যানে কাশির শব্দ আসে।

"হুঁ।"

লাও-স্যুয়ান খানিকক্ষণ শোনে শব্দটা। তারপর কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, "দাও, ওটা আমাকে দাও।"

হুয়া তা-মা বালিশের তলা ঘেঁটে ছোটো একটা টাকার থলি বার ক'রে দেয়। তাড়াতাড়ি সেটা পকেটে ফেলে পকেটটাকে তুবার চাপড়ে নিয়ে লাও-স্যুয়ান আশ্বস্ত হয়। একটা কাগজের লণ্ঠন জ্বেলে তেলের আলোটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। তারপর লণ্ঠনটাকে হাতে নিয়ে পিছনের ছোটো ঘরটায় চ'লে যায়। একটা খস্‌খস্ শব্দ; তারপর আবার কাশির আওয়াজ। আওয়াজটা থামলে পর লাও-স্যুয়ান নীচু গলায় বলে, "সিয়াও-স্যুয়ান……তুমি উঠতে যেয়োনা……দোকান—সে তোমার মা আছে, সে-ই ঠিক দেখবে।"

ছেলে জবাব দেয় না। লাও-স্যুয়ান ভাবে ও এবার চুপচাপ ঘুমোবে। তাই নীচু দরজার ভিতর দিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। অন্ধকারের ভিতর ছাই রঙের রাস্তার টুকরোটা ছাড়া প্রথমটা আর কিছু চোখে পড়ে না। লণ্ঠনের আলোতে কেবল দেখা যায় ওর পা তুটো তা'লে তালে উঠছে নামছে। তু-একটা কুকুর

এদিক্-ওদিক্ দেখা যায়—তারা চ'লে যায় পাশ কাটিয়ে। একটা ডাকও দেয় না। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে লাও-স্থয়ান চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে, তার মনে হয় যেন যৌবন ফিরে এসেছে তার মধ্যে। ওর ছোঁয়ায় যেন মানুষ জীবন্ত হ'য়ে উঠতে পারে। লাও-স্থয়ান লম্বা লম্বা পা ফেলতে থাকে। ক্রমশঃ আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে, রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়।

এমনই নিজের মনে হাঁটছিল লাও-স্থয়ান যে হঠাৎ সামনে একটা চৌমাথা দেখে সে চমকে ওঠে। প্রথমটা থেমে যায়, তারপর কয়েক পা পিছিয়ে একটা বন্ধ দোকানের দরজার সামনে খাটানো পালের তলায় আশ্রয় নেয়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওর হাতে কাঁপুনি লাগে।

"আ—একটা বুড়ো যে!"

"ফুর্তির প্রাণ! কত ভোরে উঠেছে দেখেছ?"

চোখ মেলে লাও-স্থয়ান দেখে সামনে দিয়ে কয়েকটা লোক চ'লে যাচ্ছে। একজন পিছন ফিরে ওকে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। মুখটা ভালো ক'রে দেখা যায় না, কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছে যেন একটা নির্দয় কামনার দীপ্তিতে, দুর্ভিক্ষের চোখ যেন হঠাৎ খাদ্য দেখেছে। লণ্ঠনটার দিকে চেয়ে লাও-স্থয়ান দেখলো সেটা নিভে গেছে। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে দেখে শক্ত জিনিসটা সেইখানেই রয়েছে এখনও। তখন আবার সে দেখতে থাকে। ক্ষীণ আলোয় মনে হয় ভূতের মতো অদ্ভুত সব মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। খানিকক্ষণ এক-দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর তাদের অদ্ভুত ব'লে মনে হয় না।

ভিড়ের ভিতর কয়েকজন পল্টনকে দেখা যায়। কোর্তার উপর সামনে পিছনে গোল শাদা কাপড় আঁটা, সরকারি পল্টনদের চিহ্ন, বেশ কিছু দূর থেকে চোখে পড়ে। কাছে গেলে ওদের কাপড়ের লাল রঙের পাড়ও দেখা যায়। অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা যায়, একটা ভিড়ের সৃষ্টি হয়।

আশেপাশের ছোটোখাটো দলগুলি একসঙ্গে মিশে গিয়ে এগিয়ে আসে একটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। সেটা গিয়ে পৌঁছয় চৌমাথায়। লাও-স্থয়ানের দিকে পিছন করে ঠিক একটা অর্ধবৃত্তের মতো তারা দাঁড়িয়ে যায়।

গলা বাড়িয়ে সবাই একটা বিশেষ দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় যেন একদল হাঁস। খানিক সব চুপচাপ। তারপর ঐ বাড়ানো গলাগুলোর ও-পাশ থেকে লাও-স্থয়ান যেন একটা শব্দ শোনে। দর্শকদের ভিতর একটা চঞ্চলতা দেখা যায়। হঠাৎ কিসের এক ধাক্কায় সবাই ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যায়। এ ওকে গুঁতো মেরে সরিয়ে

ফেলে ; কে একজন তাড়াতাড়িতে লাও-স্থয়ানকে ধাক্কা মেরে প্রায় মাটিতে ফেলে দিল।

কালো কাপড়ে ঢাকা একজন লোক লাও-স্থয়ানের সামনে এসে চীৎকার ক'রে বলে, "এই! এক হাতে টাকা অন্য হাতে জিনিস, বুঝেছ?" লোকটার চোখে একটা ঠাণ্ডা ইস্পাতের জ্যোতি—যেন একজোড়া তলোয়ার ঝকঝক করছে। লাও-স্থয়ানের মনে হয় যেন সেই তলোয়ার তার আত্মার মধ্যে গিয়ে বিঁধেছে, তার সমস্ত শরীর গুটিয়ে গিয়ে যেন অর্ধেকখানা হ'য়ে পড়েছে। কালো লোকটা শূন্য থাবা ওর দিকে বাড়িয়ে দেয়—অন্য থাবাতে ক'রে এগিয়ে দেয় পুলিপিঠের মতো একটা জিনিস। সেটা তাজা লাল রঙের তরল বস্তুতে সিক্ত—তখনও গরম—ফোঁটা ফোঁটা ঝ'রে পড়ছে মাটিতে।

তাড়াতাড়ি লাও-স্থয়ান নোটগুলো হাতড়াতে থাকে। কালোয় ঢাকা লোকটার হাত থেকে তখনও লাল ফোঁটাগুলো পড়ছে। লাও-স্থয়ান কোনো রকমে ডলারগুলো হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করে কিন্তু ওই ভিজে জিনিসটা নিতে সাহসে আর কুলোয় না।

অসহিষ্ণু হ'য়ে ব্যস্ত স্বরে লোকটা বলে, "ভয় কিসের? নাও না।"

লাও-স্থয়ান তবু ইতস্তত করছে দেখে সে ওর লণ্ঠনটা ছিনিয়ে নিয়ে কাগজের ঢাকনাটা ছিঁড়ে তাই দিয়ে জিনিসটা মুড়ে ফেলে। তারপর সেই কাগজশুদ্ধ লাও-স্থয়ানের হাতে দিয়ে ডলারগুলো ছোঁ মেরে তুলে নেয়। একবার শুধু হাত বুলিয়ে দেখে নেয় টাকাগুলো ঠিক আছে কিনা, তারপর চলে যেতে যেতে গজগজ করে, "ব্যাটা গাধা বুড়ো……"

লাও-স্থয়ানকে কে যেন জিজ্ঞেস করে, "কার রোগ সারাবে?" সে উত্তর দেয় না। ওর সমস্ত মন এখন ওই তাড়াটার দিকে, সেটাকে সে আদর ক'রে জড়িয়ে ধরে যেন সবে ধন নীলমণি! এখন ওর হাতের মুঠোয় আছে যে-সদ্য জীবন-শক্তি তাকে নিয়ে চলেছে ও নিজের বাড়িতে প্রতিরোপণ করবার জন্য—এখন আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না। এর পর থেকে দিনগুলো হবে ওর প্রচুর সুখময়।

আকাশের পারে সূর্য উঠলো। সামনের লম্বা রাস্তাটা সোজা চ'লে গেছে ওর চটি পর্যন্ত। ওর পিছনে প্রভাতের আলো যেন সোহাগভরে পড়েছে চৌমাথার উপর, একটা পুরোনো ফলকের উপর। তাতে ফিকে সোনার জলে লেখা কয়েকটি অক্ষর: 'পুরাতন—দালান—'

২

চটিতে ফিরে লাও-স্যুয়ান দেখে ঘর ধোয়া-মোছা হ'য়ে গেছে, সারি সারি টেবিল পরিষ্কার তক্‌তকে, তবে খদ্দের এখনও আসেনি। কেবল দেয়ালের ধারে একটা টেবিলে সিয়াও-স্যুয়ান একলা ব'সে তার খাবার খাচ্ছে। কপালে তার ঘাম ঝরছে, তার ক্ষীণ কোর্তাটা ঝুলে রয়েছে। কোর্তার তলা থেকে কাঁধের হাড় দুটো ঠেলে উঠেছে। দেখে মনে হয় ওর পিঠে "পা" অক্ষরটা যেন খোদাই করা রয়েছে। লাও-স্যুয়ান ভুরু কোঁচকায়। তার স্ত্রী হন্তদন্ত হ'য়ে রান্নাঘর থেকে মুখ হাঁ ক'রে বেরিয়ে আসে, ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে।

"পেয়েছ ?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি।"

দু'জনে কিছুক্ষণের জন্য রান্নাঘরে গিয়ে কথাবার্তা বলে। হুয়া-তা-মা চট্ ক'রে বাইরে থেকে একটা পদ্মপাতা নিয়ে আসে। সেটা টেবিলের উপর পেতে লাও-স্যুয়ান সেই লাল মোড়কটাকে খুলে পাতা দিয়ে আবার পরিষ্কার ক'রে জড়িয়ে রাখে। এদিকে সিয়াও-স্যুয়ানের খাওয়া হ'য়ে গেছে দেখে তার মা বলে, "খুদে ছিটকিনি চুপ ক'রে বোসো। এদিকে এসো না।"

মাটির উনুনে আগুনের আঁচটা উঠতেই তার বাবা লালে-সবুজে মোড়কটা তার ভিতরে পুরে দেয়। লাল-কালোয় মেশা একটা আগুনের হলকা ওঠে ঘরের ভিতরটা একটা গন্ধে ভ'রে যায়।

ঠিক এই সময় 'পাঁচ নম্বর উটকোপিঠ' এসে ঢোকে, ঢুকেই নাক ফোঁস-ফোঁ করতে করতে বলে—"ওহো! গন্ধটা তো বেশ, কী খাচ্ছ হে তোমরা ?' সকালে সবার আগে এসে সারাটা দিন চটিতে কাটিয়ে রাত্রে সবার শেষে যার বাড়ি ফেরে, এ হচ্ছে তাদেরই একজন। গলির ধারে একটা টেবিলে হুম খেয়ে সে প্রশ্ন করে ; "জমানো ভাত ভাজ্‌ছো নাকি ?"

কেউ কোনো উত্তর দেয় না। লাও-স্যুয়ান নিঃশব্দে তার টেবিলে চা দি যায়।

ঘরের ভিতরে একটা টুল পেতে হুয়া-তা-মা ডাকে, "সিয়াও-স্যুয়ান, ভিত এসো।" 'খুদে ছিটকিনি' এসে বসে। তার থালায় একটা গোল মতো কালে জিনিস দিয়ে মা নীচু গলায় বলে, "এটা খেয়ে নে, আর তোর অসুখ থাকবে না।'

সিয়াও-সূয়ান জিনিসটা তুলে নেয়। খানিকক্ষণ সেটাকে অবাক্ হ'য়ে দেখে মনে হয় ওর প্রাণ-পক্ষীকে ও নিজের হাতেই ধ'রে রয়েছে। বুকের ভিতর তখন ওর তোলপাড় হচ্ছে। খুব সাবধানে ও জিনিসটা খুলে আধখানা করতে থাকে, খানিকটা বাষ্প হুস ক'রে বেরিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। সিয়াও-সূয়ান দেখে জিনিসটা কিছুই নয়—আধখানা-করা একটা ময়দার পুরিয়া মাত্র। দেখতে দেখতে জিনিসটা পেটে চ'লে যায়, এমন কি তার স্বাদের কথাও সে ভুলে যায়। সামনে পড়ে থাকে শূন্য থালাটা, তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার বাবা আর এক পাশে তার মা। অদ্ভুত দৃষ্টিভরা তাদের চোখ, তারা কী যেন একটা দিতে চায় সিয়াও-সূয়ানের ভিতরে আবার সেই সঙ্গে বার করে আনতে চায় আর একটা কিছু।

দারুণ উত্তেজনা! সিয়াও-সূয়ানের ছোট্ট হৃদয়টুকুর পক্ষে এ-যেন বড়ো বেশি। ওর বুক ধড়ফড় ক'রে ওঠে। দু-হাতে বুক চেপে ধ'রে ও কাশতে শুরু করে।

"একটু ঘুমোও এবার, তাহলেই ভালো বোধ করবে।"

মায়ের কথামতো কাশতে কাশতে সিয়াও-সূয়ান ঘুমিয়ে পড়ে। যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ে ওর মা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ওর গায়ে একটা তালিতে আর তাপ্পিতে ভরা শতছিন্ন কাঁথা চাপা দিয়ে চ'লে যায়।

৩

চটির খদ্দের অনেক, কাজেই লাও-সূয়ান বড়ো ব্যস্ত থাকে। ছুটে ছুটে এ-টেবিলে ও-টেবিলে গরম জল আর চা ঢেলে দেয়, মনে হয় যেন এইতেই ওর সমস্ত মন। কিন্তু ওর চোখের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় চোখের তলায় কালি পড়েছে।

জুলপির কাছে একটু পাকা চুল—একজন লোক জিজ্ঞেস করে, "লাও-সূয়ান তোমার শরীরটা যেন খারাপ বোধ হচ্ছে?"

"কিচ্ছু না।"

"না?……ঠিক বটে, ঠিক! এই যে তোমার হাসি ফুটেছে……" ব'লে দাড়িওয়ালা লোকটা নিজেই নিজের কথাটা ঘুরিয়ে নেয়।

'পাঁচ নম্বর উটকোপিঠ' শুরু করে, "লাও-সূয়ান সারাক্ষণই ব্যস্ত। অবশ্য

ওর ছেলে যদি ··” হঠাৎ তার কথা থেমে যায়, বিরাট কুঞ্চিত মুখ একজন লোক প্রবেশ করে। গায়ের কালো কাপড়টা কোনোরকমে কালো পট্টি দিয়ে কোমরে জড়ানো[১]। ঢুকতে ঢুকতে লাও-স্যুয়ানকে চেঁচিয়ে জিগ্‌গেস করে, “খেয়েছে? অ্যাঁ? সেরে উঠেছে তো? লাও-স্যুয়ান, তোমার কপাল ভালো! খুবই ভালো! খবরটা যদি আমি তাড়াতাড়ি না পেতুম······”

এক হাতে কাত্‌লি, অন্য হাতটা একপাশে ঝুলছে—লাও-স্যুয়ান শ্রদ্ধাভরে কথাগুলো শুনে যায়। মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে। অতিথিরা মনোযোগ দিয়ে শোনে, হুয়া-তা-মাও বেরিয়ে আসে, তার নিদ্রাহীন ক্লান্ত চোখ অল্প একটু হেসে ওঠে, তারপর নতুন আগন্তুককে কাঁচা জলপাইয়ের সঙ্গে খানিকটা চা-পাতা দিয়ে যায়। লাও-স্যুয়ান নিজে এসে পেয়ালায় ফুটন্ত জল ঢেলে দেয়।

সেই কর্কশ চেহারার লোকটি চীৎকার ক’রে ওঠে—“একেবারে অমোঘ ওষুধ! অন্য ধরনেরই ওষুধ! ভেবে দেখো—গরম গরম আনা হয়েছে, গরম থাকতে খাওয়ানো হ’য়েছে!”

হুয়া-তা-মা গভীর শ্রদ্ধাভরে জানায়, “সত্যি, বড়ো খুড়ো-কান্ সাহায্য না করলে আর কে ক’রতো।”

“অমোঘ ওষুধ, অমোঘ ওষুধ, গরম থাকতে খাওয়ানো! মানুষের রক্তে চোবানো পিঠুলি যে-কোনো রকমের যক্ষ্মা রোগের ধন্বন্তরী।”

‘যক্ষ্মা’ কথাটায় হুয়া-তা-মার মুখ শাদা হ’য়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। সে সবার অলক্ষ্যেই স’রে যায়। বড়ো খুড়ো-কান্-এর চোখে পড়ে না, কারণ সে তখনও পুরো দমে চীৎকার ক’রে চলেছে। তারপর হঠাৎ চমক ভাঙে যখন ভিতরের যে ঘরে সিয়াও-স্যুয়ান ঘুমোচ্ছে সেখান থেকে খ্যান্‌খ্যানে কাশির শব্দ আসে।

দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা বড়ো খুড়ো-কান্-এর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, “তাহ’লে সত্যি এতোদিন পরে সিয়াও-স্যুয়ানের কপাল ফিরলো? ওর অসুখ নিশ্চয়ই পুরোপুরি সেরে যাবে। তাই না লাও-স্যুয়ানের সারাক্ষণ এতো হাসি।” তারপর গলাটা খাটো ক’রে বলে, “শুনছি আজ যে-ছেলেটার গর্দান নেওয়া হ’লো, সে নাকি সিয়া পরিবারের ছেলে? ছেলেটা কার? আর কী কারণেই বা তার গর্দান গেল বলো তো।”

‘বড়ো খুড়ো’ জবাব দেয়, “কার আবার? সিয়াদের চার নম্বর বৌয়ের

---

[১] জল্লাদের পোশাক।

ছেলে—ঐ পুঁচকেটা!" শ্রোতারা সকলে একাগ্র হ'য়ে ওঠে। তাই দেখে 'বড়ো খুড়ো'র মুখের মাংসপেশীগুলি উঁচিয়ে ওঠে, তার গলা চড়তে থাকে সে বীরস্বরে চীৎকার ক'রে বলে—"পুঁচকেটা বাঁচতে চায়নি। বলে কিনা চাইনে জীবন! ব্যাস্, এই আর কি!"

"আর এবার মানুষ কেটে কিইবা পেলুম? কিছুই লাভ হয়নি! এমন কি আসামীর গায়ের যে-কাপড়গুলো তা-ও ওই লাল চোখ কারারক্ষী আ-ই-সে নিয়ে গেল। সব চেয়ে কপাল ভালো আমাদের লাও-স্থ্য়ান খুড়োর। তার পরেই ভাগ্য খুলেছে জ্যাঠা সিয়ার। সেই তো পুরস্কারটা আসলে পেল! পঁচিশ ভরি রুপো—সমস্তটাই একলার ভাগে। খুচরো একটা পয়সাও কাউকে দেয়নি।"

হাতে বুক চেপে পিছনের ছোটো ঘর থেকে সিয়াও-স্থ্য়ান বেরিয়ে আসে, তার কাশি আর থামতে চায় না। হেঁসেলে ঢুকে এক বাটি পান্তাভাত নিয়ে তখনি খেতে ব'সে যায়। হুয়া-তা-মা কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, "একটু ভালো বোধ করছো? এখনও আগের মতন ক্ষিদে রয়েছে?"

বড়ো খুড়ো-কান্ চট ক'রে সিয়াও-স্থ্য়ানকে একবার দেখেই ঘুরে ব'সে বলতে থাকে, "অমোঘ ওযুধ, একেবারে অমোঘ! তা—জ্যাঠা সিয়া চালাক বটে, যদি ও খবরটা প্রথমে না দিত তাহ'লে তো ওর বাড়ি শুদ্ধু সবার মাথা কাটা পড়তো, সব সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত হ'তো। কিন্তু তার বদলে? কতগুলো রুপো পেলে বল তো?"

"আরে ওই পুঁচকেটা একেবারে অপদার্থ, পচা ডিম! জেলের কর্তাকে কিনা দলে ভেড়াতে চায়, বলে কিনা বিপ্লবে যোগ দাও!"

পিছনের টেবিল থেকে বছর কুড়ির একটি ছেলে মন্তব্য করে, "আই ইয়া! তাহ'লে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো একবার ভেবে দেখো দিকিন!"

"আসলে লাল-চোখো আ-ই ভিতরের কয়েকটা খবর নেবার তালে ছিল তাই না ওর সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়া। লাল চোখোকে ও বলে কিনা ছিং বংশের এই রাজত্ব আসলে আমাদের সকলের।' কথার কোনোও মাথামুণ্ডু আছে? মানুষ এ-রকম কথাও বলতে পারে?

"লাল-চোখো জানতো যে ওর বাড়িতে থাকবার মধ্যে আছেন কেবল ওর মা। কিন্তু ওরা যে এতো গরীব 'এক ফোঁটা তেল-জলও যে নিংড়িয়ে বার করা যাবে না, তা ও ভাবেনি। রাগে এদিকে ওর পেট ফাটছে তবুও ছেলেটা চেষ্টা করছে

‘বাঘের মাথায় হাত বুলোতে।’ কসিয়ে দিয়েছে আ-ই ওর গালে কয়েকটা থাপ্পড়!”

‘পাঁচ নম্বর উটকোপিঠ’ উদ্দীপিত হ’য়ে সায় দেয়, “ঘুসির লড়াই কেমন ক’রে লড়তে হয় আ-ইর তা জানা আছে। ঘুসি মেরে ব্যাটাকে তাহ’লে সায়েস্তা ক’রে দিয়েছে।”

“আরে না—না! বললে বিশ্বাস করবে না ঐ পচা হাড কিন্তু এদিকে ভয়-ডর নেই। ব্যাটা বলে কিনা যে এটা বডোই ক্ষোভের কথা।”

কাঁচা-পাকা-দাড়ি ব’লে ওঠে, “কী? ঐ-রকম একটাকে মারতে গিয়ে দয়া দেখাতে হবে? এর মধ্যে আবার ক্ষোভ কোথায়?”

‘বড়ো খুড়ো’ নাক সিঁটকে বলে, “কী বললুম আর কী শুনলে! পুঁচকেটা বল্লে, আ-ইর জন্যে ক্ষোভ হয়!”

শ্রোতাদের চোখ হঠাৎ ঝিমিয়ে আসে, আলাপ থেমে যায়। ঘামে ভিজে সিয়াও-স্যুয়ান ভাত খাওয়া শেষ করেছে। ওর মাথা দিয়ে যেন ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

“তাহলে দয়ার পাত্র হ’লো লাল-চোখো—অ্যাঁ? এ-তো একেবারে বিশুদ্ধ পাগলামো!” এই কথাটা ব’লে কাঁচা-পাকা-দাড়ি মনে করে সে ব্যাপারটাব সম্পূর্ণ সমাধান ক’রে দিয়েছে। বেশ একটু দেমাকি চালে ব’লে ওঠে, “মাথাটা যে খারাপ হ’য়ে গিয়েছিল তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।”

আগের সেই ছোকরাটি সায় দিয়ে বলে, “হ্যাঁ, পাগলই বটে!” তারও মনে হয় সে-ও একটা মস্ত জিনিস আবিষ্কার করেছে।

চটির অন্যান্য খদ্দেরদের ভিতর একটা স্থিরতা আসে। আবার হাসি আর গল্প শুরু হয়। গোলমালের অবকাশ পেয়ে সিয়াও-স্যুয়ান তার ক্ষীণ শক্তিতে যতোটা কুলোয় তারই জোরে একবার ঘংঘং ক’রে কেশে ওঠে।

বড়ো খুড়ো কান্ ছেলেটির কাছে গিয়ে পিঠ চাপড়ে বলে, “অমোঘ ওষুধ সিয়াও-স্যুয়ান! ও-রকম ক’রে কেশো না। অমোঘ ওষুধ!”

পাঁচনম্বর উটকোপিঠ মাথা নেড়ে বলে, “শেষটা পাগল হ’য়ে গেল!”

৪

শহরের পাঁচিলের পশ্চিম-ফটকের লাগাও যে-জমিটা সেটা আসলে জনসাধারণের। জমিটার মাঝ দিয়ে একটা সরু পায়ে-চলা-পথ এঁকে-বেঁকে গেছে—এটার

উৎপত্তি হয়েছিল লোকে পায়ে হেঁটে চট-জলদি রাস্তা করতে গিয়ে, পরে সেইটেই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল একটা সীমান্ত-রেখার মতো যার বাঁদিকের জমিতে কবর দেওয়া হ'তো প্রাণদণ্ডের আসামীদের আর সেই সব আসামীদের যারা কারাগারে না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে ; আর ডান দিকের জমিটা ছিল কাঙালিদের কবরভূমি। এই সব কবরের সংখ্যা এতো বেশি আর এতো ঘেঁষাঘেঁষি যে দেখে মনে হয় যেন বড়ো লোকের বাড়িতে কারো জন্মতিথির দিনে সাজানো মিষ্টির থালা।

কবর দেখতে যাবার যে 'স্বচ্ছ পরিষ্কার দিন'—সেদিনটা হয়েছিল এবারে বড়ো ঠাণ্ডা! উইলো গাছের পাতার কুঁড়িগুলি সবেমাত্র বেরিয়েছে ভাঙা চালের দানার মতো। এইমাত্র হুয়া-তা-মা ডানদিকে নতুন কবরটার উপর চারটে মাছ আর এক বাটি ভাত রেখে চোখের জল ফেলেছে আর পুড়িয়েছে কয়েকটা নকল নোট। এখন স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছে মাটির উপর যেন কিসের অপেক্ষায়, কিন্তু কিসের জন্য যে অপেক্ষা তা সে নিজেই জানে না। মৃদু হাওয়া বয়ে যায়—ওর ছোটো চুল কাঁপতে থাকে। চুলের রঙটা গত বছরের থেকে এ-বছরে আরও বেশি শাদা হ'য়ে গেছে।

সরু রাস্তা বেয়ে আর একজন মেয়ে আসে, তার মাথায় পাকা চুল, গায়ে শতছিন্ন ন্যাকড়া, হাতে পুরোনো গোল একটা চুপড়ি—লাল গালার কাজ করা, ভিতর থেকে কাগজের থোপনা ঝুলে রয়েছে। সে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে, মাঝে মাঝে থেমে যায়। শেষে তার চোখ পড়ে হুয়া-তা-মার দিকে। হুয়া-তা-মা তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে একটু বিব্রত বোধ করে, ইতস্তত করতে থাকে। তার ফ্যাকাশে বিষণ্ণ মুখের উপর একটা লজ্জার ছায়া নেমে আসে। তারপর যেন বুক বেঁধে নিয়ে এগিয়ে যায় রাস্তার বাঁদিকের একটা কবরের কাছে ; গিয়ে তার গালার চুপড়িটা নামিয়ে রাখে।

এই কবরটি ছিল সিয়াও-স্যুয়ানের কবরের ঠিক উল্টো দিকে, মাঝে শুধু সরু একখানি রাস্তা। মেয়েটি চারটি মাছ রাখল, ভাতের বাটি রাখল, নকল নোট পোড়াল আর চোখের জল ফেললো—হুয়া-তা-মা যন্ত্রচালিতের মতো দেখে যায়। হুয়া-তা-মার মনে হয় যে ও-কবরটাতেও তো মায়েরই ছেলে রয়েছে। সে অবাক হ'য়ে দেখতে থাকে, মেয়েটি অন্যমনস্ক হ'য়ে বেড়াচ্ছে, আকাশে তার শূন্য দৃষ্টি। হঠাৎ দেখতে পায় মেয়েটি কাঁপতে আরম্ভ করেছে ; পিছনে টলে পড়ছে অচৈতন্যের মতো।

হুয়া-তা-মার মন কেঁদে ওঠে। হয়তো বেচারা দুঃখে পাগল হ'য়ে গেছে!

সে উঠে রাস্তার ওপারে গিয়ে আস্তে আস্তে বলে, “আর কেঁদো না মা। চলো আমরা দু’জনে বাড়ি ফিরি।” মেয়েটি বোকার মতো মাথা নাড়ে, খোলা চোখ দু’টো এখনও যেন কী দেখছে। হঠাৎ সে ব’লে ওঠে, “দেখ, দেখ, ওটা কী?”

যেদিকে মেয়েটি আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে সেইদিক বরাবর তাকিয়ে হুয়া-তা-মা দেখে সামনে একটা অযত্নের কবর, তাতে এবড়ো-খেবড়ো বিশ্রি রকমের হলদে মাটির ছোপ। সেই দিকে আর একটু লক্ষ্য করতেই চমকে উঠে সে দেখতে পায় ঢিপিটার উপরে এক গোছা লাল আর শাদা ফুলের বেষ্টনী।

অনেক বছর হ’য়ে গেল এরা দু’জনেই চোখে ভালো দেখতে পায় না। কিন্তু এখন দু’জনেরই এই টাটকা ফোটা ফুলগুলি চোখে পড়ে। বেশি নয়, কিন্তু ফুলগুলি যেন নিপুণ হাতে সাজানো। চটকদার কিছু নয় বরং শান্ত এবং সুশৃঙ্খল। হুয়া-তা-মা চট ক’রে একবার নিজের ছেলের কবরের দিকে আর অন্যান্য কবরের দিকে তাকিয়ে দেখে নেয়! এখানে-ওখানে দু-একটা নীল আর শাদা ফুল ফুটে আছে এখনও শীতের সঙ্গে লড়াই ক’রে, কিন্তু এমন রক্তের মতো রাঙা ফুল আর কোথাও নেই। ওর মনে হয় হৃদয়ের মধ্যে কিসের যেন একটা অজানা অভাব; কী যেন চাই, কিন্তু কী, তা জানবার কোনো আগ্রহ নেই। অন্য মেয়েটি এগিয়ে এসে ফুলগুলি ভালো ক’রে দেখে। ভাবে, এর অর্থ কী? তার চোখ দিয়ে জল পড়ে, তারপর সে চেঁচিয়ে ওঠে:

“ইউ, বাপ আমার! তোর উপর অন্যায় করা হয়েছে কিন্তু তা তুই ভুলিসনি। তোর মনে কি এখনও কষ্ট? তাই কি তুই আজকের দিনটি বেছে নিয়ে এই উপায়ে আমাকে তোর মনের কষ্ট জানাচ্ছিস?” সে চারিদিকে একবার চেয়ে নেয়। দেখে পত্রহীন একটা গাছে শুধু একটা ঝিমন্ত কাক ব’সে আছে। সে ব’লে চলে “ইউ, ইউ, বাছারে! তোকে ফাঁদে ফেলেছিল। তোকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে। তবু ভগবান তা জানেন! ঘুমো তুই শান্তিতে, কিন্তু আমাকে একটা চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দে যে তুই কবরের ভিতর থেকে আমার কথা শুনছিস। এই কাকটাকে উড়িয়ে তোর এই কবরের উপর বসা। তাহ’লেই আমি জানতে পারবো।”

হাওয়া বন্ধ হ’য়ে গেছে, চারপাশে শুকনো ঘাসগুলো তামার ফলকের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে। একটা কিসের ক্ষীণ শব্দ বাতাসে ভাসতে থাকে, কাঁপতে থাকে, তারপর ক্রমে ক্ষীণতর হ’তে হ’তে আর শোনা যায় না। তারপর সব

কিছু স্তব্ধ হ'য়ে যায় মৃত্যুর মতো। শুকনো ঘাসের মাঝে দুই বুড়ি দাঁড়িয়ে কাকটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। গাছের সরল ডালপালাগুলোর মাঝে মাথাটা গুটিয়ে নিয়ে কাকটা ব'সে থাকে, স্থির নিশ্চল, যেন লোহায় ঢালাই।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। কবর দেখতে যারা আসে তাদের দল ক্রমে বাড়তে থাকে। হুয়া-তা-মার মনে হয় তার অন্তর থেকে একটা ভারি বোঝা নেমে যাচ্ছে। অপর মেয়েটিকে উদ্দেশ ক'রে সে বলে, "চলো, এবার আমরা যাই।"

বুড়ি নিরাশ হ'য়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার উৎসর্গের পাত্রগুলো তুলে নেয়। তবু এক মুহূর্ত সে দেরি করে; তারপর ধীরে চ'লে আসে, মনে মনে বিড়বিড় ক'রে বলতে বলতে "কী এর অর্থ?"

তারা মাত্র হাত ত্রিশেক গিয়েছে এমন সময় মাথার উপর একটা কর্কশ শব্দ শোনা যায়ঃ "কা-আ-আ-আ—"

শিউরে উঠে পিছন ফিরে তারা দেখে কাকটা খাড়া হ'য়ে ওঠে, তারপর গাছ ছেড়ে দিয়ে তার প্রশস্ত ডানা মেলে তীরের মতো দূর দিগন্তের দিকে উড়ে যায়।

বিবাহচ্ছেদ

লু শ্যুন

“এই যে মু খুড়ো! নববর্ষের শুভ-ইচ্ছা জানাই।”

“তারপর, কী রকম আছো পা-সান? নববর্ষের শুভ-ইচ্ছা নাও।”

“আরে! আরে! শুভ-ইচ্ছা জানাই নববর্ষের। এই যে আই-কুও যে এখানে দেখছি……”

“নমস্কার মু দাদু, নমস্কার……”

মু-লিয়েন সাঁকোর ঘাট থেকে চুয়াং-মু-সান (মু খুড়ো) আর তাঁর মেয়ে আই-কু নৌকোর পাটাতনে পা দিতেই নৌকোর কামরার ভিতর থেকে অনেকগুলো গলার স্বর এইভাবে উত্থিত হয়। কোনো কোনো যাত্রী চীনা কায়দায় কুর্নিস করে আর চারজন তাঁদের জায়গা দিতে উঠে দাঁড়ায়। চুয়াং-মু-সান তাদের প্রতি-নমস্কার জানিয়ে তামাকের লম্বা নলটা নৌকোর গায়ে হেলান দিয়ে রেখে ব'সে পড়েন। আই-কু তাঁর বাঁ পাশে পা-সানের ঠিক সামনে বসে।

কাঁকড়ার খোলের মতো মুখ একজন লোক জিজ্ঞেস করে “শহরে যাওয়া হ'চ্ছে নাকি মু দাদু?”

“না শহরে নয়।” এই ব'লে তিনি উত্তর দেন। তাঁর গলার স্বরটা কিছু বিষণ্ণ মনে হ'লো, কিন্তু তাঁর রোদে-জলে-পোড়া রেখাময় মুখের খুব তেমন একটা ভাব-বদল হ'লো না। “এই, একবার ফাং গ্রামে ঘুরে আসতে যাচ্ছি।”

কিছুক্ষণের জন্যে সবাই চুপ ক'রে গিয়ে বৃদ্ধ আর তাঁর মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পা-সান অবশেষে জিজ্ঞেস ক'রে ফেল্লে—“আবার সেই আই-কুর ব্যাপার তো?”

“হ্যাঁ আই-কুরই বটে। সত্যি আমায় ভাবিয়ে ভাবিয়ে মেরে ফেললে। এমনিতেই তিন বছরেরও বেশি গড়িয়েছে—কতো ঝগড়া, কতোবার মিটমাটের কথা হ'লো! তবু শেষ পর্যন্ত কোনোই সুরাহা হয় না……”

"তা হ'লে আবার সেই ওএইর বাড়িতেই, অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ, আবার সেই ওএইএর ওখানে। ও তো বহুবার চেষ্টা ক'রেছে আই কুর আর আই কুর স্বামীর মধ্যে একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবার, কিন্তু আমি ওর সর্ত্ত বাতিল ক'রে এসেছি। যাক্ গিয়ে, এবার ওরা নববর্ষের উৎসব করছে, আর তা ছাড়া সপ্তম তরফের কর্ত্তাবাবুও উপস্থিত থাকবেন।

পা-সানের চোখ দুটো খুব বড়ো বড়ো হ'য়ে যায়, বলে—"সপ্তম তরফের কর্ত্তাবাবু! বুড়ো কর্ত্তাও এবার তাহ'লে এর মধ্যে মাথা গলাচ্ছেন?"

মু খুড়ো নীচের দিকে চেয়ে ব'লতে থাকেন—"সত্যি কথা ব'লতে কি, গত বছর আমরা ওদের হেঁসেলের উনুন ভেঙে দিয়েছিলুম, তাতে ক'রে আবহাওয়াটা একটু বিষিয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া, দেখতে গেলে স্বামীর কাছে গিয়ে আই-কুর থাকবার এখন আর কোনো মানে হয় না—বড়ো দেরি হ'য়ে গেছে।"

আই-কু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে "তা ছাড়া আমিও আর ফিরে যেতে চাই না। আমি সহজে ভোলবার পাত্র নেই। ভেবে দেখ একবার! জানোয়ারটা কোথা থেকে একটা বিধবা জুটিয়ে এনে আমাকে চায় ভাগাতে। কিন্তু বিয়ে-করা বৌকে খেদিয়ে দেওয়া কি অতোই সোজা? আবার বুড়ো জানোয়ারটাও ছেলের পক্ষ নিয়ে আমাকে হটাতে চায়। ভারি সোজা কিনা! কেন সপ্তম তরফের কর্ত্তাবাবু নেই! হাকিমের সঙ্গে ভাই পাতিয়েছেন ব'লে তিনিও কি অবিচার করবেন? তিনি তো ওএইএর মতো অ-বুঝ নন যে কেবল ব'লে যাবেন 'আলাদা হ'য়ে যাওয়াই ভালো, আলাদা হ'য়ে যাওয়াই ভালো।' এই ক'বছর যে কী কষ্ট স'য়েছি আমি, সব কথা তাঁকে আমি ব'লবো, তারপর দেখি তিনি কার দিকে রায় দেন।"

আই-কুর কথার তোড়ের সামনে পা-সান চুপ ক'রে যায়।

আর কেউই কথা বলে না। কেবল নৌকোর অগ্রভাগে জলের ছল ছল শব্দ ওঠে। চুয়াং-মু-সান হাত বাড়িয়ে তাঁর নলটা টেনে নিয়ে তাতে তামাক ভরেন। পা-সানের পাশে-বসা মোটা লোকটা তার ট্যাঁক থেকে চকমকি বার ক'রে ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে মু খুড়োর সামনে ধরে।

মু খুড়ো ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন "এতো খাতির?"

মোটা লোকটি জবাব দেয় "এই আমাদের প্রথম পরিচয়, কিন্তু আপনার নাম আমি বহুদিন আগেই শুনেছি। 'সাগর-ঘেঁষা আঠারো গ্রাম'এ এমন কি

কেউ আছে যে আপনাকে চেনে না? ঐ সী ছোকরা একটি বিধবার খর্পরে প'ড়েছে এ আমরা সকলেই কিছুকাল ধ'রে শুনছি। তাই গত বছর আপনি আপনার ছয় ছেলের সঙ্গে গিয়ে যখন ওদের হেঁসেল ভেঙে দিয়ে এলেন তখন এমন কি কেউ ছিল যে মানেনি যে ওদের প্রাপ্য আপনি ওদের পাইয়ে দিয়েছেন? আপনি বড়ো দরজা দিয়ে আনাগোনা করেন, আপনার খাতিরে বড়ো বড়ো ফটক খুলে যায়, আপনার যথেষ্ট সম্মান, ওরা আপনার কী ক'রবে?"

আই-কু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে—"এই তো একজন সমঝদার লোক, যদিও আমি জানিনা উনি কে!"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসে—"আমার নাম ওয়াং তে-কুএই।"

আই-কু আবার বলে—"এ-রকম ক'রে আমাকে ওরা ঠেলে ফেলে দিতে পারবে না, তা সে ওরা সপ্তম কর্ত্তাবাবুকেই ডাকুক আর অষ্টম কর্ত্তাবাবুকেই ডাকুক! আমি ঠিক লেগে থাকবো আমার প্রাপ্য আঁকড়ে যতোদিন না ওদের বাড়ি ধ্বসে পড়ে আর ওদের মানুষগুলো সবাই মরে। চার চার বার ওএই কি একটা কিছু নিষ্পত্তির জন্যে আমাকে ধ'রে পড়েনি? চুক্তির টাকার অঙ্কটা দেখে এমন কি বাবারও মাথা ঘুরে গিয়েছিল।"

দাঁতে দাঁত চেপে চুয়াং-মু-সান বলেন "তোর মায়ের মাথা খাস্।"

কাঁকড়া-খোল-মুখো পা-সান্ টিপ্পনী কাটে—"আচ্ছা মু খুড়ো এটা তো সত্যি যে সী পরিবার গত বছর ওএইকে একটা ভোজ দিয়েছিল?"

ওয়াং তে-কুএই বলে—"ও-কথা ছেড়ে দাও! শুধু একটা ভোজেই কি মানুষের মাথা এমন ঘুরে যাবে যে সে তার বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেল্‌বে? তাই যদি হয় তাহ'লে তো আমরা তাদের একটা বিলিতি খানা দিয়ে দেখতে পারি। যাঁদের পুরাণ পড়া আছে আর যাঁরা যুক্তি-যুক্ত তাঁরা সব সময়েই সুবিচার করেন। যেমন ধরো, একজন লোকের প্রতি যদি পাঁচজনে অসৎব্যবহার করে তখন এঁরাই তো এগিয়ে আসেন সে বেচারার পক্ষ নিয়ে দাঁড়াতে, তাতে তার বদলে মদ পাওয়া যাক আর নাই যাক্। এই তো গেল-বছর আমাদের ঐ পোড়া গাঁয়ের ইয়ুং তা-ইয়ে পেইচিং থেকে ফিরে এলো। সে বারা পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখেছে—আমাদের মতো তো আর নয়। সে বল্লে, পেইচিংএ শ্রীমতী কুয়াং ব'লে একজন আছেন—"

মাঝি চেঁচিয়ে ওঠে—"ওয়াং ঘাটা! ওয়াং ঘাটার লোক নামবেন।"

"এই যে আমি আছি।" ব'লেই মোটা লোকটা তাড়াতাড়ি তার তামাকের নলটা তুলে নিয়ে চলন্ত নৌকোর কামরা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। নৌকোটা পারের কাছে আসতেই সে লাফিয়ে নেমে পড়ে। তারপর সে ফিরে ছোটো নৌকোটায় যারা রইলো তাদের ভদ্রতা ক'রে বিদায় নমস্কার জানায়। নৌকোটা তখন আবার চ'লতে আরম্ভ ক'রেছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল কানে আসছে দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শব্দ।

সামনে আই-কুর পায়ের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পা-সান ঘুমিয়ে প'ড়লো। পিছনের কামরায় দুই বুড়িও আই-কুর দিকে তাকিয়ে "বুঝেছি সব" এইভাবে ঘাড় নাড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের নাম মালায় জপতে থাকে।

আই-কু মাথার উপর চাঁদোয়ার দিকে তাকিকে চিন্তামগ্ন হয়। ভাবে, কী ক'রে তার স্বামীর স্বজনদের এমনভাবে জব্দ করা যায় যে "ওদের বাড়ি ধ্বসে পড়ে আর ওদের মানুষগুলো সবাই মরে" যাতে ক'রে খুদে জানোয়ারটা আর বুড়ো জানোয়ারটা দুটোই একেবারে আটকা প'ড়ে যায়। সে ওএইকে বহুবার দেখেছে, তাকে ও ভয় করে না। লোকটা মোটা, বামনের মতো, মাথাটা গোল, ওর নিজের গ্রামেই তো ঐ রকম কতো লোক আছে। কেবল তারা একটু বেশি কালো।

চুয়াং-মু-সান্ তাঁর তামাকটা শেষ অবধি টানেন। শেষ হ'য়ে গেলে একটা চী চী শব্দ বার হয়। তিনি তবুও টেনে চলেন। উনি জানেন যে এই ওয়াং ঘাটার পরই ফাং ঘাটা আর বেশি দূর নয়। এরই মধ্যে গ্রামের মুখে পরীক্ষার দেবতা কুএই-সিন্‌এর মন্দির দেখা যাচ্ছে। ভয়টা আবার কিসের? উনি তো ফাং-গ্রামে একাধিকবার গেছেন; তাতে আর ভাববার কী আছে? এমন কি ওএইকে নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে না।

যেদিন ওঁর মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছে সেদিনকার কথা বুড়ো মুর স্পষ্ট মনে আছে। খুদে জানোয়ারটা আর বুড়ো জানোয়ারটার প্রতি তাঁর কী ঘৃণা! প্রতিহিংসা নেবার জন্যে সেদিন তিনি পণ ক'রেছেন। সমস্ত ঘটনাটা আবার তাঁর মনে প'ড়ে যায়। ওঁর বেয়াইদের যেদিন উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে এসেছিলেন সেদিনকার সেই দৃশ্যটা যখন ওঁর মনের মধ্যে ভেসে উঠতো তখন সাধারণতঃ উনি মনে মনে ঘৃণা আর সন্তুষ্টিতে মেশানো একটা হাসি হাসতেন। কিন্তু এবারে আর তা হ'লো না। কোনো কারণে সপ্তম তরফের কর্তাবাবু এবারকার দৃশ্যটা আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন। সমস্ত ছবিটার মাঝখানে

তিনি দাঁড়িয়ে সেটাকে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়ে তার ঢঙই পুরোপুরি বদলে দিয়েছেন।

নৌকো এগিয়ে চলে, কেউ কথা বলে না, শুধু বুড়িদের মালা জপার গুন্ গুন্ শব্দ শোনা যায়। আর সবাই মনে হয় আই-কু আর চুয়াং-মু-সানেরই মতো ঐ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা ক'রছে।

"ফাং গ্রামে এলুম—মু খুড়ো। আপনার পরম পূজ্য দেহ নিয়ে এইখানে নামুন।"

হঠাৎ চটকা ভেঙে চুয়াং-মু-সান চোখ তুলে দেখেন সামনেই কুএই-সিনএর মন্দির। আই-কু তাঁর পিছু পিছু ঘাটে নেমে আসে। মন্দির ছাড়িয়ে তাঁরা যেদিকে ওএইর বাড়ি সেইদিকে চ'লতে থাকেন। সেইখানেই দুই পরিবারের মধ্যে কথাবার্ত্তা হবে।

দক্ষিণদিকে খান ত্রিশ বাড়ি ছাড়িয়ে একটা মোড় ঘুরে ওএইর বাড়িতে এসে পৌঁছন। বড়ো ফটকটার সামনে কালো পালের চারটে নৌকো নঙ্গর করা র'য়েছে দেখা যায়।

কালো গালার চৌকাঠ পার হ'তেই দরোয়ান তাঁদের নমস্কার জানিয়ে ভিতরকার ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। দরোয়ানের পিছনে চোখে পড়ে দু'খানা টেবিল ঘিরে কয়েকজন মাঝি আর চাষী প্রজা ব'সে রয়েছে। আই-কু একবার চট্ ক'রে চোখ বুলিয়ে নেয়, খুদে জানোয়ারটা অথবা বুড়ো জানোয়ারটা সেখানে আছে কিনা।

এই সব মজুররা তাদের নববর্ষের সন্দেশ আর চা বার ক'রে ওদের দিকে এগিয়ে দেয়, আর আই-কু ঠিক বুঝতে পারে না কেন, কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তিতে প'ড়ে যায়। সে সপ্তম তরফের কর্ত্তাবাবুর বিষয়ে ভাবতে থাকে। হাকিমের সঙ্গে ভাই পাতিয়েছে ব'লেই সে সুবিচার করতে পারবে না, একি সম্ভব? "যারা পুরাণ পড়েছে, যারা সুবিচারক তারা সর্ব্বদাই পীড়িতদের সহায়।" এই কথাটা ওর মনে জাগে "সপ্তম তরফের কর্ত্তাবাবুকে আমি সব খুলে ব'লবো—পনের বছর বয়সে আমার বিয়ের দিন থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত কথা······"

জলযোগ সারবার পর বাপ আর মেয়েকে বড়ো ঘরের ভিতর দিয়ে মোড় ঘুরিয়ে অতিথিদের ঘরে নিয়ে আসা হয়। ঘরটা বিলাসিতায় ভরা। চারিদিকে এতো আসবাব যে আই-কু সবগুলো দেখবার সময়ই পায় না। বেগুনি আর

নীল সাটিনের কোর্ত্তা পরা এতো অতিথি যে ঘরটা মনে হয় জল্ জল্ করছে। এই জাঁকজমকের মধ্যিখানে যিনি ব'সে আছেন তাঁকে দেখেই আই-কু স্থির করলে ইনিই নিশ্চয় সপ্তম তরফের কর্ত্তাবাবু। তিনি বৃহদ্বপু, মাথাটাও গোলাকার, তবুও ওএইর চেয়ে তিনি লম্বা আর চওড়াও বটে। তাঁর চক্‌চকে কালো গোঁফের উপর দিয়ে সরু চোখ দুটো উঁকি দিচ্ছে। মাথার উপরটা সবটাই টাক কিন্তু তাঁর মসৃণ নরম মুখে টকটকে একটা ভাব। এই অদ্ভুত জৌলুষ লক্ষ্য ক'রে আই-কু খানিকক্ষণের জন্য অবাক হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই ও সিদ্ধান্ত ক'রে নেয় যে শূয়োরের চর্ব্বি ঘষার গুনে এটা হ'য়েছে।

সপ্তম তরফের কর্ত্তা হাতে একখণ্ড জেড্ পাথর নিয়ে গর্ব্বিত-কণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন "এটা হ'চ্ছে একটা গুহ্য-রোধ—পুরাকালীন প্রথামতো আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দেহের সঙ্গে এটাকে মাটি চাপা দেওয়া হ'য়েছিল।" জিনিসটা দিয়ে একবার নাক চুলকে নিয়ে তিনি ব'লে চলেন "এটা পাওয়া গেছে মোটামুটি আধুনিক কালের এক কবর থেকে, এই যা দুঃখ। এটা হান' বাজ্যের যুগের চেয়ে পুরোনো হবে না! যাই হোক্ এটার মালিক হওয়া ভাগ্যের কথা। দেখো না একটা পারার দাগ; মৃতদেহ যাতে শীঘ্র না নষ্ট হ'য়ে যায় সেইজন্যে দেহের মধ্যে পারা দেওয়া হ'তো—তাইতে দাগ লেগেছে।"

কয়েকটা মাথা একসঙ্গে কর্ত্তা কী বলছেন দেখবার জন্যে গুহ্যরোধটাব উপর ঝুঁকে পড়ে। তার মধ্যে একজন অবশ্য ওএই। বাদ বাকিরা ধনী ছোকরার দল—সপ্তম কর্ত্তার বিরাট বপুর পিছনে আই-কু তাদের এতক্ষণ দেখতেই পায়নি।

আই-কু উপরি-উক্ত কথাবার্ত্তার শেষের অংশটা ঠিক বুঝতে পারে না। তা ছাড়া 'পারার দাগ'এর ঠিক ব্যাখ্যাটা কী এখন ও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ ক'রতেও সাহস করে না। তাই, মাথাটা ফিরিয়ে সে ঘরের চারদিকটা দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করে ঠিক তার পিছনে খুদে জানোয়ার আর বুড়ো জানোয়ার—দুটোই র'য়েছে। দরজার কাছে দেয়াল ঘেঁসে তারা দাঁড়িয়ে। এক দৃষ্টিতেই আই-কু দেখে নেয় যে ছ'মাস আগেও তাদের যা দেখেছিল, দুজনকেই তার থেকে এখন আরও বুড়ো আরও যেন অবসন্ন দেখাচ্ছে।

হঠাৎ সবাই চ'লে যায়, আর 'পারার দাগ'-ওয়ালা চমৎকার জেড্‌টা

। হান্ বংশ খৃষ্ট-পূর্ব ২০৬ অব্দ থেকে ২২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ওএইএর কাছে প'ড়ে থাকে। আদর ক'রে আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে জেড্‌টা ঘোরাতে ঘোরাতে চুয়াং-মু-সান্‌এর দিকে ফিরে সে বলে—

"শুধু আপনারা দু'জনে?"

"হ্যাঁ।"

"ছেলেরা কেউ এলেন না?"

"তারা বড়ো ব্যস্ত।"

"সত্যি বলতে কি, আপনিই বা কেন এই নববর্ষের সময় তার উপর মাসের এই প্রথমেই এই সব নিয়ে মাথা ঘামান? কিন্তু কী আর করা যায়, সেই একই ব্যাপার নিয়ে কতো ঝগড়াই তো হ'য়ে গেল। এই নিয়ে দু' বছরেরও উপর হ'য়ে গেল না কি? আমি তো বলি, আবার নতুন গোলযোগের সৃষ্টি না ক'রে পুরোনো জটটাই খোলা ভালো। আই-কু যখন স্বামীর সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতেই পারেনি, তা ছাড়া শ্বশুর-শাশুড়িও যখন ওকে ভালো চোখে দেখেন নি, তখন, আমি যা বরাবর ব'লে আসছি—আলাদা হ'য়ে যাও, আলাদা হ'য়ে যাও। আমার কথা যে লোকে মানবে এ-রকম পদ-মর্য্যাদা আমার নেই, কিন্তু এই তো সপ্তম তরফের কর্ত্তাবাবু, সুবিচারের প্রতীক, এখানে র'য়েছেন, তিনিও আমার মতে মত দিয়েছেন। তিনি অবশ্য বলেন দু'দলই কিছু কিছু ত্যাগ-স্বীকার ক'রে নিক, তারপর একটা মিটমাট হ'য়ে যাক্! সী পরিবার আরও দশ ডলার বেশি দিয়ে নব্বই ডলারে নিষ্পত্তি ক'রতে রাজি হ'য়েছে।"

"নব্বই ডলার! স্বয়ং সম্রাটের কাছে গেলেও এই বিধান আপনি পেতেন না। কেবল সপ্তম কর্ত্তাবাবুই এমন উদার ব্যবস্থার কথা ব'লতে পারেন।"

কর্ত্তাবাবু তাঁর সরু চোখ খুলে বড়ো ক'রে চুয়াং-মু-সান্‌এর দিকে চেয়ে সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়েন।

আই-কু বুঝতে পারে ব্যাপারটা একটা সঙ্কটের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের ধারের প্রজারা যাঁর ভয়ে তটস্থ তার সেই বাবাকে আজ এতো বিনম্র দেখে সে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। যেন একটা কথাও তাঁর আর বলবার নেই! এই ভয়ের কোনো কারণই আই-কু খুঁজে পায় না। ভয় পাবার কী আছে? জেড্‌এর টুকরো সম্বন্ধে সপ্তম কর্ত্তার বক্তব্য সে শুনেছে, আর যদিও সে কথাগুলোর গূঢ় ,অর্থ সব বুঝতে পারেনি, তা হ'লেও তার মধ্যে ভয় পাবার

এমন কিছুই তো সে খুঁজে পায়নি। উল্টে ওর মনে হয় সপ্তম কর্ত্তা বেশ দরাজ পুরুষ। তার আগে যেমন মনে হ'য়েছিল জুলুমবাজ, তা মোটেই নয়। তাই সে সাহসে ভর দিয়ে বলে—

"সপ্তম কর্ত্তা একজন জ্ঞানী বিদ্বান লোক, গ্রাম্য আমাদের মতন মোটেই নন। কোন্‌টা ঠিক সে জ্ঞান তাঁর আছে। আমার প্রতি অন্যায় করা হ'য়েছে, আমি তার বিচার প্রার্থনা করি।

"সী পরিবারে বউ হ'য়ে আসবার পর আমি অনুগতা পত্নীর যা কিছু কর্তব্য করণীয় সবই প্রাণ দিয়ে ক'রেছি। আমি নত-মস্তকে বাড়ির প্রত্যেক ক্রিয়াকর্ম সুসম্পন্ন করেছি। কিন্তু গোড়া থেকেই ওরা আমার সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করেছে যেন ওঁরা স্বয়ং ভগবান—শয়তানকে খেদিয়ে বেড়াচ্ছেন। একবার যখন বেজিতে ওদের একটা মুর্গী নিয়ে গেল, ওরা আমাকে দোষ দিয়ে বল্লে আমিই নাকি মুর্গীর ঘর বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলুম। আসলে ওদের ঐ লেড়ী কুত্তাটা—ব্যাটার মাথা কাটা যাক—মুর্গীর ঘরের দরজা ঠেলে চালের কুঁড়ো চুরি করতে গিয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছু খোঁজ না নিয়ে, সবুজ, লাল, কালো আর শাদার মধ্যে কোনো তফাৎ না ধ'রে খুদে জানোয়ারটা আমার গালে চড়িয়ে দিল।"

সপ্তম কর্ত্তা একবার আই-কুর দিকে তাকালেন।

"আমি তখনই মনে ক'রেছিলুম এর একটা অন্য কোনো কারণ আছে—সপ্তম কর্ত্তা! আপনি পুরাণ পড়েছেন, আপনি জ্ঞানী লোক, সব কিছু আপনার জানা আছে, অতএব এই সত্যটা নিশ্চয়ই আপনি উপেক্ষা ক'রবেন না। এই রকম ব্যবহারের আর কোনই অর্থ ছিল না, কারণ তখনই ও সেই কলুষিত বেশ্যার প্রণয়-মুগ্ধ হ'য়েছে। তাই আমাকে দূর ক'রবার এই চেষ্টা। কিন্তু তিন রকম চা আর ছ'রকম উপহার দিয়ে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হ'য়েছে, ফুলের দোলায় চাপিয়ে বৌ ক'রে আমায় বাড়িতে আনা হ'য়েছে। আমাকে কি আর অতোই সহজে ফেলে দেওয়া যায়? আমি বিচার চাই, আমার তেজ একবার আমি ওদের দেখিয়ে দেবো, তাতে যদি বিচারালয়ে যেতে হয় তবু স্বীকার। যদি ছোটো হাকিমের বিচারে আমি সন্তুষ্ট না হই তা হ'লে আমি বড়ো হাকিমের কাছে যাবো।"

ওএই ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে "সপ্তম কর্ত্তার এ-সবই জানা আছে। আই-কু, তোমার মতিগতি যদি না বদলাও তো কিছুই লাভ হবে না। তুমি

ঠিক আগের মতোই আছো দেখছি। তোমার বাবার দিকে চেয়ে দেখো দেখি, কেমন স্থির-বুদ্ধি মানুষটি। কিন্তু যেমন তুমি, তেমনি তোমার ভাইরা ………। না হয়, তুমি বড়ো হাকিমের কাছেই গেলে? তিনি কি সপ্তম কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করবেন না? ততদিনে ব্যাপারটা নিয়ে বাইরের পাঁচজনে কেচ্ছা ক'রবে। কারুর কি আর তখন মুখ দেখাবার জো থাকবে?"

"আমি এর জন্যে প্রাণপণ ক'রবো, এমন কি, দুটো পরিবার যদি উচ্ছন্নে যায়, তাও সই।"

অবশেষে সপ্তম কর্তা মুখ খোলেন "প্রাণপণ করবার মতো ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। তোমার এখনও কাঁচা বয়েস। এই বয়সে সবার সঙ্গে বনিবনাও ক'রে চলা উচিত। 'সামঞ্জস্যেই ঐশ্বর্য্য আনে'—নয় কি? আমি প্রস্তাব ক'রেছি, তোমার স্বামী আরও দশ ডলার বেশি দেবে। এ-বিচার স্বর্গের বিচারের চেয়েও উচ্চ। আসল কথা, তোমার শ্বশুর আর শাশুড়ি যদি তোমাকে তাড়িয়ে দেন, তো তুমি যেতে বাধ্য। এ-কেবল এখানেই নয়, সাংহাই, পিকিং এমন কি বিদেশেও এই নিয়ম। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তবে এই ছোকরা তো পিকিং থেকে সবে মাত্র ফিরেছে। একে তুমি নিজেই জিজ্ঞেস করো।"

লম্বা-মুখো এক ছোকরার দিকে ফিরে তিনি বল্লেন—"কী হে তাই না?"

লম্বা-মুখো ছোকরা আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধানম্র-স্বরে বল্ল—"আজ্ঞে, ঠিক তাই।"

আই-কু বুঝতে শুরু ক'রলে যে সে একলা প'ড়েছে। বাবা কিছুই বলেন নি, ভাইরা আসতে সাহস করেনি। ওএই তো চিরকালই সী পরিবারের পক্ষে। সপ্তম কর্তাকেও নিশ্চয় ওরা দলে টেনেছে, এমন কি ঐ লম্বা-মুখো ছোকরা (তার সবিনয় ভাব আর ডানা-কাটা গুবরে পোকার মতো স্বর নিয়ে) সে-ও ঐ তালেই তাল দিচ্ছে। মন যেন আর সে স্থির ক'রতে পারেনা; তবু একবার সে শেষ-লড়া লড়বার জন্যে দাঁড়ায়।

"সপ্তম কর্তা এ কী সত্যি যে আপনিও—" খানিকটা অবাক্ হ'য়ে, খানিকটা বেবাক হয়ে, খানিকটা নিরাশ হ'য়ে সে তাকায়; তারপর বলে—

"হ্যাঁ, পাড়াগাঁয়ে মানুষ আমরা বুঝিসুঝি কম। এমন কি বাবাও পৃথিবীর হাল-চাল বিশেষ জানেন না। তা ছাড়া বয়সের সঙ্গে তাঁর বিচারের ক্ষমতাও কমে আসছে। তাঁর কখনই উচিত নয় যে খুদে জানোয়ার আর বুড়ো জানোয়ারের

সঙ্গে ঐ নিস্পত্তি করা। ওরা কুকুরের গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে কেমন ক'রে খবরাখবর নিতে হয় তা খুব ভালোই জানে; পায়ে তেল দিয়ে আর ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় ক'রতে ওরা ওস্তাদ।"

খুদে জানোয়ার এতক্ষণ চুপ ক'রে ওর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল; সে এইবার মুখ খোলে—"দেখুন সপ্তম কর্তা, দেখুন একবার। মহৎ লোকের সামনে ওর ব্যবহারটা দেখুন। বাড়িতে এমনি জ্বালাতনে ছিল যে পোষা জন্তু জানোয়ার গুলো পর্যন্ত টিকতে পারতো না। ও আমার বাবাকে বলে 'বুড়ো জানোয়ার' আমাকে ডাকে 'খুদে জানোয়ার' বা 'খচ্চর'—"

আই-কু ঘুরে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে— "কে রে আমার! অসতী মায়ের ছেলে, যে-মায়ের দশ হাজার নাগর ছিল—কে তোকে খচ্চর বলে?"

স্বামীকে চুপ করিয়ে দিয়ে সে সপ্তম কর্ত্তার দিকে ফিরে দাঁড়ায়।

"আপনাদের সবার কাছেই আমার কিছু বলবার আছে। ও কি কোনোদিন আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা ব'লেছে? যখনই আমার সঙ্গে কথা ব'লেছে, শুরু হ'য়েছে 'অসতীর পেটের মেয়ে' দিযে; আর শেষ হ'য়েছে আমার মার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার ক'রে। ঐ বেশ্যাটাকে গ্রহণ করবার পরও আমার পিতৃপুরুষদের গালাগালি ক'রেছে। সপ্তম কর্ত্তা আপনি একবার বিচার করুন—"

হঠাৎ কী একটা দেখে সে ভয় পেয়ে চুপ ক'রে যায়। সপ্তম কর্ত্তা একবার চোখটাকে দ্রুত ঘূর্ণিত ক'রে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেন। তাঁর লম্বা সরু গোঁফের পিছন থেকে একটা উচ্চ কম্পিত স্বর উত্থিত হয় "ইধার আও!"

আই-কুর মনে হয় বুকের ধক্‌ধকানি থেমে গেছে। তারপর আবার যখন হৃৎপিণ্ডটা চ'লতে থাকে মনে হয় যেন হাতুড়ি পিটছে। ওর নিশ্চিত ধারণা হয় আর ওর কোনোই আশা নেই। একটা বাজে চাল চেলে সে গভীর জলে গিয়ে পড়েছে।

নীল জোব্বা আর কালো আঙরাখা পরা একজন লোক সপ্তম কর্ত্তার সামনে কাঠ হ'য়ে এসে দাঁড়ায় হুকুমের অপেক্ষায়। সমস্ত ঘরে টুঁ শব্দটি নেই। কর্ত্তার ঠোঁট নড়ে ওঠে। তিনি যে কী বলেন, সামনের লোকটি ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়না এবং সে তার শরীরটা আরও আড়ষ্ট ক'রে দাঁড়ায়, মনে হয়, যেন হুকুমটা তার হাড়ের মধ্যে ঢুকে তাতে আরো তৎপরতা এনে দিয়েছে।

"যে আজ্ঞে" ব'লে সে-কর্ত্তাকে সমীহ ক'রে কয়েক পা পিছু হটে, তারপর চ'লে যায়।

আই-কু বোঝে অভাবনীয় কিছু একটা এক্ষুণি ঘটবে এবং সেটা থামানো তার সাধ্যাতীত। কর্ত্তার ক্ষমতার কঠোরতা আর মহানতা এইবার সে উপলব্ধি করতে পারে এবং মনে মনে বোঝে এই যে কিছুক্ষণ আগে সে এমন খোলাখুলি ভাবে কথা বলেছে তা কত বড় অবিবেচনার কর্ম হ'য়েছে। সে এতক্ষণ কর্ত্তাকে একটু খাটো ক'রে দেখেছে। নিজের গোঁয়ার্ত্তুমির জন্যে তার আক্ষেপ হয়, তাই নিজের অনিচ্ছা-সত্বেও সে কর্ত্তাকে শান্ত করবার জন্যে ব'লে বসে—

"যাই হোক্ এ-সব সত্বেও সপ্তম কর্ত্তা যা মীমাংসা করবেন, আমি তাই মেনে নেবো।"

এখন ঘরে একটুও শব্দ নেই। আই-কু যদিও কথাগুলো বলে খুব মৃদু স্বরে, যেন হাল্‌কা রেশমের সুতোর মতো ফিনফিন ক'রে কিন্তু ওএইএর কানে তা ঠিক পৌছয়, আর যেন বাজ পড়েছে এমন ভাবে সে চীৎকার ক'রে ওঠে :

"বেশ! সপ্তম কর্ত্তা সত্যিই ন্যায্য বিচার ক'রেছেন, আর আই-কুও বুদ্ধিমতী মেয়ে।"

আই-কুকে সুখ্যাতি করবার পর সে চুয়াং-মু-সান্ এর দিকে ফেরে।

"মাননীয় মু মশায়, আপনার মেয়ে যখন সম্মতিই দিয়েছেন, তখন আপনার আর কী বলবার থাকতে পারে? আপনি কি সেই লাল সবুজ রং এর বিবাহ পত্রগুলো যা আপনাকে আনতে বলেছিলুম এনেছেন? এখন দুই পরিবারই সেগুলো বার করুক।"

আই-কু দেখে তার বাবা ইতিমধ্যেই কোমরবন্ধ হাতড়াচ্ছেন। তারপর তার চোখ পড়ে সেই কাষ্ঠোপম লোকটার উপর, যে কর্ত্তার হুকুম তামিল করতে গিয়েছিল। সে আবার আবির্ভূত হ'য়েছে; তার হাতে একটা ছোটো চ্যাপটা কুচকুচে কালো জিনিস ক্ষুদ্র কচ্ছপের আকারের; সেটা সে কর্ত্তার হাতে এগিয়ে দেয়। ব্যাপারটা এখনও হয়তো খারাপের দিকে গড়াতে পারে এই ভেবে সে ব্যস্ত হ'য়ে বাবার দিকে তাকায় এবং দেখে নিশ্চিন্ত হয় যে তিনি নীল কাপড়ের থলিটা খুলছেন।

কর্ত্তা এইবার কচ্ছপের মাথাটা খুলে ফেলেন এবং তার গলার ভিতর থেকে কী খানিকটা ঢেলে তাঁর হাতের চেটোয় রাখেন। কাঠের মতো মানুষটা, বস্তুটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কর্ত্তার হাতে যে-দ্রব্যটা আছে তাতে একটা আঙুল ডুবিয়ে নাসারন্ধ্রে সেই আঙুলটা ঘসতে থাকেন, ওষ্ঠে একটু মৃদু খয়েরি আভা লাগে। তারপর কর্ত্তা নাক সিঁটকে ওঠেন হাঁচবার জন্যে।

চুয়াং-মু-সান রুপোর ডলারগুলো গুনছিলেন। ওএই না-গোনা একটা স্তূপ থেকে কয়েকটা ডলার তুলে নিয়ে বুড়ো জানোয়ারের হাতে ফেরত দেয়। লাল আর সবুজ বিবাহপত্র, যাতে বর আর কন্যার ঠিকুজি করা আছে সেগুলো দুই পরিবার ফেরত পায়, এবং ওএই বলে—

"এগুলো যত্ন ক'রেই রাখা হ'য়েছে দেখছি। ভালো ক'রে টাকাগুলো গুনে নিন্ লাও মু, ঠাট্টা নয়—টাকা গোনা অতি গুরুতর কাজ।"

"হ্যা······চ্চো······" আই-কু বুঝতে পারে যে সপ্তম কর্তা হাঁচছেন, তবু একবার সেদিকে মাথা ঘুরিয়ে না দেখে সে থাকতে পারে না। সে দেখতে পায় তাঁর মুখ হাঁ হ'য়ে ঝুলছে আর নাকটা এমন সিঁটকে উঠেছে যে দেখলে হাসি পায়। দুই আঙুলের মধ্যে তাঁর সেই জেড্এর টুকরোটা ধরা—"পুরাকালের প্রথামতো আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহের সঙ্গে মাটি-চাপা দেওয়া হয়েছিল"—সেটা নিয়ে তিনি নাকের পাশে ঘসছেন।

কিছু কষ্ট ক'রে চুয়াং-মু-সান টাকা গোনা শেষ করেন। দুই পক্ষই বিবাহপত্র ফিরিয়ে নেয়। সকলেই একটা স্বস্তিবোধ করে; তাদেব চোখ-মুখের কঠিন ভাবটা কেটে গিয়ে তা কোমল হ'য়ে আসে। ঘরে একটা সামঞ্জস্যের বাতাস বইতে থাকে।

ওএই তার মত প্রকাশ করে—"উত্তম! ব্যাপারটা এতোদিনে বেশ সুষ্ঠু ভাবে একটা পরিণতি লাভ করলো। সবাইকে উঠতে দেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে "আর তাহ'লে কিছুই বাকি নেই। দুই পরিবারকেই আমার অভিনন্দন জানাই! এতদিনে জটটা খুললো। কাজেই সকলে যাবার আগে এইবার আমরা এক এক পেয়ালা নববর্ষের সুরা পান করতে পারি এমন দিন বড়ো একটা আসেনা।"

আই-কু ধন্যবাদ জানিয়ে বলে—"আমরা মদ খাবো না। পরের বছরের জন্যে ওটা মুলতুবি থাক্।"

বুড়ো জানোয়ার আর খুদে জানোয়ার একসঙ্গে বলে ওঠে "ধন্যবাদ ওএই। এখন আমরা আর খেতে পারবো না, আমাদের অন্য অনেক কাজ আছে।"

সবাই একে একে চলে যেতে থাকে; সব শেষে আই-কু। ওএই তারই দিকে তাকিয়ে বলে—"আ হ্ হ্·········যাবার আগে এক ফোঁটাও হবে না?"

"না এখন না, ধন্যবাদ ওএই।"

লেমনেডওয়ালা

চৌ ৎসো-রেন

(১৮৮৫-   )

চৌ ৎসো-রেন, লু শ্যুন এর ছোটো ভাই। দাদার মতো তিনিও জাপানে উচ্চ-শিক্ষার জন্যে যান ও ফিরে এসে চীনদেশে অধ্যাপনার কাজে লাগেন। বিদেশি সাহিত্যের বহু অনুবাদ তিনি করেছেন। তাঁর সাহিত্য-রচনার মধ্যে তাঁর রম্য রচনা, কবিতা ও নিবন্ধ আজও চীনদেশে আদৃত। জাপানীরা যখন পেইচিং অধিকার করে তখন তিনি জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন ব'লে চীনা সরকার তাঁকে বহুদিন গারদে রাখেন। সম্প্রতি ছাড়া পেয়ে ইনি আবার অনুবাদের কাজে লেগেছেন।

আমার ঘরের পাশেই থাকে এক লেমনেডওয়ালা। আমাদের এই যে 'প্রজ্ঞামন্দির' মঠ, এই মঠেরই বাঁ-দিকের এক কোণে দুটো ঘর; একটা হ'চ্ছে আমার রান্নাঘর, আর অন্যটা হ'চ্ছে ভিতরের দিকে, সেখানে থাকে ঐ লেমনেডওয়ালা।

গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের এই পাহাড়ে বেড়াতে আসে অনেক লোক। লেমনেডের ব্যবসা তখন জোর চলে। সোডার কারখানা থেকে লেমনেড তৈরি করিয়ে আনতে খরচ হয় এক টাকা। সেই লেমনেড বেশ চড়া দামে বিক্রি হয়। যদি কোনো চেনা লোক হয় কিংবা দর-দস্তুর করনেওয়ালা কেউ এসে পড়ে তাহ'লে সে দাম নেয় বোতল প্রতি দু'পয়সা। এতেই খরচ পুষিয়ে যায়। এছাড়া অন্য লোক হ'লে তিন পয়সা কি চার পয়সা পর্যন্ত বোতলের দাম ওঠে। রবিবার যখন লোক অনেক হয় তখন প্রায় পনের ষোলো টাকার লেমনেড বিক্রি হয়, লাভ থেকে যায় প্রায় দশটাকা।

এই লেমনেডওয়ালার আসলে ছিল এক কয়লার দোকান, আর কাজ করতো সে রাজমিস্ত্রির। সেই কাজেই একদিন সে এই মঠে এসেছিল, হঠাৎ খেয়াল হ'লো এখানে এসে লেমনেড বেচলে কেমন হয়? নিশ্চয়ই চ'লবে ভালো। এরপরই সে একদিন দোকান খুলে ফেলে। নিজে কয়লার দোকানের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকে ব'লে একজন ছোকরাকে সে নিযুক্ত করেছিল এদিককার

সব কিছু দেখবার শোনবার জন্যে। মাঝে মাঝে হঠাৎ সে নিজেও এসে প'ড়তো কারবার ঠিক চলছে কিনা সেটা এক নজরে দেখে নেবার অভিপ্রায়ে।

এই ছোকরাটার গোড়ায় কোনো মাইনের ব্যবস্থা ছিল না, ছিল শুধু খাওয়ার চুক্তি। তা ছাড়া তার এটা-ওটা খুচরো জিনিসপত্র যা দরকার প'ড়তো মালিকই যোগাতো।

আমি এখানে আসবার পর দেখলুম অনেকগুলো ছোকরা বদল হ'লো। এখন যেটা আছে তার নাম হচ্ছে ছিন্, বয়েস কুড়ির কাছাকাছি, চমৎকার স্বাস্থ্য, কালোমতো রং, মুখটা গোল, ভাব দেখে মনে হয় ধূর্ত অথচ কোথায় যেন ছেলেমানুষের ভাবটাও র'য়েছে।

লেমনেড বিক্রির যে-জায়গাটা সে-স্থানটাকে বলা হয় মিনার-বাগান। মঠের পিছনে একটা প্রকাণ্ড আঙিনা, তারই মাঝামাঝি উঁচু একটা চত্বর। এই চত্বরকে ঘিরে পাচখানা পাথরের মিনার। আমার রান্নাঘর থেকে মিনার-বাগানের নিচে পৌছতে গেলে প্রায় পঞ্চাশ যাট ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হয়। সিঁড়ির দৌড়টা চার পাচ অংশে ভাগ করা আছে তাই রক্ষে, নৈলে ঠেলে ওঠাই মুস্কিল হ'তো। মিনার-বাগানের উপরে চত্বরে ওঠবার সিঁড়ি, সেও প্রায় দু'শোর বেশি ধাপ। তা-ছাড়া এমন খাড়াই যে দেখলেই মাথা ঘোরে, মনে হয় এই সিঁড়ির পাহাড় ভেঙে উপরে ওঠাই অসম্ভব। উপরে ওঠবার কথা আমি একবারও ভেবে দেখিনি।

মিনার-বাগানের নিচেটা বড়ো বড়ো গাছে ভর্তি—ভারি নির্জন। ফাংইকে আমি ওখানে প্রায়ই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতুম পাথরের ফলক দেখাতে আর একটু পায়চারি ক'রতে।

পাথরের ফলকগুলো যে-কুঠরিটার মধ্যে রাখা আছে একদিন তার সামনে পায়চারি করছি এমন সময় দেখি ছিনও উপরে উঠে আসছে। ডান হাতে ঝোলানো একজোড়া গোল ঝাউ কাঠির চুপড়ি, বাঁ-হাতে এক ছড়া চেরীফলের মতো দেখতে কি ফল। ফাং-ইকে দেখে সে হঠাৎ হাত তুলে বল্লে, "নাও এগুলো, তোমায় দিলুম!"

ফাং-ই এক লাফে তার কাছে গিয়ে শুধোলো—"এগুলো কি?"

—"টোপা কুল।"

—"টোপা কুল কোথা থেকে এলো?"

—"যেখান থেকেই আসুক না তোমার কি? দিয়েছি, নিয়ে যাও।" এই

বলার সঙ্গে সঙ্গে তার চতুর মুখে একটা হাসির রেখা খেলে গেল, তারপর ফলগুলো সে তুলে দিলে ফাং-ইর হাতে। দেখি ছিনের মুখ নড়ছে—কী চিবচ্ছে যেন। বেশ বোঝা গেল এইমাত্র গোটা কতক ফল মুখে পুরেছে। আমরা একটা বেছে নিয়ে মুখে দিলুম—কুলেরই মতো গন্ধ বটে, কিন্তু বেজায় টক। ফাংই তাকে আরো কী বলতে যাচ্ছিল, ছিন্ কিন্তু ততক্ষণে এক দুই তিন গুনতে গুনতে এক এক লাফে দু' তিনটে করে সিঁড়ি টপকে বেদীর নিচেটায় পৌঁছে গেছে। তারপর দেখি আরো কয়েকটা লাফে বাকি সিঁড়িগুলো পার হ'য়ে মিনার-বাগানের প্রথম পাথরের বিরাট ফটকের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

এ-প্রায় দু'হপ্তা আগের কথা। এর মধ্যে ফাংইর স্কুল খোলবার সময় হওয়ায় সে বাড়ি চ'লে গেল।

কাল সকালে লেমনেডওয়ালার ভাগনে হঠাৎ এসে উপস্থিত। ছিন্‌কে ডেকে বল্লে যে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে, ও যেন কালই ফিরে যায়। ব্যাপারটা এতো আকস্মিক যে সবাই খুব অবাক্ হ'য়ে গেল। পরে ভালো ক'রে খবর নিয়ে শুনলুম যে লেমনেডওয়ালা জানতে পেরেছে যে ছিন ওকে খুব ঠকাচ্ছে, তাই ভাগনেকে ডেকে এনেছে হিসেবপত্রগুলো ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে। ছিন তিন চার পয়সায় যে-লেমনেড বেচেছে তার দাম দেখিয়েছে দু'পয়সা, বাকি পয়সাগুলোর কোনো পাত্তাই নাই। এক বৌদ্ধ-ভিক্ষুর কাছে নাকি সে এই সব পয়সা জমা ক'রে রাখছিল, এই খবরটা কে একজন টেলিফোনে লেমনেডওয়ালাকে জানিয়েছে। ভাগনে আসার পরে আরো তদন্ত হয়, তাতে বেরিয়ে পড়ে ছিন নাকি ভালো ভালো খাবার কিনে খায়। দু-হপ্তার মধ্যে কয়েক প্যাকেট সিগারেটও খেয়েছে। প্রমাণ ভালোই পাওয়া গেছে, কাজেই ছিনকে আর রাখা চলে না, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় ছাড়িয়ে দিতে হবে।

ছিন অবশ্য যেতে চায় না। কাঁদো-কাঁদো মুখে নানান অজুহাত দেখায়। কিন্তু কোনো ফল হয় না। ছিন সাধারণতঃ ওঠে খুব ভোরে ; আজ কিন্তু সে অনেক বেলা অবধি ঘুমচ্ছে, ভাগনে গিয়ে ওকে ডেকে তোলে। ছিন বলে তার মাথা ধ'রেছে তাই উঠতে পারেনি। কিন্তু এতেও কোনো কাজ হয় না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছিন প্রজ্ঞামন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

আমি তখন কালো ব্রোঞ্জের মৈত্রেয়ী বুদ্ধের মন্দিরের সামনে পায়চারী করছিলুম। ছিন আমার সামনে দিয়ে চ'লে গেল, কাঁধে একটা ঝুলি, হাতে ঝোলানো সেই একজোড়া ঝাউকাঠির চুপড়ির মধ্যে টুকিটাকি জিনিস।

সামনের মন্দিরের ভিতর থেকে একজন মজুর শুধোলে—“এখন কোথায় যাবি রে ?”

—“পেইচিং ফিরে চল্লুম।” ছিনের গলার স্বরটা বেশ খানিকটা আনন্দে ভরা। মনে হয় জোর ক’রে মনের বোঝাটাকে ঢেকে রাখ্‌তে চাইছে।

হঠাৎ আমার নিজেকে যেন ভারি একলাটি মনে হয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওর হাসি-হাসি মিষ্টি অথচ চতুর মুখটা। চলা বন্ধ ক’রে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম—পাথরের সিঁড়ি বেয়ে অপসৃয়মান ওর পিঠের ছায়াটাকে বড়ো করুণ ঠেকতে লাগল।

কাঁটালতা

য়্যু তা-ফু

(১৮৯৬-১৯৪৫)

লু শ্যুন, মাও তুন প্রভৃতি জনপ্রিয় লেখকদের জন্মস্থান যে-চেচিযাং প্রদেশ, য়্যু তা-ফুর জন্ম সেই প্রদেশে ফুইয়াং শহরে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থানীয় বিদ্যালয়ে প'ড়ে তিনি জাপানে যান।

১৯২০-৩০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশের তরুণ লেখকদের মধ্যে য়্যু তা-ফু ছিলেন সকলের চেয়ে জনপ্রিয়। চীনা লেখকদের মধ্যে যাঁরা সর্বপ্রথম আধুনিক কালের নরনারীর প্রেমের মতো নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে খোলাখুলি ভাবে লিখেছেন তাঁদের মধ্যে য়্যু তা-ফু অন্যতম।

তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি প্রায় সবই বিষাদ-পীড়িত, অন্তর্মুখী, উগ্ররূপে ভাবপ্রবণ, জীবন-সম্বন্ধে অতৃপ্ত অথচ সমাজের মধ্যে সত্যিকারের কোনো বদল আনতে সম্পূর্ণ নিবীর্য্য। খান বারো উপন্যাস, কয়েক খণ্ড ছোটোগল্পের ও কবিতার বই তিনি প্রকাশ ক'রেছেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি ফুচিয়েন-এ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর এই কাজ ছেড়ে দেন। যুদ্ধ আরম্ভ হ'তে তিনি গিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরে এক পত্রিকার সম্পাদক হ'য়ে। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে জাপানীদের হাতে ধরা পড়েন এবং কনসেনট্রেশান ক্যাম্প-এ তাঁকে হত্যা করা হয়।

‘কাঁটালতা, ঝাউ আর সাইপ্রেস আঁকড়ে থাকে।”

শ্র-চিং (কবিতা পুরাণ)

দুঃখিনী,

বিকেল হয়েছে, নিস্তব্ধ বেলা—আমি একা বসে। বাড়ি ছেড়ে সবাই চলে গেছে, কেবল আমি ছাড়া। এই প্রশান্ত আবহাওয়ায়, যেখানে একটি শব্দ পর্যন্ত নেই, আমারও উচিত শান্ত হ'য়ে থাকা; কিন্তু আমার প্রাণের মধ্যে রয়েছে শুধু শূন্যতা, আমার মাথার মধ্যে শুধু দুঃখের আবেগ!

এখন ঠিক সাড়ে তিনটে বেজেছে। বাইরে রাস্তায় রোদের বিচিত্র কারিগরি, বাতাসে যে ভাসছে বসন্তের সুবাস তাতে আর সন্দেহ নেই। সেই একই বাতাস আমার ঘরের মধ্যে কেন এমন গুরুভার, এমন বিস্বাদ মনে হবে? ছেলে-মেয়েদের দল বোধ হয় লুং হুয়া বাগানের পীচগাছের তলায় আর সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে খোলা নীল আকাশের দিকে চেয়ে আনন্দে গান ধরেছে। আমার

জানলার এক কোণ দিয়ে সেই একই আকাশকে শুধু একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতো কেন মনে হবে? কেন আমার প্রাণশক্তি, আমার সামর্থ, আমার দেহ-মন সব একত্রে উঠে দাঁড়িয়ে নতুন জীবন-ছন্দে ধ্বনিত হ'য়ে উঠছে না? কেন আমি এই গরমী-ঠাণ্ডা আর শীতল-উষ্ণ ঋতুর ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবীর সবুজ গাছ-পালার মতন নতুন লূতাতন্তু উদ্গত করতে পারছিনে?

হায়রে! যাকে আমায় ভালবাসতেই হবে অথচ যাকে আমি ভালবাসতে পারিনে! পৃথিবীকে আমি ঘৃণা করি, কারণ তোমার প্রতি আমার যে-নিষ্ঠুরতা তার জন্য আমি ঘৃণা করি নিজেকে!

তোমায় নিয়ে রেলগাড়ি এতক্ষণ নিশ্চয় স্হনকিয়ান পার হ'য়ে গেছে। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি তোমাকে—বসে আছো, মুখে একটা শূন্য ভাব নিয়ে চেয়ে আছো মাঠের দিকে, আর যারা পথ বেয়ে চলেছে তাদের দিকে। কী ভাবছো তুমি? সেটা আবিষ্কার করা বিশেষ শক্ত নয়, কেননা তোমার চোখে জল। তুমি ভাবছো, আমরা যতদিন একসঙ্গে ছিলুম ততদিন আমার কাছে তুমি যে ঘৃণিত ব্যবহার পেয়েছো তার কথা। নারী—যাকে আমাকে ভালবাসতেই হবে কিন্তু পারিনা—তুমি আমার কথা শোনো। যা কিছু ঘটেছে সে সব সত্ত্বেও জেনো যে আমার অন্তরে তোমার প্রতি অবিকৃত সমবেদনা রয়েছে। আমার ছোটোখাটো সব অপমান, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, দুর্ব্যবহার আর কিছু নয়, আমাদের মতো মানুষকে যে-সমাজ উৎপন্ন করেছে সেই সমাজের প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা প্রকাশ। সত্যি, তুমি যদি আমার ভিতরটা দেখতে পেতে তাহলে হয়তো আমি যা কিছু করেছি তা সমস্তই মার্জ্জনা করতে পারতে।

আজকে বসন্তোৎসব, ছেলেমেয়েদের দল আনন্দে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে হয়তো কিছুই এসে যায় না। তুমি হয়তো তাদের অনেককেই গাড়ির জানলা থেকে দেখতে পাচ্ছো? তা দেখে তুমি কি আমার উপর আরো বেশি তিক্ত হ'য়ে উঠছো, না? বেশ, আমাকে ঘৃণা ক'রে তুমি যদি সান্ত্বনা পাও, তবে সেই ভাবেই তোমার অন্তরের অনুভূতি ফুটে উঠুক আঁধারের মতো। আমাকে করো তোমার চরম ঘৃণার পাত্র! কামনা করো যেন আমি শীঘ্র মরি! কিন্তু বেচারি, আমি জানি তা তুমি পারবে না। তোমার পক্ষে তা করা অসম্ভব, এমন কি চেষ্টা করতে শুরু করলেও তুমি ওজর, ছল নানা কারণ আবিষ্কার ক'রে শেষে আমাকে ক্ষমাই করবে। তোমার হৃদয় কোমল তাতে কোনো সন্দেহই নেই, তাই আশ্চর্য হই তোমার উপর আমি যে রাগ করি এই বা কী ক'রে হয়!

জানিনা কতগুলো (বা ক'টা মাত্র) আনন্দের দিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি, কিন্তু বিয়ে যে আমাদের বিফল হবে এ একেবারে অনিবার্য ছিল। তুমি জানো, আমি যখন বিদেশে যাই তখন আমার বয়েস ছিল সতেরো। তবু সেই বয়সেই বাড়ির চেয়ে বিদেশে-বিভুঁয়ে বাস করাই আমি শ্রেয় ব'লে গ্রহণ করেছিলুম। দীর্ঘ আট বছর আমি বাইরে কাটিয়েছি ; আর তার মধ্যে কোনো সময়, এমন কি গরমের বা শীতের ছুটিতেও একবারের জন্যেও বাড়িতে ফিরিনি। জানো কেন ? বিয়ের কথা ভাবতে আমার ঘৃণা হত। তোমাকে নয়, বুঝেছো, ঘৃণা করতুম এই সামন্ত-তন্ত্রীয় বিবাহের বিধানকে, যে-বিয়ে বাপ-মায়ে পছন্দ করে দেয়। আমি স্থির করেছিলুম'এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব, তাই, যতদিন আমি জাপানে ছিলুম ততদিন আমাকে কেউ বিয়ে দিতে পারেনি।

শেষে চার বছর আগে গ্রীষ্মের সময় আমি বাড়ি ফিরলুম। আমার বিবেকের বিরুদ্ধে, আমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে, কিন্তু তবুও অপরিহার্য্যকারণে বিয়েতে আমায় সায় দিতে হ'লো। আমাদের দেশের অনমনীয় প্রথা অনুসারে বাগ্‌দানের পর তো আর ভাঙা চলে না। তোমার মা, তোমার বাবা ব্যাপারটার একটা দ্রুত সমাধানের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন; আর আমার মা কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, আমি তাঁর সন্তান হবার অযোগ্য। চারিপাশের এই সহানুভূতিহীন মানুষগুলো আমাদের ঠেলে নিয়ে চল্ল এই না-চাওয়া মিলনের দিকে। আমার বিদ্রোহ চূর্ণ হ'য়ে গেল। আজ এই দুর্ঘটনার জন্য আমরা দায়ী নই, দায়ী হচ্ছেন আমাদের বাপ মা, দায়ী হচ্ছে এই চীনদেশ। তবু, এতদিন তোমাকে যে একটা কৈফিয়ৎ দিইনি এটা আমার উচিত হয়নি।

উৎসবটা তোমার পক্ষে নিশ্চয়ই খুব অসন্তোষজনক হয়েছিল। সেটা নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামাই নি। যখন সহ্য করতেই হবে তখন এ-বিয়েতে যত কম হুজুগ করা যায় ততই ভালো, এই ছিল আমার সংকল্প। কোনো অভ্যর্থনা হ'লো না, বিবাহের চরম নিষ্পত্তির জন্যে ঘটক বিদায় হ'লো না, কোনো অতিথি এল না—এক জোড়া মোমবাতিও জলল না, একটা পটকাও ফুটলো না। তুমি নিঃশব্দে এলে গোধূলি-বেলায় ছোট্ট পাল্কীটি চেপে বাইশ লি দূরে তোমাদের বাড়ি থেকে। এসে মায়ের সঙ্গে একলা খেতে বসলে। তারপর সিঁড়ি ধ'রে হাতড়ে উঠে এলে তোমার ফেটি-বাঁধা ছোট্ট পায়ে আমার ঘরে একলাটি।

আমি শুনেছিলুম তুমি ম্যালেরিয়ায় ভুগছো। তাই মাঝরাতে যখন আমি তোমার বিছানার কাছে গেলুম তখন কোনো কথা না ব'লে আমি দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে চুপটি ক'রে তোমার দিকে দেখছিলুম। তোমার গায়ে ছিল কেবলমাত্র একটা পাতলা রেশমের কাপড়। দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে তুমি ঘুমচ্ছো। আমার এখনও মনে আছে তোমার সেই উৎসুক দৃষ্টি; আমি যখন বিছানায় শুতে যাবার উদ্যোগ করলুম, জেগে উঠে যে-দৃষ্টি নিয়ে তুমি প্রদীপের আলোয় আমার মুখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে রইলে সেই দৃষ্টি। পরিস্কার বোঝা গেল তুমি এতক্ষণ কাঁদছিলে, তোমার ঠোঁট কেঁপে উঠল। আর মনে হ'ল তোমার ছোট্ট মুখখানা, সে কি ক্লান্ত, সে কি রুগ্ন, বিষণ্ণ! সে কথা ভাবলে এখনও আমার চোখ করুণার অশ্রুতে ভরে ওঠে।

সেই প্রথম তোমার জীবনে তুমি বড় শহুরের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিলে। বিচ্ছিন্ন এতটুকু এক গ্রামে ছেলেবেলা থেকে বাড়ির মধ্যে বন্ধ, এমন কি একবারের জন্যও ইস্কুলে তোমাকে যেতে দেওয়া হয়নি। তাই, তুমি ছিলে ভীরু, লাজুক, সন্ত্রস্ত। প্রথমত চীনা-নারীত্বের আদর্শে তোমার শিক্ষা ছিল নির্ভুল। আমার মনে আছে সঙ্গে ক'রে তুমি পুরানো যুগের এক গাদা বই আমাদের বাড়িতে এনেছিলে—"সম্ভ্রান্ত মহিলাদের জীবনী" "মেয়েদের জন্য চারটি বই" আর এই রকম আরো সব বই যা তুমি তোমার বাড়িতে পড়েছো আর যার থেকে তুমি জীবন-সম্বন্ধে সব কিছু জেনেছো। দ্বিতীয়ত এটা সত্যি যে পুরুষকে ভোলাবার শিল্প তোমায় শেখানো হয়নি। কায়দা ক'রে জামা-কাপড় পরতেও তুমি জানতে না। কিন্তু কনফুসিয়াসের "আনুগত্য" সুত্রের একটাও তোমার বাদ পড়েনি।

এই 'বিবাহ'-এর পর শহরের নিরানন্দ আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে আমরা তোমার দেশের বাড়িতে গেলুম, আর সেখানে সত্যিই কিছুটা সুখ আমরা পেয়েছিলুম। সেখানেই যদি আমরা থাকতে পারতুম······কিন্তু সেখানে ছিল তোমার সেই দুবিনীত ভাইপো, সে তোমাকে এমন বিরক্ত করল যে আমি হ'য়ে উঠলুম রোষান্ধ, আর তোমার কান্নার বাঁধ ভেঙে গেল। সেই ঝগড়ার পর দিনই আমরা শহরে ফিরে এলুম। সেখানে থাকবার দু তিন দিনের মধ্যেই আমি পড়লুম অসুখে আর তোমাকেও আবার ম্যালেরিয়ায় ধরলো। আমাদের দুজনেরই অবস্থা হ'ল শোচনীয়।

তারপর, আমার অসুখ-সত্ত্বেও আমি ঠিক করলুম যে আমায় বেরিয়ে যেতে হবে। এই যে বিষণ্ণ আবহাওয়া যা অহরহ আমাদের বুকের উপর চেপে ব'সে আছে একে ছেড়ে যেতেই হবে। যেদিন আমি চলে যাই তার আগের দিন রাত্রে

আমরা একটাও কথা বলিনি। তোমার মনে আছে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমি বেরিয়ে গেলুম ; মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে বাড়ি ফিরে বিছানায় যখন শুয়ে পড়লুম সে-দৃশ্যটা খুবই ঘৃণাজনক হয়েছিল বোধ হয়। তোমার উপস্থিতিটা অস্পষ্ট মনে আছে—চুপ ক'রে বাতির ম্লান আলোর তলায় বসেছিলে। পরদিন সকালে যখন আমি উঠলুম তখনও তুমি সেইখানে বসে আছো, সারারাত একটিবারের জন্যে বিছানার কাছে আসতে তোমার সাহস হয়নি। তবুও তোমাকে বলবার মতো কোনো কথা আমি খুঁজে পাইনি। তুমিও কোনো কথা বলনি—আমি যখন চলে যাবার জন্য তৈরি, তখনও না। ভোর হবার একটু পরে মা এসে আমাকে বল্লেন যে জাহাজটাকে দেখা যাচ্ছে, সেটা হরিণ-পাহাড়ের তলায় এসে পৌঁচেছে।

সেই যাবার দিনের স্মৃতিখানা তোমার মনের মধ্যে ছেপে দিয়ে আমি রইলুম তোমাকে ছেড়ে দু-বছর। তোমার চিঠিতে শুনতুম আমার বুড়ি ঠাকুরমার কথা, তিনি ব্যস্ত, আমি যেন কোনো ছুটিতে একবার বাড়ি আসি। তুমি এ-ও মনে করিয়ে দিতে যে আমার মা'র বয়স বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন, তাই, তাঁর মনে আনন্দ দিতে আমার ফেরা উচিত দেশে। কিন্তু তুমি সফল হওনি, বাজে বন্ধুর দল আর বিদেশি জাপানী ফুল আমায় আটকে রাখল। চীন-সম্বন্ধে সমস্ত আকর্ষণ আমি হারিয়েছিলুম, তার প্রতি সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ করেছিলুম। যে-জীবনে বাঁচবার স্বাধীনতা নেই তার কি-ই বা মূল্য ? মদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলুম। বস্তুতঃ প্রায় সারাদিনই আমি মাতাল অবস্থায় থাকতুম। কত মেয়ে যে এল গেল তা আমার মনে নেই। সব জীবন-হীনের দল। তারা যেন আমোদের জিনিস হয়, এ-ছাড়া আর আমি কিছুই চাইতুম না। কিন্তু এই যে এত মদে ডুবে থাকা এ-সত্ত্বেও তোমার কথা মাঝে মাঝে না ভেবে আমি থাকতে পারতুম না ; আর তখনই মনে হত রাত্রের হাওয়া বইছে ঠাণ্ডা হিম, চাঁদ জমে যাচ্ছে আকাশে। কতবার আকুল হ'য়ে কেঁদেছি, নিজেকে ঘৃণা করেছি, কেন আমি ঘাড় পাতলুম বিয়ে করতে !

আমার অন্তরের অবজ্ঞা স্পষ্ট প্রকাশ পেল যখন গত বছরের আগের বছর আমি অল্প কিছুদিনের জন্য চীন-এ ফিরেছিলুম। তোমার কাছে না গিয়ে আমার এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে অ্যাময়ে আমি তিন মাস কাটালুম। সেখান থেকে গেলুম শাংহাই-এ নববর্ষ কাটাতে ; তার পর চলে গেলুম টোকিও। কিন্তু পড়াশুনা নিয়ে তো সারাজীবন থাকা যায় না। কাজেই অবশেষে গত বৎসর বসন্তের সময় ছাত্রজীবন সাঙ্গ ক'রে পৃথিবীকে চোখাচোখি দেখবার জন্যে তৈরি হ'তে হল।

সঙ্গে আর কিছু নয়, অনেকগুলো বাজে বই নিয়ে শাংহাইএ এসে উঠলুম কাজের চেষ্টায়।

কিন্তু কী কাজ? কী করতে পারি আমি? 'তবু ভালো যে আমাদের এই অকেজো দুর্ব্বল শাসনতন্ত্রের চোখে আর অশিক্ষিত দেশবাসীর চোখে আমি এখন সরকারি জলপানি পাওয়া বিদেশে পাশ-করা—বেকার হলেও অনিষ্টকারী তো নই—রীতিমত গুণী লোক! বৃত্তিটাতে আমার কোনো রকমে চলে যেত, সেটা ছিল একটা নিয়মিত আয়; আর তা ছাড়া নানা ছুতোয় আমি আমার দাদার আর মায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করতুম। তাতেই আমার সেই নবীন ঐশ্বর্য্যশালী দেশের সমৃদ্ধ রাজধানীতে কয়েকটা বছর উচ্ছৃঙ্খলভাবে কাটাবার উপায় হয়েছিল। কিন্তু তারপর সেই নির্দ্ধারিত দিন এলো। অন্ধকার গ্রন্থাগারের আশ্রয় ছেড়ে, আমার স্বপ্নে ক্ষান্তি দিয়ে আমাকে এগিয়ে আসতে হল। ইতিমধ্যে দেশে কয়েকজন সেনানায়ক আমাদের বৃত্তি-ভাণ্ডারের টাকা হস্তগত করলেন, এবং গত বর্ষার পর থেকে আমার মাসোহারা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

যাক্, আমাকে অনেক দিন ধরে পোষণ করা হয়েছে। ত্রিশের কাছাকাছি বয়েস হতে চল্লো; সমাজের ভিতর এইবার আমার নিজের জায়গা খুঁজে নেবার সময় হয়েছে। আর তা ছাড়া আমি এখন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-করা ছাত্র। এখন আর মায়ের আর আমার উচ্চমনা ভাই-এর কাছে হাত পাতলে মুখ থাকে না। গতবার গরমের সময় বাড়ি ফেরার আগে কেন আমি এক মাসেরও বেশি শাংহাইএ ছিলুম জানো কি? সেটা আর গোপন রাখবার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা সত্যি যে হাতে আমার যতদিন রেস্ত ছিল ততদিন আমি চেষ্টা করেছিলুম বিলম্ব করতে। কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। এই পৃথিবীতে আমার বর্ত্তে থাকার এখনও যথেষ্ট কারণ আছে কিনা এই সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করছিলুম। আমার হৃদয় যেন চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার মধ্যে আর কী-ই বা ছিল যা পৃথিবীতে কোনো কাজে লাগতে পারে?

এক গুমট রাত্রে হুয়াংপুর পারে দাঁড়িয়ে দোলায়মান জলের দিকে চেয়েছিলুম ভারি মনমরা হয়ে। একটা বিদেশি নির্বোধ কবিতার কয়েক ছত্র মাথার মধ্যে ঘুরছিল:

"বীর যদি হতে পারো তবেই বাড়ি ফিরো,
না হলে বাড়িতে ফিরো না;

ছেড়ে যাদের যাবে তারা রাখবে মনে,
যতদিন না লাড্‌লো মিনার পড়ে মাটির পরে !"

আমি ভীরু মানুষ, চিন্তাকুল, বড় বেশি ভাবুক। বিদেশে যে-কটা মাস ছিলুম তার মধ্যে এমন কিছুই করিনি যাতে করে নিজের একটু শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারি। এমন কি একটা প্রবন্ধও লিখিনি ; কি কাগজে, কি কথায় একটা বক্তৃতাও দিইনি। অন্য ছাত্রদের উদ্দীপনাপুর্ণ গরম বিতর্কে কোনোদিন একবার যোগ দিইনি। দেশের আধুনিক ছোকরারা যখন আমার দেশের জন-আন্দোলনের কর্ণধার হলো তখনও আমার কোনো সাড়া ছিল না। সবই আমার নিরস নিস্তেজ লাগ্‌তো। এ-সব ব্যাপারে আমার কোনো উৎসাহ ছিল না। কী হয়েছিল আমার ? যে-সর্ত্তে জীবনের কাছে আমি বাঁধা তাতে করে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কী ? চাকরির খোঁজ করে আমি বিন্দুমাত্র সফল হইনি, সুতরাং আমি ভেবে ঠিক করলুম যে সবচেয়ে ভালো হবে জীবন থেকে ছুটি নেওয়া। আত্মহত্যাই স্থির হলো।

এই চিন্তার বশবর্ত্তী হয়ে প্রতি রাত্রে ধীর-পদে আমি হুয়াংপুর পাশে এসে দাঁড়াতুম। কিন্তু করবার মতো কিছু একটা না করে ছুটি নিতে পারলুম না। করবার মতো কিছু বলতে আমি বুঝতুম কোথাও থেকে মোটা রকম কিছু টাকা সংগ্রহ করে খুব খানিকটা মাতলামো আর হুল্লোড় করে তারপর গোটা কতক খুনজখম করা। কোনো একটা বিশেষ লোককে মারবো বলে যে মতলব করেছিলুম তা নয় ; সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণীর উপর যে আমার আক্রোশ ছিল তা-ও নয়। যাকে খুন করতুম সে যদি বড়লোক হতো তাতে হতো সমাজেরই উপকার ; আর যদি হতো গরীব বেচারা তা হলেও তার নিরামিষ জীবনের অন্ত করে দিয়ে তার সাহায্যই করতুম। তারপর লাফিয়ে পড়তুম হুয়াং পুতে।

আর জানো কি, এই সমস্ত পাগলামি যখন আমার মাথায় ঘুরতো তখন একবারের জন্যেও মাথায় আসেনি যে আমার মৃত্যুর পর তোমার কী হবে ? ঠাকুরমা কিংবা মায়ের কথাও কোনোদিন ভাবিনি। তুমি বলবে আমার দায়িত্বজ্ঞান খুবই কম। ঠিক তাই ; আর সেই কারণেই আমার একটা নিষ্ঠুর আনন্দ হয়। দোষটা হচ্ছে প্রথমতঃ আমাদের এই রেষারেষির সমাজের, যার ভিতর আমরা থাকতে বাধ্য অথচ যে-সমাজ আমাদের কোনো কাজেই লাগতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তোমার বাপ মা'রা-যাঁরা তোমাকে স্বাধীনতা আর

আত্মনির্ভরতা শেখাতে পারেন নি। আর তারপর দায় হচ্ছে আমার মায়ের আর আমার পরিবারের অন্যান্য সকলের, আর পিতৃপুরুষদের—যাঁরা মৃত্যুর পরেও বংশধারীদের স্কন্ধে ভর করে প্রেতহস্তে তাদের চালিত করেন, যাঁরা স্পষ্টই জানতেন, যতদিন আমি পড়া-শুনা করছি ততদিন তোমাকে ভরণ-পোষণ করবার কোনোই সঙ্গতি আমার নেই, তবু এই বিয়েতে জোর করে আমায় রাজি করিয়েছিলেন। অবশ্য সে-সময় এই সব নিয়ে আমি অত বিচার করিনি; যা বলছিলুম, তোমার কথাই তখন আমার মাথায় আসেনি।

'ট' যদি হঠাৎ একদিন রাত্রে আচম্বিতে আমাব ঘরে ঢুকে অ্যাময়-বাসী আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে এক চিঠি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা না করতো তাহলে যে কী হতো বলতে পারি না। সাধারণতঃ 'ট'-এর সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা ছিল এক-তরফা ব্যাপার, কারণ আমি তার বাড়ি গেলেও সে কোনোদিন আমায় ফিরতি দেখা দিত না। তাই সেদিন সেই আষাঢ়ের সন্ধ্যায় সে যখন আমার ঘরে এসে ঢুকলো তখনই আমার মনে হলো সে অসাধারণ কিছু একটা খবর এনেছে। ঠিকই ধরেছিলুম। আমাব ভাঙা ডেস্কের পাশে বসতে বসতেই সে চিঠিটার কথা তুললো।

বল্লে, "অ্যাময়ে তোমার একটা মাষ্টারি করবার সুযোগ এসেছে। করবে নাকি?"

পড়ানোটাকে যে আমি কি ঘৃণা কবি তা বোধহয় তোমাকে আবার বলতে হবে না। ওটা হচ্ছে কপদ্দকশূন্য বিদ্বজ্জনদের জন্যে সৃষ্ট বিশেষ একটা নরক। আমার সঙ্গে ছ-মাস কাটাবার পর এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই তোমার কোনো ভুল ধারণা নেই। সবচেয়ে খারাপ এই যে, কলেজটা ভরা ছিল কেবল নানারকম চক্রান্তে। আচার্য্যের পদটা করায়ত্ত করবার জন্যে একদল উচ্চাকাঙ্ক্ষীর মধ্যে বিষম রেষারেষি ছিল, আর ওখানে যারা পড়াতো তাদের পক্ষে এই হানাহানির মধ্যে নিজেকে না জড়িয়ে কোনো উপায় ছিল না। মনে হয়, এখনও তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না যে প্রায়-না-খেয়ে দিন কাটাবার অবশ্য-সম্ভাবনা সত্ত্বেও ঐ রকম অবস্থার মধ্যে কাজটা নেওয়া আমার কি জঘন্য লেগেছিল!

সত্যি, আমার অবস্থা তখন মরিয়ার মতো, তাই এই প্রস্তাব উপেক্ষা করবার সাহস আমার ছিল না। 'ট' যখন আমাকে ঐ চিঠি দেয় তখন আমার কাপড় জামা যা কিছু সম্পত্তি সমস্তই বন্ধক দেওয়া হয়ে গেছে। আমার অবস্থা তখন ঠিক সেই হতভাগ্য জার্মান কবি গ্রাব্বের মতো, যিনি শহরে গিয়েছিলেন যশ

অন্বেষণে। যাবার আগে তাঁর বুড়ি মা তাঁর হাতে পূর্ব্বপুরুষদের এক প্রস্থ রূপোর থালা দিয়েছিলেন ; সেগুলি বংশানুক্রমে বহুদিন সেই পরিবারে রক্ষিত ছিল। রাজধানীতে এসে এই রূপোর জিনিস বন্ধক রেখে তিনি জীবন শুরু করলেন। প্রতিদিন একটা রূপোর চামচ বা অন্য কোনো কিছু গ্রাস হতে থাকলো। কিছু দিনের মধ্যেই সব কিছু হয়ে গেল হজম। আমার কাছে সে-রকম পুরোনো দামি কোনো জিনিস ছিল না। আর সত্যি বলতে কি, ছিল কেবল একটা রূপোর ছবির ফ্রেম, যেটা আমি টোকিওতে তোমাকে দেবো বলে কিনেছিলুম। বহুবার এটাকে বাঁধা দেবার লোভ হয়েছিল, কিন্তু সব কঠিন অবস্থার ভিতর দিয়ে সেটাকে বাঁচিয়ে এসেছি। আমি স্থির করেছিলুম যদি পারি তো এই ছোট্ট জিনিসটাকে আঁকড়ে ধরে রক্ষা করবো তোমাকে উপহার দেবার জন্যে। যাই হোক, ভাগ্যের আর এক পরিহাস, এই চিঠি পাবার পর সেই উপহারটি মহাজনের কাছে বাঁধা রেখে আমার ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করলুম যা দিয়ে বুড়ি ঠাকুমা, মা আর ভীরু-শাবক তোমাকে দেখতে যেতে পারি !

সে এক বুক ভাঙা সৌন্দর্য্যে ভরা আষাঢের অপরাহ্ন, যেদিন আমি হাং চৌ থেকে পাড়ি দিলুম বিস্তৃত ছীয়েন থাং নদীর উপর দিয়ে 'ধর্ম্মের সেতু' আর লি পর্ব্বত ছাড়িয়ে ঘন বনময় উপত্যকার ভিতর দিয়ে, আমাদের নগরের প্রাচীর অবধি। আনন্দও হচ্ছিল আবার ভয়েও কাঁপছিলুম। নগরদ্বারের সামনে থেকে যে-পাহাড়গুলো ঢালু হয়ে নেমেছে তাদের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভিতর দ্রুত ওঠা-নামা করতে লাগলো। গুন্‌গুন্ করে আমি গান করছিলুম আবার সেই সঙ্গে, জানি না কী করে দুটো পরস্পর-বিরোধী অনুভূতির প্রকাশ সম্ভব—আমি ভিতরে-ভিতরে প্রার্থনা করছিলুম—"হে ভগবান, আমি যখন জাহাজ থেকে নামবো পরিচিত কেউ যেন আমায় দেখতে না পায় ! আমার এই পরাভবময় প্রত্যাগমন তারা যে দেখবে এ-আমি সইতে পারবো না।"

জাহাজ নোঙর ফেলতেই দু-হাতে দুই প্যাঁটরা নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে খট্‌খটে রোদের মধ্যে বাড়ির দিকে ছুটলুম। পলাতকের মতো মাথা নীচু করে চল্লুম সেই মানুষ আর জন্তুর ভিড়ের মধ্যে দিয়ে। বাড়িতে পৌছলুম নিরাপদে ; সামনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে দেখি মা একলা খিলেন ঘরে বসে চা খাচ্ছেন। আশ্চর্য্য, জানো আমার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁকে যখন প্রথম দেখবো ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলবো—"মাগো, মা আমার !" কিন্তু যখন

দেখতে পেলুম ঐখানে তিনি বসে আছেন হঠাৎ কেমন একটা রোষ এসে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেল্লে। আমি আর তাঁর কাছেও যেতে পারলুম না। যে-অবিচারের যূপকাষ্ঠে আমাকে বলি দেওয়া হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি তাকে ঘৃণা না করে আমি থাকতে পারিনি! আমি কোনো কথা না বলে চামড়ার প্যাঁটরাগুলো খাটিয়ার উপর ফেলে রেখেই হাসি-কান্নার অভিনয়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে দৌড়ে উপরে নিজের ঘরে চলে এলুম।

তোমাকে সেখানে দেখে অবাক হয়ে গেলুম—খাটের ধারে হাঁটু গেড়ে বসে তুমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছো, তোমার মুখ চোখ কেঁদে-কেঁদে লাল হয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ বোকার মতো তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু রাগই হলো। শেষে শুষ্ক বিষণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম—"কী হয়েছে?" তোমার কান্না তাতে আরো বেড়েই উঠলো। আমি আবার প্রশ্ন করলুম, তুমি উত্তর না দিয়ে কেঁদেই চল্লে। হা ভগবান! পরের কান্না আমি থামাবার কে? উল্টে বরং অন্যের দুঃখ দেখলে আমার নিজেরই চোখে জল এসে যায়। তাই পর-মুহূর্তেই তোমার মাথা জড়িয়ে ধরে আমার নিজের হৃদয়াবেগকে মুক্ত করে তোমার সঙ্গে আমিও কান্না জুড়ে দিলুম। কিছুক্ষণ পরে নীচে থেকে মা এসে উপস্থিত হলেন দর্পিতভাবে। বল্লেন:

"ওগো রাজকন্যে! দুটো শাদা কথায় তোমার এত রাগ যে ঘর ছেড়ে চলে যাও? আর তোমারই বা কী আক্কেল, জানোয়ার? শাংহাই শহরে একটা পুরো মাস নষ্ট করে আজ বাড়ি ফিরলে; বাড়ি এসে মাকে একটা নমস্কার পর্যন্ত নয়, প্যাঁটরাগুলো আমার পায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল! এ কি রকম ব্যবহার? তুমি রাজপুত্তুর হলেও তোমার এ রকম ব্যবহার কেউ সইতো না!···অনেক দিন থেকেই আমি জানি; তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি-পত্র চালাচালি করছ। আমার কোনো সন্দেহ নেই আমাকে খুন করবার মতলবও চলছে!"

আমার চোখের জল হঠাৎ শুকিয়ে গেল, আমার রক্ত হয়ে গেল ঠাণ্ডা। গুমোট গরম সত্ত্বেও গায়ের চামড়া যেন দারুণ শীতে কুঁকড়ে উঠলো। আমার মস্ত একটা ঘা লাগল; প্রত্যুত্তরের জন্যে প্রস্তুত, এমন সময় তুমি আটকে রাখলে। তা যদি না করতে তাহলে সেদিন আমি নিশ্চয় ভীষণ একটা কিছু করতুম আর মাকে বিদায় দিয়ে দিতুম চিরদিনের মতো। এটুকুর জন্য অন্তত:, আমাকে এই

অসন্তানোচিত পাপকাজ থেকে বাঁচানোর জন্য আমি তোমাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউই ভাবোনি যে সেদিন আমি ফিরে আসব। পরে যখন আমাদের ঝগড়া মিটমাট হয়ে গেল তখন শুনলুম মা তোমার সঙ্গে কী রকম দুর্ব্যবহার করছিলেন, এমন কি আমার শাংহাইএ দীর্ঘকাল থাকার জন্যে তোমার দোষ দিচ্ছিলেন। সেই দিনের ঘটনাটা যে প্রথম তা নয়। তাই আর আশ্চর্য্য কি, যখন তুমি শুনলে তোমাকে আবার ছেড়ে আমি অ্যাময় যাচ্ছি তখন তোমায় সান্ত্বনা দেওয়াই দুরূহ হয়ে উঠলো। কিন্তু তা বলে তৎপর হয়ে আমার কাজে বাধা দেবার কথা তোমার মনেই আসেনি। হাল ছেড়ে দেওয়া, সব কিছু মেনে নেওয়া, এই হচ্ছে তোমার অসীম দুঃখের কারণ, যেমন আমার দুঃখের মূল হচ্ছে ঘৃণিত সমাজ-ব্যবস্থাকে বাধা দেবার আর তার বিরুদ্ধে লডবার সম্পূর্ণ অক্ষমতা! ওঃ বিদ্রোহ করা! বিদ্রোহ! কথাটাকে আমরা জানি, কিন্তু কেমন করে কোথায় শুরু করতে হয়? আমাদের মত ক্ষীণ দোমনা মানুষের তা জানা নেই!

সেদিনকার সেই ঘটনার পর থেকে আমি লক্ষ্য করতে লাগলুম তুমি যেন আরো ফ্যাকাশে আরো রোগা হয়ে যাচ্ছ, ম্যালেরিয়ায় যখন ভুগতে তার চেয়েও বেশি। তোমার পা হয়ে পড়ছে রোগা পাঁকাটির মতো। স্থির করলুম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে অ্যাময়ে যাবো। যাত্রার খরচ পাঠাবার জন্যে তখনই কলেজে এক চিঠি লিখে দিলুম। সেই দুশো ডলারের অপেক্ষায় যখন আমরা দুজনে বসে আছি মাকে কিন্তু তখনও একটি কথাও জানাই নি। তবু টাকা যখন এসে পৌছল তখনও তুমি ইতস্ততঃ করছ।

"যদি সেখানে তোমার চাকরি যায়, যদি হাতের টাকা ফুরিয়ে যায়, তখন আমরা কী করব? কোথায় যাবো আমরা তখন?" গ্রীক ভবিষ্যদ্বক্তার মত তুমি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখলে আমাদের ভবিষ্যতের দুর্যোগ। কিন্তু তখন আমি কী করে জানবো আমাদের এই শোচনীয় পরিসমাপ্তির কথা, যা আজ হয়েছে!

কয়েকদিন মাত্র একসঙ্গে থাকার পরিণাম যে এমন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আসবে এটাই অর্থশূন্য মনে হয়। অ্যাময়ে গুছিয়ে বসতে না বসতেই তোমার যেটুকু স্বাস্থ্য ছিল তাও হারাতে বসলে। তোমার ক্ষিদে কমে গেল; প্রায়ই তুমি বমি করতে আর প্রায় সারাক্ষণই বিছানায় শুয়ে কাটাতে অবসন্ন হয়ে। ব্যাপারখানা আমি একমাসের মধ্যে বুঝতে পারিনি এবং কয়েকবার তোমাকে

কড়া কথাও শুনিয়েছিলুম। তারপর তৃতীয় এবং চতুর্থ মাসে যখন তোমার অবস্থা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই রইল না, তখনও আমি অশিষ্ট ব্যবহার করেছি নানা বিচিত্র পথে আমার ক্রোধকে মুক্ত করে।

নিয়ম ধরে পড়ানোর কাজ আমার দু চোখের বিষ ছিল। মনে হত, কাজটা শুকনো এবং ক্লান্তিকর। বড় কষ্ট হত। ক্লাসে যাতায়াত করতুম, মনে হত অযথা যেন আমাকে কয়েদ করে রেখে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে। সারাক্ষণই মনে থাকত এই দুর্ব্বলতা, কিন্তু আরো থাকত তোমার প্রতি একটা করুণা আর স্নেহ, যার বিরুদ্ধে আমি সব সময় লড়াই করতুম।

এই সময় বহুদিন আগে লেখা আমার একটা প্রবন্ধ (সাহিত্যে নবজাগরণেরও আগে লেখা) আমার অনুমতি না নিয়েই এক পত্রিকায় ছাপা হয়ে বেরলো। এতে আমার উপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ শুরু হল, বিশেষ করে কয়েকজন ঈর্ষান্বিত সহ-অধ্যাপকদের দিক থেকে। খুব খারাপ লাগতে লাগল। চটেছিলুম ভয়ানক অথচ কিছুই করবার উপায় ছিল না। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ব্যবহার এই দুইতেই আমি অভ্যস্ত কিন্তু দেখলুম এখন আর আমি অধ্যাপকের কাজে ইস্তফা দিতে পারি না। গত গ্রীষ্মের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি যে ভাবাও যায় না; বিশেষ তোমার ভরণের ভার নিয়ে, তার-উপর এক শিশুর আসন্ন আগমনের সম্ভাবনায়। কিন্তু এর জন্যে তোমায় কত কষ্টই না পেতে হয়েছে।

নিজের প্রতি যখন তাকিয়ে দেখতুম চোখে পড়ত যে, আমি সমাজের প্রপীড়নে নিঃসহায়। তখন এই কাজের জগতে নিজের ভীরুতাকে নিজে ক্ষমা করতুম; কিন্তু বাড়িতে সেটা পুষিয়ে নিতুম তোমাকে নির্য্যাতন করে। সমাজের কাছে উৎসর্গ হয়েছিলে তুমি, আমি নয়; নিরপরাধ মেষশিশু তুমি, তোমাকে সামাজিক নির্য্যাতনের বেদীতে বলি দেওয়ানো হয়েছিল আমার হাত দিয়ে। নিজের পথ সমর্থন করতে কত বাজে ওজরই না আনতুম। নতুন ভাবে অপমানিত হয়ে ফিরে এসে খাবারের ভিতর খুঁত ধরতুম কিংবা তোমার গৃহস্থালীতে, অথবা সোজাসুজি তোমাকেই দোষী করতুম আমার সমস্ত ঝঞ্ঝাটের মূল কারণ বলে। চাকরী হারাবার সম্ভাবনায় যখন আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতুম তখন আমি চীৎকার করে বকুনি দিতুম তোমাকে! সেই সব গালাগালি এখন আমার মনের মধ্যে অতি সুস্পষ্ট দাগ টেনে যায়।

আমি তোমার উপর দাবী করতুম "তুমি মরো না কেন? কেন শেষ হয়ে যাও না? তুমি যখন মরবে ঠিক তখনই তো আমি আবার বাঁচতে শুরু করতে

পারব। আসলে তুমি কী? একটা পরাধীন জানোয়ারের মতো কেন আমি তোমার জন্যে খাটছি? ওঃ একটু মুক্তি—এই অন্তহীন একঘেঁয়েমির থেকে একটু মুক্তি—বাঁচবার স্বাধীনতা! তুমি হচ্ছ জীবন্ত মড়া। কেন, কী করতে এখনও তুমি বেঁচে আছ?"

এই সব শুনতে শুনতে যখন আর সইতে পারতে না তখন তোমার অশ্রু নেমে আসত চোখে। তুমি অবশ্য নিঃশব্দে কাঁদতে যাতে আমি দেখতে না পাই। পরে আমার অনুশোচনা হত, আমি তখন ক্ষমা চাইতুম, তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করতুম, এমন কি আদরও করতুম। আমার ঘৃণা যে আসলে তোমার প্রতি নয়, পৃথিবীর 'প্রতি এইটে তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে তোমাকেই করে তুলতুম আমার সমস্ত অভিযোগ সমস্ত দুঃখের আধার। তাতে তুমি আরো অঝোরে কাঁদতে, আর অনেক সময়ই শেষটা দুজনেই বিলাপ করতে শুরু করতুম উভয়ে উভয়কে জড়িয়ে ধরে। প্রথম প্রথম এটা ঘটতো কালে-ভদ্রে, কিন্তু পরে, বিশেষতঃ নববর্ষের ছুটির কাছাকাছি সময়, এ রকমটা হত প্রায় রোজই, এমন কি মাঝে মাঝে দিনে দুবারও।

তোমার আর আমার মধ্যে এই যে শোকাবহ সম্পর্ক এটা কী? বিয়ে জিনিসটাই কি অপরাধ না বিবাহ-প্রথার উপর যে-সমাজ আধিপত্য করে তারই অপরাধ? প্রথমটা যদি সত্যি হয় তাহলে জীবনের কাছ থেকে কিছু আশা করাই বৃথা! কিন্তু দায়ী হয় যদি সমাজ, বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরই যদি এর কারণ থাকে, তাহলে আমাদের উচিত লড়াই করে নিয়ম সব বদলানো। এই দুঃখ-স্রোতের মধ্যে আরো নতুন নতুন উত্তরাধিকারীদের টেনে এনে তাকে আরো বৃহৎ করে তোলার পথে বাধা দেবার নিশ্চয়ই কোনো একটা উপায় আছে। একমাস বয়েস হতে না হতেই আমাদের নিজেদের রোগের সব রকম লক্ষণ শিশুটার মধ্যে, প্রতিবাদকারী জীবনের এই ছোট্ট পুঁটলিটার মধ্যে, ভবিষ্যতের ব্যথার এই পাত্রটির মধ্যে দেখা দিল। ওর স্নায়ু বড় দুর্ব্বল, অল্প দুঃখেই ও কেমন কেঁদে ওঠে! দেখোনি, ঠিক সময়ে দুধ না পেলে ওর কপালের নীল শিরাগুলি কিরকম ফুলে ওঠে? যে-আমি ঘৃণা করি জীবনকে, বসে থাকি মৃত্যুর আগমনের প্রতীক্ষায়, সে এই অনাকাঙ্ক্ষিত জীবন-স্ফুলিঙ্গকে এমন ধারা পৃথিবীতে ডেকে আনল? আত্ম-প্রতিবাদের এ কি জঘন্য ছবি! এটা সত্যিই পাপ! কোনো উপায়েই এর কোনো কারণ দেখাতে অথবা একে সমর্থন করতে আমি পারব না। কেউ যদি তোমাকে এই প্রশ্ন করে তাহলে দয়া করে আমার হয়ে তার জবাব দিও।

একমাস আগে আমাদের অবস্থা একেবারে চরমে পৌঁছল। ঘটনাটা আমার মতো তোমার হয়ত স্পষ্ট মনে নেই। খুব স্বাভাবিক, কেননা তুমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু প্রত্যেক খুঁটিনাটি, যার থেকে আরম্ভ করে ঘটনাটা চূড়ান্তে গিয়ে ঠেকলো তার সমস্ত আমার মনে জেড্ পাথরে কাটা শিরোনামার মতো ছাপা আছে। সেদিন রাত্রি, আকাশে চাঁদের সিকিখানা মাত্র দেখা যায়—এই একটু আগে পুব-আকাশে উঠেছে।

অধ্যাপকের কাজে আমি তখন ইস্তফা দিয়েছি। আমার দাদা এক নতুন ব্যাঙ্কে একটা চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু রাজনৈতিক গণ্ডগোলের জন্যে ব্যাঙ্কটা খুলতে দেরি হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমি আলস্যে দিন কাটাচ্ছি। সেদিন বাড়ি ফিরেছি মদে চুর হয়ে, মনটা বড় দমে আছে, অন্যান্য দিনের চেয়েও একটু বেশি; তাই তোমাকে আর তারপর শিশুটাকে দেখে আমি হঠাৎ অকারণে উন্মত্ত হয়ে উঠলুম। কটু কথা আর জ্বলন্ত বিদ্রূপ বর্ষণ করলুম তোমার উপর; বল্লুম তোমরা দুজনেই আমার পায়ের শিকল। মনে হয় বলেছিলুম, আমি জলে ডুবে মরব। তারপর আমি জেদ ধরলুম তোমাকে তোমার দেশে ফিরে যেতে, সঙ্গে নিয়ে যেতে ছেলেটাকে। এইভাবে নিজেকে একেবারে অবসন্ন করে ফেলে বোধহয় অর্দ্ধচেতন অবস্থার জ্বরের ঘোরে শুয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিলুম। মনে পড়ে মশারিব ভিতর দিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলুম আব্ছাভাবে। তুমি তখন 'ছোট ড্রাগন'কে এই ধরণের কী একটা বলছিলে:

"না—ছি! দুষ্টুমি কোরো না। চুপ করো—খোকা!····· ঘুমোও, ঘুমোও! মা চলে গেলে······বাবাকে রাগিও না—কেমন?"

বাতির আলোতে মনে হচ্ছিল যেন তুমি কাঁদছো। তাই সেই একই দৃশ্য দেখে আমি অরো বিরক্ত হয়ে উঠছিলুম। অধৈর্য্য হয়ে আমি উল্টো দিকে ফিরে শুলুম। তুমি যে সেখানে আছ, নীরবে কাঁদছ, কিছুক্ষণ এ-ও আমার মনে আছে। তারপর এ-ও জানি যে কাছে এসে তুমি একবার মশারি তুলে আমার দিকে দেখলে। আমি তখন ঘুমিয়ে পড়তে উৎসুক, কাজেই আর নড়লুম না।

যখন জাগলুম তখন দরজায় কে যেন জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি লেপের ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিলুম। কয়েকজন রাস্তার রিক্সাওয়ালা। হতবাক্ হয়ে দেখলুম তারা তোমাকে কোলে করে নিয়ে আসছে। টলতে টলতে এগিয়ে গেলুম তোমার দিকে। তোমার মাথার চুল খুলে পড়েছে, জলে সর্বাঙ্গ ভেজা! তোমার সপ্সপে কাপড়ের চারপাশে—নীল আর কালো

—কাঁচা রংএর ছোপ। সেই দ্বাদশীর চাঁদ তখনও লেগে ছিল আকাশে ; তারই ঝাপ্‌সা আলো তোমার মৃতের মতো পাঙাস মুখের উপর পড়ে একটা বীভৎস ভাব সৃষ্টি করেছিল। তোমার তো চোখ বন্ধ কিন্তু ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। ভয় পেয়ে, তোমায় জড়িয়ে ধরে তোমার নাম ধরে কতবার ডাকলুম। শেষে একবার তোমার চোখের পাতা খুললো তারপর তখনই আবার বন্ধ হয়ে গেল। ফোঁটা ফোঁটা জল তোমার চোখের পাতার কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। হায়রে! তখন আমি জানলুম ভালো করেই জানলুম যে তুমি আমায় ঘৃণা করো না। সত্যিই যে করো না, বুঝলুম সেটা সহজেই তোমার ঐ অশ্রুর রেখা থেকে, কিন্তু কেন আজ অবধি তা আমি উপলব্ধি করি না! তখন সেই অবস্থার মধ্যে আমার কাঁদা উচিত ছিল না, কিন্তু সেই ক্ষণে সবার সামনে আমার চোখ উপচে এলো জল, বুকের মধ্যে থেকে নিঃশ্বাস উঠে এলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

ওরা তোমাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে এলো, তারি আওয়াজে ক্ষুদে ড্রাগনের ঘুম গেল ভেঙে। সে-ও ঘ্যানঘ্যান শুরু করল। তার একটানা কান্না শুনেই তুমি বোধ হয় আবার চোখ খুলে আমার দিকে চাইলে। আমি তোমার ভিজে জামা কাপড় খুলতে শুরু করলুম। বললুম, ঘুমোও এখন একটু, খোকার জন্যে ভাবতে হবে না। পাশের ঘর থেকে দাসীটা ঘুম থেকে উঠে জানতে এলো কী হয়েছে? খোকাকে তুমি চাও জেনে আমি তাকে বল্লুম, খোকাকে নিয়ে আসতে। ঠিক সেই সময় আমার মনে আছে একটা জাহাজ, কাছাকাছি কোথাও থেকে হঠাৎ এক কান-ফাটানো শব্দে বাঁশি বাজিয়ে উঠলো কোনো দূর বন্দরে যাওয়ার জানান দিয়ে।

যে-পনেরটা দিন তুমি হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে সে-কদিন আমার মনটা এতো পরিষ্কার এতো বিশুদ্ধ ছিল যে এমন আর কখনও হয়নি। আমার হৃদয় ছিল ভালোবাসায় পরিপূর্ণ, মহৎ সব সংকল্প-ভরা ছিল মনে। কিছুদিনের জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে, নিজের সমস্ত আত্মাভিমানের বদলে তোমারই চিন্তায় মগ্ন ছিলুম। মনুষ্যোচিত মর্যাদার খানিকটা যেন আস্বাদ পেলুম। তুমি যখন ভুল বকতে, তোমার জ্বর যখন প্রায় একচল্লিশ ডিগ্রির কাছে উঠতো তখন আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার পাশে বসে কাটিয়েছি।

তুমি প্রশ্ন করতে “ক্ষুদে ড্রাগন, কেমন আছো তুমি?”—“ব্যাঙ্কে কবে যাচ্ছো?”

শেষে যখন আমরা অ্যাময় ছাড়লুম তখন আমি চেয়েছিলুম তোমাকে সঙ্গে

করে আমার শহরে গিয়ে সেখানেই বসবাস আরম্ভ করবো। আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে আধুনিক জগতে নিজেকে চালিয়ে নেবার মতো চতুরতা আমার নেই, যেখানেই যাবো আমায় অসুবিধায় পড়তে হবে। যদি একটা চাকরিও পাই, তাতেও বিশেষ কিছু অদল-বদল হবে না এবং শেষ-পর্যন্ত একটা একঘেঁয়েমির সুর এসে পড়বে। ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই থাকবে না। আমি দেখলুম, আমার পক্ষে আমাদের সাবেক বাড়িই সব থেকে ভালো জায়গা। আমাদের পরিবারে অনেক টাকা হয়তো নেই কিন্তু দুবেলা দুমুঠো খাবার পক্ষে তা যথেষ্ট, তা ছাড়া থাকবার একটা জায়গা তো রইলোই। তোমার বয়েস সাতাশ, আমার আঠাশ। মনে মনে হিসেব করলুম আমি, 'ধরো যদি পঞ্চাশ বছর আমরা বাঁচি, তাহলে তো আর খুব বেশি দিন নেই। উপরন্তু নাম-কেনার আকর্ষণ তখন আমার চলে গেছে, প্রচুর টাকা করবার ইচ্ছেও আর নেই। সুবিধে পেলেও—অন্য অভাগাদের ঘাড়ে চেপে টাকা জমাবার জন্যে যে-হৃদয়হীনতার প্রয়োজন তার ছোঁয়াচ আমার মধ্যে নেই—এটা আমি জানতুম।

অ্যাময় ছেড়ে যখন এলুম তখন এইসব বিষয়ে আমি মন স্থির করে ফেলেছি। তোমাকে দেখাবার জন্যে যে-সব বাড়ির নক্সা নিয়ে এসেছিলুম তা নিয়ে আমরা অনেক সময় কাটিয়েছি। দুজনে মিলে ফলাও করে নিজেদের মতো এক নক্সা করলুম শহরের উত্তর দেয়াল ছাড়িয়ে আমাদের খোড়ো চালের বাড়ির জন্যে। সোনাবালি নদীর উপর দিয়ে যখন আমরা যাচ্ছি তখনও আমার মনে ঐ-ই আছে ; এমন কি শাংহাই-এ পৌছবার পরও। তারপর দ্বিতীয় দিন থেকে আমার সংকল্প যেন একটু মলিন হয়ে এলো, তোমার মনে আছে নিশ্চয়। আমরা ছবি তোলালুম—তারপর রাত্রের ভোজ শেষ করে আমি গেলুম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে—সে সম্প্রতি জাপান থেকে ফিরেছে। তার সঙ্গে গল্প করতে বসে আমার সংকল্পের কথা তার কাছে সমস্ত বল্লুম। সব শুনে সে অনুমোদনও করলে না, নামঞ্জুরও করলে না। কেবল তার চারপাশে অনেকগুলি ছেলে খেলা করছিল তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্লে :

"এই দিকে চেয়ে দেখো। আমার দায়িত্ব হচ্ছে এরাই। আমি তো সে দায়িত্ব ত্যাগ করবার কথা ভাবিনি। আমার বোঝা তোমার চেয়ে অনেক ভারি কিন্তু আমি সে নিয়ে কারুর কাছে নালিশ জানাইনে।"

ভাবলুম, হায়রে, কত সহজেই আমি হেরে গেছি। পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম আসল সংঘাতেই আমি রণে ভঙ্গ দিচ্ছি মহা ত্রাসে। এতো সহজে যে হার মানে

সে কেমন ধারা মানুষ? তারপরে আমাব বন্ধুর কথা, আমার নিজের সংকল্পের কথা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো, সারারাত তাই ঘুমতে পারলুম না। তুমি আপনা থেকেই ঠিক বুঝেছিলে তাই ছিলে মুখ বুজে। বোধ হয় ভয় করছিলে একটি কথা বল্লেই তার জবাবে ছুরির মতো ধারালো অভিসম্পাত বর্ষণ হবে। তোমার হাসপাতালে যাবার পর এই প্রথম আমার মনের মধ্যে সেই পুরোনো দ্বন্দ্ব আবার শুরু হলো। দীর্ঘ তিন দিন ঠিক এইরকম ভাবে আমার কাটলো। অবশেষে গত রাত্রে যখন আমি বিছানায় নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছি আমাকে দেখে মায়া করে তুমি বল্লে:

"তোমায় আর আমি অসুখী দেখতে পারি না। তুমি এখানে শাংহাইএ একলা থাকো, খোকাকে নিয়ে আমি ফিরে যাবো। তুমি শুধু আমাকে গাড়িতে তুলে দিও। আর দেরি না করে কালই আমি চেচিয়াংএ ফিরে যাবো।"

সেদিন রাত্রে আমরা একটা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলুম, কিন্তু পাছে আমি আবার মত বদলে শেষে তোমাকে আর ক্ষুদে ড্রাগনকে যেতে না দিই, এই ভয়ে বোধহয় তুমি তখনই যেতে চাইলে। স্বীকার করছি তোমার প্রতি এক হিসেবে কৃতজ্ঞতাই বোধ করেছিলুম, কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার প্রতি তিক্ত না হয়েও পারিনি। তাই তুমি যখন ঘুরে ঘুরে তোমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিচ্ছিলে তখন আমি একটি কথাও বলিনি। নির্বাক আমরা ষ্টেশনে এলুম, তুমি গাড়িতেও চড়লে! অবশেষে আমি সেদিনের আবহাওয়া সম্বন্ধে সেই নির্বোধ মন্তব্যটা করলুম:

"আজকের দিনটা তো খুব খারাপ বোধ হচ্ছে না।"

তুমি বুঝলে, বুঝে মুখ ফিরিয়ে নিলে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলে তুমি, যেন আকাশের অবস্থাটা কী বোঝবার চেষ্টা করছো। তোমার সেই জল-ভরা চোখে যদি চকিতেও আমার দিকে ফিরে তাকাতে তাহলে নিশ্চয় নিজেকে সামলাতে পারতুম না। হয়তো তোমাদের আটকে রেখে দিতুম, কিংবা তোমাদের সঙ্গে যেতুম, অথবা অন্ততঃ হাং চৌ অবধি যাবো বলে জেদ করতুম। কিন্তু তুমি আর আমার দিকে চাওনি, আমিও আর কিছু বলিনি, এইভাবেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম তোমার খড়খড়ি দেওয়া জানলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে। তারপর গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করলো তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে বিদায় নিতে হাত নাড়লুম। আমি দেখতে পেলুম তোমার বাঁ-গালে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

অনেকক্ষণ ধরে, সবাই যখন চলে গেছে তারও অনেক পরে গাড়ির দিকে চেয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর পা দুটোকে কোনরকমে টানতে টানতে যখন চলে এলুম তখন আমার মনে হচ্ছিলো আর কোনোদিন আর কখনও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

আর তবু্ও—তোমার জন্যে আমার প্রাণ কেঁদে উঠেছে।

আত্মহত্যা

মাও-তুন

(১৮৯৬—)

সেন ইয়েন-পিং মাও-তুন ছদ্মনামেই বেশি পরিচিত। অন্যান্য ছদ্মনামেও তিনি বিস্তর রচনা করেছেন। এঁর সাহিত্যিক-জীবন শুরু হয়েছিল শাংহাইএর এক সুবিখ্যাত এবং সুবৃহৎ পুস্তক-প্রকাশকের দোকানে প্রুফ-রীডার হিসেবে। চীনদেশের বিখ্যাত 'গল্প পত্রিকা'র সম্পাদক হিসেবে ইনি দেশ-জোড়া নাম কেনেন। চীনদেশের আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মাও-তুনই বোধ করি শ্রেষ্ঠ। তাঁর জনপ্রিয় ছোটো গল্পের বইও অনেক আছে। লু্ শুন-এর তিনি বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং এই দুজনের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক প্রবণতার মধ্যে একটা মস্ত মিল দেখা যায়।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ তাঁর পঞ্চাশ বছরের জয়ন্তী-উৎসব করেছে। এখন তিনি চীনা সরকারের সংস্কৃতি-বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। কয়েক বছর আগে দিল্লীতে যে আফ্রিকা ও এশিয়ার লেখকদের সম্মিলন হয় তাতে মাও-তুন চীনের প্রধান প্রতিনিধিরূপে এসেছিলেন।

অলসভাবে জানলাটার ধারে দাঁড়িয়ে হুয়ান সিয়াও-চিয়ে অন্যমনে কুয়াসায়মান সন্ধ্যার মধ্যে দিয়ে হ্রদটার দিকে তার দৃষ্টি মেলে ধরে। হ্রদের কূল থেকে মানুষের গলা মেয়েটির কানে আসে অস্পষ্ট ; কালো পাহাড়ের চুড়োটা সে দেখে—যেন তার সামনে একটা বিষণ্ণ দৈত্যের মতো ঝুঁকে পড়ে আছে। হ্রদের তীরে যাকে দীপ-মালা বলে মনে হয় সেগুলি আসলে ছোটো ছোটো কুটীরের আলো—ওর মধ্যে যারা থাকে তারা সবাই সুন্দর আর তারা মনে করে এই দৃশ্যও সৌন্দর্য্যময়।

হুয়ান সিয়াও-চিয়ে কিন্তু মনে করে অন্য রকম। এর মধ্যে সে নেই। সে ভেঙে পড়েছে, তার যৌবন আর নেই। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য তার উৎকট লাগে। তার একমাত্র ইচ্ছা তার ছোটো ঘরটির মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকা যেখানে সে সহস্রবার চেষ্টা করেছে তার আত্মার অস্থিরতাকে উপশম করতে।

অপর মানুষের সঙ্গ তার পক্ষে অস্বস্তিকর, তাইতেই তার এই স্বেচ্ছাকৃত কারাবাস। লোকেরা যখন হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে তার মাঝে হঠাৎ থেমে যেত হুয়ান নিশ্চিত মনে করতো সকলের দৃষ্টি তারই

পড়েছে। বাঁকা মুখ নিয়ে মনে হতো সকলে ভিতরে ভিতরে বলছে “আমরা জানি, জানি!” তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যেও সে আবিষ্কার করলো তার প্রতি একটু অন্যরকমের ভাব! তারা যখন কথা কইতো হুয়ান সিয়াও-চিয়ে লক্ষ্য করতো তাদের হাসির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন সঙ্কেত। সে স্থির করে নিত তারা ওর বিষয় নিয়েই ইঙ্গিত করছে।

তারা যদি অমুকের সঙ্গে অমুকের প্রেম-ঘটিত ব্যাপার নিয়ে গল্পগুজব করতো, অথবা সম্পূর্ণ অজানা কাউকে নিয়ে, হুয়ান সিয়াও-চিয়ে বুঝে নিত এ-শুধু তাকেই বিদ্রূপ—অর্থাৎ তারা “ঝি-কে মেরে বৌ-কে শিক্ষা দিচ্ছে।” কাজেই সে ভীরু খরগোসের মতো নিজের গর্ত্তে লুকিয়ে থাকা শ্রেয় বলে বিবেচনা করেছিল। কিন্তু সে যখন ভুলে থাকবার জন্যে বই খুলে পড়তো, দেখা যেত প্রত্যেক গ্রন্থকারই তার গোপন কথাটি জানেন এবং প্রত্যেক গল্পের সে-ই হচ্ছে নায়িকা যাকে ঘিরে এতো দুঃখ। শুধু একটি কারণে সে সত্যিই কৃতজ্ঞ ছিল: সে যাদের সঙ্গে বাস করতো, অর্থাৎ তার মাসি, তার মাসতুতো ভাই অথবা তার স্ত্রী কেউই তার সেই দুঃসাহসিক ব্যাপারটার কথা জানতো না, নইলে পরে……

একটু উত্তেজিত হয়ে সে ঘাড় ফিরিয়ে নেয়, চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে। সত্যিই পৃথিবী কি সুন্দর! শুধু তারই ভাগ্য কেন এমন খাপছাড়া হবে? যখনই এই ধরণের চিন্তা তার মাথায় আসে, যখনই সে বোঝে মানব-সুলভ সুখ তার জন্যে আর নয় তখনই জীবনের মূল্য সে যেন আরো নিবিড় ভাবে পায়। যে-সংকল্পের ফলে তার আজ এই নিরবচ্ছিন্ন আত্মগ্লানি সে-সংকল্প তো স্থির হয়ে গেছে। তাকে তো আর নাকচ করা যায় না, যেমন যায় না সেই পরমসুখকে যে দেখা দিয়েছিল তারপরেই ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু যা কোনোদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে না তা হচ্ছে মানুষের নিষ্ঠুরতা, তার দিকে ফেরানো প্রত্যেকটি চোখে প্রত্যেকটি মুখে যা সে অনুভব করেছে। বিছানার উপর সে আছড়ে পড়ে বালিশ আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বুকের মধ্যে তার প্রবলভাবে যেন হাতুড়ি পড়তে থাকে। আর সেখান থেকে শব্দ ওঠে—“আত্মহত্যা! আত্মহত্যা করো!” কিন্তু আত্মহত্যাই তো যথেষ্ট নয়। সে যে প্রাণ ভরে চায় ঐ সঙ্গে এই সুন্দরী ধরিত্রীকেও টেনে নিয়ে ফেলে দেবে, নিজে হাতে আগুন দেবে চিতায়, অবসান করবে সব কিছুর, মানব-জাতির স্মৃতির পর্যন্ত।

ক্রোধে লাফিয়ে উঠে বিষদৃষ্টিতে সে ঘরের চারদিকে তাকায়। রোষের উত্তাপ তার মুখকে রাঙিয়ে দেয়, একটা হিংস্র ধরণের সৌন্দর্য্য তা থেকে স্ফুরিত হতে থাকে। সে একটা ডেস্কের কাছে দ্রুত যায়, একটা দেরাজ টেনে খোলে, একটা চাবি বার করে তাই দিয়ে আর একটা দেরাজ খোলে। তার মধ্যে কিছু পুরোনো চিঠি, কয়েকটা ছবি আর একখানা চৌকো চামড়ার খাপ, সেটা সে একটানে খুলে ফেলে। তার মধ্যে থেকে ঘেঁটে একটা ছবি বার করে, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর একটা চৌকিতে বসে পড়ে আবার কাঁদতে থাকে। অবশেষে সে তার বিভ্রান্ত মুখ তুলে তাকায় আর নিজেকে বলে—"ওকে দোষ দেওয়া যায় না, দোষ আমার!"

সে ঝুঁকে পড়ে ফটোর টুকরোগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের কোলের উপর সাজাতে থাকে।—মিথ্যে করে শাস্তি দিয়ে মা'রা যেমন ব্যথিত সন্তানকে আদর করেন অনেকটা সেই রকম। সত্যিই সে ওকে ভালোবাসে একথা নিজেকে সে নিশ্চিতভাবে জানায়—চিরন্তন ভালোবাসা। কামুকের মতো সে ফটোটাকে চুম্বন করতে থাকে; চুম্বন করতে থাকে ওর চোখ, ওর ওষ্ঠ। কেন তার মাথার মধ্যে এসেছিল যে সে ওকে ঘৃণা করে? ফেই-লাই-এর চুড়োর ঘটনাটা এখন যদিও তাকে যন্ত্রণা বই আর কিছুই দিচ্ছে না, কিন্তু তা হলেও ও-ই হচ্ছে তার জীবনের প্রধানতম বস্তু! যৌবন-স্রোতে নিজেকে যেমন করে সে ভাসিয়ে দিয়েছিল ওর সঙ্গে, তার কথা সে আর একবার ভাবে; তার মনে হয় সেই স্মৃতিটি সে চিরদিন অলঙ্কারের মতো পরে থাকবে। তার মুখ হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তার হৃদয়ের গভীর কন্দর থেকে সেই অপূর্ব্ব উন্মাদনা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে তাকে যেন ভারি দুর্ব্বল করে ফেলে। নিজেকে ধীরভাবে সে বলতে থাকে:

"আমি ওকে দোষ দিতে পারি না। আমি নিজেও কি ওকে কামনা করিনি? ওর মতো পুরুষ আর অমন স্থান! এক্ষেত্রে যে মেয়ে ওকে ভালোবাসে সে এ-ছাড়া আর কী করতে পারে? পাথরের দেয়ালের মধ্যে যে বুদ্ধ-মূর্ত্তি ছিলেন তিনি সাক্ষী থাকুন। এর মধ্যে অশোভন কিছু ছিল না, দৈহিক কিছু ছিল না। আমি যেন স্বপ্ন দেখছিলুম, আর ওর চুম্বন, ওর আলিঙ্গন যেন সেই জ্বলন্ত স্বপ্নেরই অঙ্গ। তার পরদিন ওর হোটেলে গিয়ে ওর সঙ্গে যে দেখা করেছিলুম সেটা অবশ্য ভুল হয়েছিল, কিন্তু সে তো অবশ্যম্ভাবী—এক দুর্জয় অপরিমিত শক্তি আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল—ঈশ্বর জানেন!"

সেদিনকার তার চিন্তার পাপড়িগুলিকে সে মনে আনবার চেষ্টা করে। কেমন করে সে যাবার জন্যে নিজেকে প্ররোচিত করলে? প্রকৃত ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই: যেহেতু তার অনিন্দ্য দেহের আর সব কিছুই ও অধিকার করেছে তবে আর ঐ শেষ বিজয় অভিযান থেকে ওকে নিবৃত্ত করার কী কারণ থাকতে পারে? এই ভেবেই সে নিজেকে ওর কাছে সমর্পন করেছিল চরমরূপে সম্পূর্ণরূপে আর সেই পরম সুখের মধ্যে—যে-সুখ প্রসারিত আত্মার মধ্যে থেকে আপনি ফুটে ওঠে। তৃতীয়বার যখন সে ওর হোটেলে দেখা করতে গেছে তখন ও চলে গিয়েছে। ও তার জন্যে একটা চিঠি রেখে গেছে, আর তার ছবি। এই হলো সবকিছু, এই হলো শেষ। এইখানেই আরম্ভ।

হুয়ান সিয়াও-চিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছবিটা আবার চামড়ার খাপে ভরে রাখে। জানলার ধারে গিয়ে সে আবার একবার বোকার মতো আকাশের দিকে তাকায়। দেখে, মেঘের মালার পিছনে পূর্ণচন্দ্র উঠছে, দেখে আকাশে তারার ভিড়—যেন শিশুর দল নাচ ধরেছে। তার চিন্তা এলোমেলো হয়ে গিয়ে আবার সেই আগেকার সমস্যাতে এসে ঠেকে, যা নিয়ে সে যতবারই তোলাপাড়া করেছে প্রতিবারই তার মনোরাজ্যে সৃষ্টি হয়েছে নতুন কারুকার্য।

ভেবে দেখতে গেলে সে কি সত্যিই বড় বেশি দুঃসাহসী, বড় বেশি বেপরোয়া হয়েছিল? গুহার মধ্যে প্রবেশ করাটাই কি তার উচিত হয়েছে? তার প্রেমিক হয়তো লম্পটবিশেষ যার অভ্যাস শুধু কুমারী-আহরণ করা? হয়তো ভিতরে-ভিতরে ও এক দুর্বৃত্ত যার কাজ শুধু শিকারের চারপাশে ছলনার জাল বুনে চলা। শিকার ধরার আনন্দই তার সব, আর এমনভাবে সে জাল ফেলে যাতে করে শিকার জালে পড়ে শুধু তার কথাই ভাবতে বাধ্য হয়। ও আগে থেকেই সমস্ত জিনিসটা ফন্দি করে করেনি তো? আর ঐ চিঠিটা—সেটাও কি ঐ চাতুরীর একটা অংশ? কে জানে, আরো অনেক মেয়ের উপর ও এই ছলনা প্রয়োগ করে এসেছে কি না? তার ঐ চিঠির মধ্যে যে সব কথা লিখে গেছে, শুধু কি সেই কথাগুলিই মিথ্যে, না ওর সব কথাই অমনি? এমন নির্বুদ্ধি সে কী করে হলো যে এই কৃত্রিমকে অন্যান্য যুবকদের সঙ্গে তফাৎ করে দেখতে পারল না? এ কি শুধু ও সুন্দর বলে? অত বুদ্ধিমান বলে? নম্র বলে? এও কি সত্যি যে যেহেতু সে এই স্বপ্নকে জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করেছে তাই তাকে এ-জীবন বিসর্জ্জন দিতে হবে? এ কি সম্ভব যে ও তার যৌন-জীবন কলুষিত করেছে?

হুয়ান সিয়াও-চিয়ে জেদ করে বলে ওঠে—"না, না, এ হতেই পারে না। অন্য মেয়েরা আমার চেয়ে অনেক বেশি অসাবধানী, তাদের এ-রকম কিছুই হয়নি। ও কখনো অতটা অন্যায় করবে না। ওর চলে যাওয়া ছিল অপরিহার্য। আমি ওকে বিশ্বাস করি। ও যে পরের জন্যে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিতে নিজেকে বাধ্য করেছে। সেই কারণেই তো ওকে চলে যেতে হয়েছে। ও হলো মহান্, ওর দায়িত্ব বিরাট। ও যে বাধ্য করেছে প্রেমের কথা থেকে বিয়ের কথা থেকে আপনাকে প্রতিনিবৃত্ত করে রাখতে .... ওর মতো জীবনে ওর তা ভাববার উপায় নেই।

"কিন্তু ও কি এ কথাও বলেনি যে ও কামুক এবং ইন্দ্রিয়-দুর্ব্বল? নারীর মোহিনী শক্তির কাছে ও হার মানে?"

হুয়ান সিয়াও-চিয়ের এতক্ষণে মনে পড়ে যে সে ওকে 'মোহিত' করবার জন্যে কৌশলের সাহায্য নিয়েছিল, মনে পড়ে সে ওকে বাহুপাশে বাঁধবার জন্যেও প্রভাবিত করেছিল। হঠাৎ সে ভারি লজ্জা পেয়ে যায়, দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলে। তার বড় আফশোষ হয় সে যখন জানল ও চলে গেছে কেন তখনই তার পিছনে পিছনে গেল না, সব বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর শেষ-প্রান্ত পর্যন্ত? এক নতুন আশায় তার হৃদয় কেঁপে ওঠে। ভাবা যাক, যদি সে ফিরে আসে? কারুর যদি এমন একজন প্রেমিক থাকে যে একটা চমৎকার কিছুর জন্য, একটা মস্ত বড় উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন বিপন্ন করেছিল তাহলে এই নিয়ে গর্ব্বিত হওয়া যায়।

"কিন্তু ওর চিঠি অনুযায়ী ওর ফেরবার কোনো সম্ভাবনাই নেই যদি-না বিপ্লবের জয় হয়। ও লিখেছে যতদিন বেঁচে থাকবে ওকে বিপ্লবের জন্যে লড়তে হবে আর যতদিন না মৃত্যু এসে ওকে রেহাই দিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ওর কর্ত্তব্যকে ও অগ্রাহ্য করতে পারবে না। ও লিখেছে সেখানে ও বরং একাই যেতে চায়, ওর সঙ্গে আমাকে নিয়ে গিয়ে নিরর্থক বলি দিতে পারবে না।"

হৃদয়কে সে অন্ধকারের আশ্রয়ে রাখে; সেই অন্ধকারের আশ্বাস তার ভিতরে প্রবেশ করে তাকে একরকম শান্তি দান করে। শান্ত হয়ে যখন সে ভাবতে বসে সে বুঝতে পারে তার প্রেমিক অযোগ্য ছিল না, আর বুঝতে পারে তাদের ভালোবাসা ছিল সত্যিই পবিত্র। তার বুকের ভারটা যেন হালকা হয়ে আসে। মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। এটা সে আগে বুঝে উঠতে পারেনি কেন? তাদের অনুরাগকে সারাটা দিন ধরে সে কেবল

পাপের সঙ্গে জড়িয়েছে কেন ? জগতের কাছ থেকে লুকোবার তার কিছু নেই। একজন মানুষকে সে ভালোবেসেছে, সেই ভালোবাসাকে সে সর্ব্বায়ব-সম্পন্ন করেছে। তার প্রেমের সার্থকতা আরো গভীরভাবে ফুটে উঠেছে যেহেতু তার প্রেমিক তা জলাঞ্জলি দিয়েছে এক বিরাট মানবের হিতযজ্ঞে নিঃস্বার্থ নিষ্ঠায় ! কী মোহময় সমস্ত জিনিসটা !

রাত্রির কোমল অঙ্গে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখতে থাকে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে, তারা মনোযোগ দিয়ে শুনছে তার প্রেমের সেই বীরোচিত কাহিনী। সকলে তাকে অভিনন্দিত করে। তার বিপ্লবী প্রেমিকের শৌর্য, আত্মোৎসর্গ সকলে প্রশংসা করে ওঠে। আবার সে স্বপ্ন দেখে। ও ফিরে এসেছে, ওর বলিষ্ঠ বক্ষে বহু রক্তবর্ণ পদক ঝুলছে—তার শৌর্য-বীর্যের তারকা সব !

কিন্তু রাত্রি এগিয়ে চলে, দিন আসে তার উজ্জ্বল বাস্তবতাকে নিয়ে। বাইরের মানব-কণ্ঠে সে জেগে ওঠে, মনে পড়ে যায় স্বপ্নলেশহীন জগতের কথা। কাল রাত্রে সে যেটুকু আরাম পেয়েছিল তা মুহূর্ত্তে উবে যায়। প্রত্যেক মানুষের আকৃতির উপর তার যে অবিশ্বাস তা আবার ফিরে আসে। ঠিক আগের দিনের মতো আজও সে তার ঘরের শুচিতাটুকুকে দুর্ভাগার মতো আঁকড়ে পড়ে থাকে।

অবশ্য খবরের কাগজ পড়ে তার অন্যমনস্ক হবার উপায় আছে। কিন্তু শীর্ষনামের তলায় আছে শুধু রক্তশূন্য মানুষের নিরর্থক কাহিনী। তাছাড়া তার মনে হয় চৌকো-চৌকো চীনা অক্ষরগুলো যেন প্রত্যেকেই তার দিকে গম্ভীর মুখে তিরস্কারের চোখে তাকিয়ে আছে। সে একটা পুরোনো উপন্যাস তুলে নেয়। সে যা পড়ে তার অর্থ দাঁড়ায় এই "একটি ভাবপ্রবণ গর্দভ মেয়ে আর এক কঠিন-হৃদয় পুরুষ।" সে আর একটা তুলে নেয়, একটা আধুনিক উপন্যাস —কিন্তু এটা আগেরটার চেয়েও অর্থহীন।

বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে আবার বিছানায় গিয়ে শোয় ; স্থির করে আর কোনো বিষয়েই ভাববে না ; আকাশের দিকে সে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে থাকে, মেঘের নানা আকৃতি লক্ষ্য করে। তার মনে হয় একটা মেঘের চেহারা অনেকটা যেন তার মাসির মতো। আর একটা যেন ছুটন্ত ঘোড়া, ক্রমেই সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু ওটা একটা লম্বা আঁকাবাঁকা রেল-গাড়ির মতো নয় ? নিজেকেই নিজে সে বলে ওঠে—"হ্যাঁ, সত্যিই তো !" ছোটো ছোটো জানলাগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ; তা ছাড়া জানলায় একজন মানুষের মুখ।

একটি পাতার উপর জলবিন্দুর মতো সেই মুখ ক্রমেই বড় হতে থাকে, মনে হয় যেন কেবলই হুয়ান সিয়াও-চিয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। ঐ তো ও! কিন্তু যেই সে তার প্রেমিককে চিনতে পারে সঙ্গে সঙ্গে ওর মূর্তি শূন্যতার মধ্যে মিলিয়ে যায়।

ধীরে ধীরে তার চোখ মুদে আসে, চিন্তার স্রোতে আবার সে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। কে জানে হয়তো ও সত্যিই এখন ট্রেনে আছে, হয়তো আজই কোনো সময় এখানে এসে পৌঁছুবে। হুয়ান সিয়াও-চিয়ে যদি আজ বাইরে যায় হয়তো ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, আচমকা। অথবা এমনও হতে পারে ও এখন ঠিক সেই জায়গাটিতেই অপেক্ষা করছে যেখানে আগে ওরা পরস্পর মিলিত হতো। অথবা—সে পাশ ফেরে, তারপর বেরিয়ে চলে যায়। বাড়ির কেউ তাকে দেখতে পায়নি। সে ছুটে যায় হ্রদের তীরে, ছোট্ট পার্কটার ভিতরে যেখানটা গাছে আর ফুলে আড়াল করা। হ্রদটা যেন এক স্থির নিষ্কম্প আয়নার মতো, আর তার সামনে পাথরের প্রাচীরের উপর বসে একটি ছেলে। হুয়ান সিয়াও-চিয়ে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখে, উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠে—

"তুমি এসেছো তাহলে!"

"আমি এসেছি।"

"এবার তাহলে আর দেরি না করে আমরা বিয়ে করবো। আমার বন্ধুদের মধ্যে কথাটা আমি জানিয়ে দেবো। সকলে জানুক যে তুমি অবিশ্বাসী নও, তোমার ভালোবাসায় প্রতারণা ছিল না—"

"আমার ভালোবাসায় প্রতারণা ছিল না, কিন্তু আমি তোমার স্বামীও নই।"

"কিন্তু আমরা যে—"

"আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা? সত্যি তা, কিন্তু তোমার পক্ষে তা ভুলে যাওয়া ভালো। আমি তোমার স্বামী হতে পারবো না। এখনও তোমার বয়স কাঁচা, তুমি সুন্দরী, যে কোনো পুরুষকে তুমি সুখী করতে পারো, পরম সুখী করতে পারো। আমি যে-সুখ তোমায় দিতে পারি তার চেয়ে অনেক বড়ো সুখ হবে তা, আমরা একত্রে যা জেনেছি তার চেয়ে অনেক মহার্ঘ্য।"

তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হয় না। সে শুধু ওর মাথাটা নিজের বাহুতে মৃদুভাবে আঁকড়ে ধরে চোখের জল ফেলতে থাকে।

"তুমি হচ্ছ শান্ত আনন্দ-ভরা জীবনের জন্য। আমরা যদিও ভালোবেসেছি,

কিন্তু তোমার সত্যিকারের যে-সুখ তা হবে অপর কারুর সঙ্গে। মনে করো আমি যদি মারা যাই ?"

"কিন্তু এখনও পর্যন্ত তো তুমি মারা যাওনি।"

"তবে এখনি আমি মরবো।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে ও হ্রদের গভীর জলে ঝাঁপ দিল। আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে হুয়ান সিয়াও-চিয়ে ওর পিছনে লাফিয়ে পড়ে, সাঁতার কেটে অবশেষে গিয়ে ওকে ধরে…

প্রাণপণে বালিশ আঁকড়ে সে জেগে ওঠে। তার সাটিনের জামা ঘামে ভিজে গেছে। মৃদু বাতাসে তার কাঁপুনি লাগে।

ভয়ার্ত্ত হয়ে সে মাথা ঘুরিয়ে দেখে, কেউ শুনছিল কি না। না কেউ নেই, অথচ কে যেন চেঁচিয়ে বলছে—"আমি জানি! আমি জানি!" মুহূর্ত্তের জন্যে তার একটা তীব্র হতাশা জাগে ; তারপর একটু শান্ত হয়ে সে নিজেকে বোঝায় —"ওটা বৌদির গলা নয়, মুখরা শ্রীমতী চিন্-এর কণ্ঠও নয়, আর কারো—ঐ যে আবার শোনা যায়! 'হুয়ান সিয়াও-চিয়ে আরো স্বীকার করেছে—' হা ভগবান। কিছুই নয়, একটা উইচিংড়ের খ্যান্‌খেনে শব্দ বাতাসে ভেসে আসছিল।

সে ধীরে উঠে এসে জানালার ধারে বসে তার স্বপ্নের কথা ভাবতে থাকে। তার ভয় হয় এর গূঢ়ার্থ যেন অশুভ। অথচ ওর নিজেরই চিঠিতে যা লেখা আছে তা ছাড়া আর কিছুই সে বলেনি। এর মধ্যে প্রহেলিকা কিছু নেই। যাই হোক চিঠিতে ও যা যুক্তি দেখিয়েছে তাকে সে তুচ্ছ ঠাওরায়।

"জিনিসটা কি এতোই সহজ? আমি যা ছিলুম তা তো আর নেই। আমার মধ্যে একটা রীতিমত বদল এসেছে। আমি যে হয়ে গেছি টুকরো টুকরো ভাঙা শাদা জেড্ পাথরের মতো। এই ঘটনাটাকে উড়িয়ে দেওয়া কি সোজা? এ-সব কি সহজে ভোলা যায়? দেখা যাক……আমি এখনও আছি ঠিক আগেরই মতো, কোথাও ভাঙেনি, কোনো কলুষতাই লাগেনি। আমার হৃদয় যে জয় করবে তাকে আমি উপহার দেবো আমার নিষ্কলুষ দেহ, সমস্ত সুখ, অশেষ আনন্দ!

ধরতে গেলে কেন তা নয়? আমি হয়তো না ভুলতে পারি কিন্তু অপর কেউ এ-বিষয়ে জানবে কেন? ও শপথ করেছে আমাদের গোপন কথা জীবনের অবসান পর্য্যন্ত ও সঙ্গে নিয়ে যাবে। তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমিও আমার

হৃদয়ের মধ্যে তাকে বন্দী করে রাখতে পারি। আর কারু তো তা জানবার দরকার নেই।”

হুয়ান সিয়াও-চিয়ের চোখের সামনে জীবন আবার রঙীন হয়ে ওঠে, আর তার কল্পনা আশারু অট্টালিকা রচনা করে চলে। তার এই অভিজ্ঞতাকে সে নিশ্চিত সমাধি দেবে। আবার সে বাহু বিস্তৃত করে দেবে পৃথিবীর দিকে। সে তাই করবে—কিন্তু কি যন্ত্রণা, ঐ “ওদের” সম্বন্ধে, ঐ “তৃতীয় পুরুষ” সম্বন্ধে তো একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

“একেবারে নিশ্চিতরূপে নিঃসংশয় কি কখনো হওয়া যাবে?” এই প্রশ্ন সে নিজেকে নিজে করে। এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে তা হওয়া যায় না।

“ওরা” যে অনেক, বহু--বিদ্বেষপরায়ণ, মমতাহীন মানুষ, যাদের একরকম পেশাই হলো অপরেব ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি খুঁচিয়ে বার করা।

“ওরা” তার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়, একের পর আর এক।

সে দাঁত চেপে ধরে, দুহাতে মাথা ঝুলিয়ে বসে বার বার বলতে থাকে যে পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা নয়, এবং সেখানে বেঁচে থাকবার অধিকার এখনও তার আছে। তাকে ব্যাহত করবার অধিকার কারু নেই, তার সুখকে ধ্বংস করার মতো চতুরতাও কারু নেই।

কী ঘৃণার্হ ঐ “ওরা”! একটা মড়ক এসে যদি ওদের লোপ করে দেয় সে কী খুশিই হয়!

রাত্রে খাবার সময় তার বৌদি হঠাৎ বলে বসলেন, হুযান সিয়াও-চিয়ে তাঁর সঙ্গে সিনেমায় চলুক। একটা নতুন ছবি এসেছে—“মা চেন-হুযার ট্রাজেডি”।

হুয়ান সিয়াও-চিয়ে আসবে কি? তরুণী বৌদি-টি গল্পের চুম্বকটি অতি জীবন্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। তার প্রতিটি কথা হুয়ান সিয়াও-চিয়ের বুকে শেলের মতো গিয়ে বেঁধে। সে চুপিচুপি তাকিয়ে দেখে তাকে নিয়েই ঠাট্টা করা হচ্ছে কিনা, কিন্তু তরুণীটির মুখের ভাব অকপট, কাজেই সে নিশ্চিন্ত হয়। তার মাসতুতো ভাই-এর টিপ্পনীটি কিন্তু তার কম্পমান স্নায়ুর উপর গুরুভার সীসের মতো এসে পড়ে। তিনি বলেনঃ

“এ-গল্প সম্বন্ধে আমার মত হচ্ছে যে নাটকের মশলা হিসেবে এর কোনোই মূল্য নেই। মা চেন-হুয়ার যে-ট্রাজেডি তা প্রতিনিয়ত ঘটে; তার মধ্যে অসাধারণ কিছু নেই। যেহেতু কেউ জানতে পারে না, কাজেই তাতে কিছু

এসে যায় না। তফাৎটা হচ্ছে এই যে বাস্তব-জীবনে মেয়েরা কখনো আত্মহত্যা করে না।"

শুনতে-শুনতে হুয়ান সিয়াও-চিয়ের চোখ অন্ধকার হয়ে আসে, সে অসাড় হয়ে বসে থাকে তার চৌকিতে। তার মনে হয় যেন তার নাকের মধ্যে তুলো উড়ে-উড়ে পড়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলছে। ভাগ্যক্রমে তার মাসতুতো ভাই যখন টেবিলের চারদিকে চোখ ঘোরায়, তার দিকে ফিরেও তাকায় না। তা যদি তাকাত তাহলে ঐখানে বসেই হুয়ান সিয়াও-চিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ত।

"তুমি যখন যেতে চাইছো, আমি যাবো তোমার সঙ্গে।" একটা প্রচণ্ড আয়াস করে সে শিষ্টতা বজায় রেখে তার বৌদিকে এই কথাগুলো বললো।

টেবিলে সকলে চুপ করে থাকে। তারা সকলেই খুশি হয় যে হুয়ান সিয়াও-চিয়ে তার বিষণ্ণতা কাটিয়ে আবার জীবন্ত হয়ে উঠছে। তার মাসতুতো ভাই তার দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটু হাসে। বৌদিও একটু হাসল। হুয়ান সিয়াও-চিয়ে তার কপট অভিনয় সফল হয়েছে দেখে মনে মনে সন্তুষ্ট হয়। মোটের উপর সে জানে বাড়ির মধ্যে কেউ তাকে সন্দেহ করে না।

সিনেমায় তাদের অনেক চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়। হুয়ান সিয়াও-চিয়ে তাদের প্রত্যেকের মুখ অতি যত্নে পরীক্ষা করে দেখে। তাদের প্রত্যেককেই অতি সরল বলে মনে হয়। তার প্রতি নিষ্করুণভাবে কেউই তাকায় না। তাদের মন্তব্যের মধ্যে কোনো গূঢ় ইঙ্গিত তা-ও সে খুঁজে পায় না। নিজেকে-নিজে সে জানায় "সত্যিই আমি বিশ্বাস করি ওরা কেউই ও-বিষয়টা জানে না।" ছবির পর্দায় যখন সে প্রেমিক-প্রেমিকাকে দেখে, সে আগের চেয়েও আরও যেন উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সে তার প্রণয়ীর কথাগুলিতে গভীর বিশ্বাস আরোপ করে। ওর সঙ্গে তার যে দুবার ক্ষণিকের মিলন ঘটেছিল, তা যে কারু চোখে পড়ে থাকতে পারে এটাই সে ঘোরতর সন্দেহ করতে থাকে।

মা চেন-হুয়ার ব্যবহারের সঙ্গে তার নিজের ব্যবহারের কিন্তু খানিকটা অমিল ছিল। গত দু-সপ্তাহ সে বড়ো যেন আতঙ্কিত হয়ে কাটিয়েছে ; সে নিজেকে বড়ো স্পষ্ট করে তুলেছে ; ঔৎসুক্য এবং সন্দেহকে সে ডেকে এনেছে। এবার তার চেষ্টা করা উচিত তার এই ব্যবহারের একটা অজুহাত সকলকে জানানো। সে বলতে পারে গ্রীষ্মের আরম্ভে প্রতিবারেই তার একটু সর্দ্দিগর্মি হয়। তার মনে হতে থাকে সে যতটা কল্পনা করেছে ততটা ঘৃণা করবার

মতো বস্তু "ওরা" নয়। সে একটু বাড়িয়েই দেখেছে। তার জীবনধারায় এখনও আশা কিছু আছে, আর হয়তো দিগন্তরেখায় কিছু সুখের সংস্থানও তার জন্যে সঞ্চিত আছে যার আভাস সে এখনও পর্যন্ত পায়নি।

কিন্তু হলো এই, যে শেষ অবধি সত্যিই সে "সর্দ্দিগর্মি"তে ভুগতে থাকলো। অতি অল্পেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগলো, সারাদিনই সে চাইতো ঘুমুতে, ভিতরে-ভিতরে তার বড়ো অশান্তি। খিদে রয়েছে যথেষ্ট অথচ যেই এক গ্রাস খাবার সে মুখে তোলে সঙ্গে সঙ্গে তার খাবার আগ্রহ চলে যায়। এক সপ্তাহ পরে সে আর একটা জিনিস আবিষ্কার করলো। মাসের যে-সময় তার ঋতুমতী হবার কথা সে সময় কিছুই হলো না। "এমন ঘটনা কি বাস্তবিক ঘটে? এ কি সত্যি?" কিন্তু সত্যিই তো। মনের মধ্যে যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা রচিত হয়েছিল তা মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল, তার অন্তরে যে ক্ষীণ আশাটুকু সে সযত্নে রেখেছিল তা সেই ধুলোর মধ্যে লুটিয়ে পড়লো।

এর পর থেকে কি দিন কি রাত কারুরই কোনো অর্থ সে খুঁজে পেল না। তারা যেন নির্দ্দয় শিকারীর তাড়া খেয়ে ছুটে ছুটে পালাতে লাগলো। সে অনুভব করলে যে এক পা এক পা করে সে তার সমাধির দিকে এগিয়ে চলেছে। একাই চলেছে, কেউ তাকে বুঝছে না, কারুর কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেই, সহানুভূতি নেই। তার মরা মা-র জন্যে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে—যে কোনো মা হলেই যেন হয় তা সে যতই কঠিনা যতই সুশাসিকা হোক না। কিন্তু সে তার মা-র গলার স্বর পর্যন্ত মনে করতে পারে না। তার মনে হয় সংসারে যেন তার কোনো বন্ধুই নেই। তার মাসি লোক ভালো, অভিভাবিকা হিসেবে স্নেহপরায়ণ, কিন্তু অভিভাবিকা বই তো আর কিছু নন। তার মাসতুতো ভাই, সে-ও শুধু ভাই। সত্যি কথা তার বিয়ের আগে তারা দুজনে পরস্পরের খুব নিকটেই ছিল; কিন্তু বৌদি আসার পর থেকে তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ কথা খুব কমই হয়েছে।

রাত্রে জানলার ধারে বসে সে বিষণ্ণ চোখে তারার সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে আর তার মন ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তারায় ভরা আকাশের তলার যে পর্ব্বত-শ্রেণী দেখা যায় তাদের ওপারে। সেই ঝাপ্‌সা আলোয় সে আবার ওর মুখ দেখতে পায়, ওর গলার শব্দ শোনে। "অসম্ভব, সেই ক্ষণিকের মিলনের পর এমন যে হতে পারে এ বিশ্বাসই হয় না! আমি তোমায় বলেছি আমায় ভুলে যেতে, কিন্তু এখন যে তা অসম্ভব। তাহলে ও-ই হোক আমাদের ভালোবাসার

প্রতীক, এই আমার মিনতি!" এ হচ্ছে তার নিজেরই আত্মার প্রতিধ্বনি, আকাশের আর তারাদের সম্মতি নিয়ে ধ্বনিত!

সে সাহস সঞ্চয় করে। এই হচ্ছে বাঁচবার উপায়। তার গোপন কথা আর সে ঢেকে রাখবে না। সারা জগতকে সে জানাবে তার অটল বিশ্বাসের কথা। সে একলা দাঁড়াবে তার সন্তানকে নিয়ে পৃথিবীর সম্মুখে।

"এ তো পাগলামি। এই নির্দ্দয় মানবসমাজ তোমায় গ্রহণ করবে এ কী তুমি আশা করো? সত্যিই কি বিশ্বাস করো যে "ওরা" তোমায় ক্ষমা করবে? অবশ্য এমন যদি কেউ থাকতো যে তোমার সম্মানকে সমর্থন করবে তাহলে অন্য কথা। সমাজ চায় যে একজন 'পিতা' তোমায় দেখাতেই হবে, তা সে শুধু নামে-ও হোক। তুমি যদি বিচক্ষণ হও তো এমন একজনকে খুঁজে বার করো যে তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে।"

অবসন্ন হয়ে সে এই সব ভাবে। কোন্‌টা ভালো? চাঁদের কাছ থেকে তারাদের দিকে তার মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ায় এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায়। বড়ো ক্লান্তিকর। ব্যাপারটা এখন আর শুধু দুঃখময় নয়। সে যেমন হাসি ভুলে গেছে তেমনি চোখের জল ফেলতেও ভুলে গেছে। যেন তার অন্তরের মধ্যে আর কোনো অনুভূতির ক্ষমতাই নেই।

দিন দিন সে রোগা হতে থাকে। তার দুর্দ্দশার কথা গোপন রাখা ক্রমেই কঠিনতর হয়ে ওঠে। তার অসুখের কারণে চিন্তিত হয়ে তার বৃদ্ধা মাসি হুয়ান সিয়াও-চিয়ের শোবার ঘরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে আধ-ঘণ্টা কাটিয়ে যান। বারে-বারে তিনি বলতে থাকেন:

"হুয়ান তুমি বড়ো ভয়ানক রোগা হয়ে যাচ্ছ। যদি অসুস্থ মনে হয়, বলো আমায়, কী হয়েছে তোমার। ব্যাপারখানা কী? কী নিয়ে তুমি ভাবো? কিছুই কি তোমার খেতে ইচ্ছে করে না? এতো রোগা হচ্ছ! তোমার জন্যে আমি যদি কিছু এনে দিতে পারি, বলো আমায়, আমি তা তৈরি করিয়ে দেবো। কেউ তোমায় আঘাত দিয়েছে? তোমার বৌদি কিছু বলেনি তো? কোনো কড়া কথা? না কি আমাদের ঝি? সে কি তোমার কাজ ভালো করে করছে না? আমায় বিশ্বাস করে কি বলতে পারো না? আমার বোনের সংসারে একমাত্র তুমিই আমার আছো। তোমার যদি ভালোমন্দ কিছু হয় পরকালে বোনের কাছে আমি মুখ দেখাবো কী করে?"

বৃদ্ধার চোখ জলে ভরে আসে। হুয়ান সিয়াও-চিয়ে অনেক কষ্টে তার

নিজের চোখের জল রোধ করে, একটু জোর করে হেসে ঘাড় নাড়ে। আহা, যদি সে এখন চীৎকার করে বলতে পারতো—"তুমি আমায় ভালোবাসো মাসি কারণ তুমি তোমার কর্ত্তব্য থেকে নড়ো না। কিন্তু আমার যে পদস্খলন হয়েছে, তা শুনলে কি আর তুমি আমায় ভালোবাসবে? বাসবে কি?" কিন্তু সে শুধু তার চোখ দুটিকে বড়ো বড়ো করে মেলে ধরে তার মাসির বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—"আমার কোনো অনুযোগই নেই, সত্যি বলছি·········এ শুধু গরমের জন্যে, আমার মনে হয়। সত্যি আমার মনের কোনো দুঃখ নেই।"

সে জানতো যে তার প্রতি তার মাসির ভালোবাসা হচ্ছে তার মায়ের প্রতি তাঁর একটা দায়িত্ব থেকে উদ্ভূত; আর তার মাসতুতো ভাই-এর ভালোবাসা ঐ মাসির জন্যেই, আর তার বৌদি যে তাকে সহ্য করে ঐ সে মাসতুতো ভাই-এর জন্যে। প্রত্যেকে এক একটা আলাদা কারণে তাকে "ভালোবাসে"। কেউই শুধু তার নিজের জন্যে তাকে ভালোবাসে না। একজন মানুষ ছিল, যে চিনেছিল তার আত্মাকে, সে তাকে বর্জ্জন করেছে। ভাগ্য কি তার জন্যে নির্দ্দেশ করে রেখেছে, অস্বাভাবিক মৃত্যু? তাই যদি হয় তবে সে যে চায় সে-ও ওর সঙ্গে মরে। এমন যদি হয় যে আর একজন পুরুষ তাকে সত্যিই ভালোবাসবে, তাতেই বা কী এসে যায়? তবু তাকে মরতে হবে। তাকে ওর কাছে জানাতে হবে সেই ভয়ানক সত্যের কথা, আর মরতে হবে ওরই ক্রুদ্ধ আঘাতে।

তার বৌদিও এসে জিজ্ঞেস করেন তার এতো মন ভারের কারণটা কী? তিনিও তার রোগা হওয়ার বিষয়ে মন্তব্য করেন, দুঃশ্চিন্তাও প্রকাশ করেন। তিনি কি এমন কিছু বলেছেন বা করেছেন যাতে ও আহত হয়েছে? তা যদি করে থাকেন তো তিনি আন্তরিক দুঃখিত। তিনি আশা করেন যদি সত্যিই তিনি হুয়ান সিয়াও-চিয়েকে আঘাত দিয়ে থাকেন তাহলে সে তা কোনোরকম লৌকিকতার আবরণ না রেখে খোলাখুলিভাবে বলবে।

এই সবে সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ভিতরে ভিতরে তার আতঙ্ক জেগে ওঠে। সে বুঝতে পারে যে তার ব্যবহারে প্রত্যেকেরই অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়ে উঠেছে। তার স্থৈর্য্যের অভাব পরিবারের সকলের মনে সন্দেহ এনে ফেলেছে। চারিদিক থেকে লুকোনো চোখের হিংস্র দৃষ্টি তাকে ঘিরে ফেলে। এখন থেকে নিজের শোবার ঘরের নির্জ্জনতাও সে উপভোগ করতে পারে না। তার দরজার বাইরে সে অনবরত শব্দ শুনতে থাকে।

"কী অমানুষিক শব্দ! এই কি মৃত্যুর পদধ্বনি? কিন্তু এ-ভাবে তো মরা

যায় না। এখনও তার বয়স অল্প, সারাটা জীবন সামনে পড়ে রয়েছে, শুধু এক পাত্র মদ খাওয়ার জন্যে তো জীবনকে এমনভাবে নির্বাপিত করে দেওয়া যায় না!"

অথচ ঐ একমাত্র পরম আশ্রয়—এ ছাড়া তার আর কিই বা বাকি আছে?

সে ভাবে "মনে করা যাক নির্ভীকভাবে আমি একটা ঘোষণা করলুম; আর প্রত্যেক বিদ্রূপের উত্তরে দিলুম একটু অবজ্ঞার হাসি। কেন তা হবে না?"

কিন্তু যখনই এই পন্থা সে নেবে স্থির করলো তখনই বুঝলো যে তার সাহস নেই। আত্মবলিদানের জন্য প্রয়োজন এক মুহূর্ত্তের মতো প্রবলতম সাহস; কিন্তু আত্মগঞ্জনাব জন্য প্রয়োজন অটল বুকের জোর। এ তাব নেই। সে যদি আর একজন পুরুষকে খুঁজে বার করে যে তার বোঝার ভাগী হবে তাতে করে তাদের সম্বন্ধ কখনও এক দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিব উপর দাড়াবে না। তা ছাড়া অন্ধভাবে একটা বিয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া মানেই বিফলতাকে ডেকে আনা। আর তাব চেয়েও যেটা খারাপ হতে পারে, হয়তো সে সারাজীবনের মতো এক অসহনীয় মানুষেব সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে।

সে তার চেনা অন্য মেয়েদের কথা ভাবে যাদেব একাধিক নাগর ছিল। তারা এই রকম সঙ্কট থেকে কী করে উদ্ধার পেয়েছে? তারা কি সব সময় এমন পুরুষ বেছে নিয়েছে যারা বিবাহের প্রস্তাব করেছে অথবা যাদের উপর তারা বিবাহের দাবী করতে পারে? সে নিজে এর তুলনায় কত সরল শাদা! "এতো সাধু, এতো উদার, এতো বোকা……যে তার পক্ষে বাঁচা আর সাজে না।"

একটি ছোট্ট শাদা তারা স্থ পাও প্যাগোডার উপর শীতলভাবে মিটমিট করতে থাকে! আরো একটা রাত্রির আবরণ পৃথিবীকে নিস্তব্ধ করে দেয়। হুয়ান সিয়াও-চিয়ের মন অতি তৎপর হয়ে ওঠে, তার চিন্তা ছুটে চলে যেন তড়িৎশক্তিতে। তার তেইশ বছরের জীবনে উল্লেখযোগ্য যা কিছু ঘটেছে সমস্ত তার মনে পড়ে। তার মনে পড়ে যখন তার বয়েস সতেরো, সারা চীনের উপর দিয়ে নতুন মুক্তির জোয়ার বয়ে গিয়েছে; তাতে সে কতো উত্তেজিত হয়েছিল, সেই উজ্জ্বল আশার আলোয় কতো নেশাই তার ধরে গিয়েছিল।

যে-শুভ্র দীপ্তিতে তার আত্মা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তার কথা তার মনে পড়ে। সে যে তখন বাক্‌দত্তা ছিল না তাতে সে কতো খুশি হয়েছিল। মনে পড়ে কেমন করে সে জানিয়েছিল তার মাসিকে আর মাসতুতো ভাইকে যে সে চায় তার জীবনের সঙ্গীকে নিজেই খুঁজে নেবে।

পৃথিবী তার কাছে ঘে সে আসছে তার চারপাশের সব কিছুকে ভেঙে দিয়ে, নিঃশব্দে গুঁড়িয়ে দিয়ে।

কম্পিত হাতে সে একটা লম্বা রেশমের বন্ধনী তুলে নেয়, তার সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা অভিশম্পাত যেন ছিঁড়ে বার হয়! জুয়াচোর! ঠগ! মিথ্যাবাদী! সমস্ত প্রবঞ্চনা—স্বাধীনতা, মুক্তি, শিক্ষা! বাপ-মায়ে-দেওয়া বিয়ে মাথা পেতে নেওয়া এর চেয়ে অনেক ভালো! তাহলে, অন্ততপক্ষে এমনি ধারা দুঃখও তার হতো না, এমনধারা ভাগ্যও তার হতো না। আর কিছু না হোক সে তার বৌদির মতো সন্তুষ্ট থাকতে পারতো তার পরিতৃপ্ত স্বামীকে নিয়ে!

সে বিছানার ধারে এসে দাঁড়ায়, তার দেহ যন্ত্রণায় কাঁপতে থাকে। চোখ, মনে হয়, রক্তে ভরে উঠেছে। তার মন আর কোনোদিকে চলছে না শুধু দাবি করছে এর অবিলম্বিত পরিসমাপ্তি, দাবি করছে এমন কোনো কর্ম্ম যা একে বিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচাবে আর সকলের চোখে ফুটিয়ে দেবে "স্বাধীনতা, মুক্তি আর শিক্ষা"র মূঢ়তা। আর ইতস্ততঃ না করে যে-রেশমের বন্ধনীটা থামের সঙ্গে বেঁধেছিল তার অন্য মুখে সে দ্রুত একটা ফাঁস বেঁধে ফেলে। তারপর সে নিজেকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে শূন্যে ঝুলতে থাকে।

ঠিক সেই সময়টিকে তার লুপ্ত-চেতন মস্তিষ্কের এক অন্ধকার কোণ থেকে একটা অস্পষ্ট চিন্তা যেন আলো পাবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। "তবুও আর এক উপায় আছে" এই কথা যেন বলছে মনে হয় "যদি বুক ফুলিয়ে পৃথিবী-জোড়া যুদ্ধে যোগ দাও সমাজকে বদলে দেবার কাজে……যদি এগিয়ে চলো সামনে……যদি পা রেখে চলতে পারো উন্নতির পথে সমাজ যেদিকে দ্রুত এগিয়ে চ—"

কিন্তু বন্ধনী রজ্জু তার গলা চেপে ধরেছে, তার কল্পনা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে চুপ করে যায়।

জীবনে হতাশ্বাস এক বন্ধুকে লেখা

শ্যু চ্র-মো

(১৮৯৬—১৯৩১)

শ্যু চ্র-মো চেচিয়াং প্রদেশের হাইনিং-এ জন্মগ্রহণ কবেন। হু-চিযাং ও পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করে তিনি আমেরিকার কোলাম্বিয়া ও ইংলণ্ডের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুইবার এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফিরে পেইচিং, ছিং-হোয়া ও ফিং-মিন এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। চীনা আধুনিক কাব্যে তিনি নতুন সুব আনেন এবং তাঁর উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ ভ্রমনে যান। পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গভীর সখ্যে আবদ্ধ হন এবং ববীন্দ্রনাথ তাঁর ভারতীয় নামকরণ করেন সুসীমা।

তোমার চিঠি যেন মাটি-খুঁড়ে-পাওয়া গুপ্তধনের মতো—যেমন দুর্লভ তেমনিই আবার দুর্মূল্য।

তোমার চিঠি পড়া যেন পুরাকালের পাথরের ফলক পড়ার মতো—উপর থেকে মনে হয় অস্পষ্ট ঝাপসা, সব ঘষে-মুছে গেছে, কিন্তু ভিতরের কথা অতি গূঢ়, অতি গভীর!

তোমার চিঠি পড়া—যেন মনে হয় নীল নদের ধারে নিকষ কালো রাত, সোনার মিনারে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। স্বপ্নে দেখছি সোনালি রং-এর জোব্বা গায়ে এক সম্রাট দাঁড়িয়ে আমার সামনে। তিনি হেঁয়ালি করে কথা বলছেন। তিনি কী বলতে চান আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি; বলছেন—"আমি একটা অতি সুন্দর মমি, এ-ছাড়া আর কিছুই নই।"

মনে হয় পাহাড়ের নীচে এক খাদের পাশে যেন মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠছি। শুনছি পাইন বনের মাঝে রাত-ঈগলের চড়া স্বরে ডাক। বেচারাকে মানুষের কত দৌরাত্মই না সহ্য করতে হয়। নিশাচর দুধচুষি পাখির মতো মিঠে স্বরে ডাকবার ক্ষমতা ওর নেই। ওর ঐ চড়া স্বর হচ্ছে ওর বিদ্রূপ আর গালি। ও সব কিছুকে কি রকম যে ঘৃণা করে তা আমি জানি। ও ঘৃণা করে আলোকে, ঘৃণা করে ঐ ছট্‌ফটে পাহাড়ি চড়ুইদের, বরবাদ করে দেয় ঐ আপন আনন্দে আত্মভোলা ছাতারেদের।

আবার মনে হয় যেন ফু-তো পাহাড়ের* এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ছে। উপর থেকে যেন দেখছি একটা ঢালু পাথর, কিন্তু ভিতরটা সমুদ্রের জল খেয়ে-খেয়ে বহু দিন হলো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। পাথরের দ্বীপটা যেন মাটির বুদ্ধের মাথার মতো—যেন একটা খুলির খোলা—যতবার সমুদ্রের ঢেউ এগিয়ে এসে এই দ্বীপটাকে কোলে টানতে চায়, ততবারই পাথরটা অদ্ভুত আওয়াজ করে ওঠে—মনে হয়, যেন মনের কথা কইছে, মনে হয়, গাল পাড়ছে, মনে হয়, উপাসনা করছে, মনে হয় যেন "কাও-শুয়ে" প্রাসাদের প্রাচীন নাচ-ঘরের নক্সাকাটা কড়ি-বরগার ফাঁক আর পাথরের থাম ঘিরে-ঘিরে উঠছে "ছিনের" মোলায়েম ঝঙ্কার!—কেবল যদি তোমার একটু ধৈর্য্য আর একটু সাহস থাকে, কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতে পারো এই পাথরের বোঝা, মুছে ফেলতে পারো ঐ দেবতার চোখের মতো জমাট দৃষ্টি তাহলে আর বোধহয় তোমায় ভাবতে হবে না, আর বোধহয় বলতে হবে না যে মহাগোপন একটা কিছু তুমি আবিষ্কার করে ফেলেছো।

মনে হয়·········কিন্তু বন্ধু আমার উপমা তো অনেকগুলিই শুনলে, এবার বোধহয় আমার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনতে ইচ্ছা করো, আর চাও না বোধহয় কথার মার-প্যাঁচে চাপা, কল্পনার পালিশে ঢাকা কথাগুলো শুনতে। তবু আমাকে আর একটা বাক্যের জোড় লাগাতে হলোঃ শাদা রুপোর বাঁকা শিঙায় তোমার এই অদ্ভুত স্বর ফুঁকতে তুমি নিজেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো।

তুমি লিখেছো, "ঝড় আর ধুলো বড়ো বেশি ; জীবনের মধ্যে রস-কস কিছুই নেই।" এই কথাটা একটা দমকা ঠাণ্ডা বাতাসের মতো, মনে একটা দ্বিধার কাঁপন ধরিয়ে দিল—যেন এক রাশ হেমন্তের ঝরা পাতা আমার মনের উপর এক ফোঁটা সমবেদনার চোখের জল ফেলে গেল।

আমার নিজের জীবনের স্মৃতি আমার মনে আছে। আব সেই স্মৃতির মধ্যে মদিরার রঙ আর সুন্দরীর মনোহর হাসির চিহ্ন যে একেবারে নেই তা-ও নয়। তাই আমার মনে হয় তোমার ঐ ধূসর কথাটার ঘোর আমি কাটিয়ে উঠতে পারবো। এ-আত্মবিশ্বাস আমার আছে।

মনে পড়ছে কাল বিকেলে মাঠে পায়চারি করতে করতে পরিষ্কার দেখলুম দু-টুকরো নিষ্ঠুর কালো মেঘ এসে সূর্যের প্রখর আলো ঢেকে ফেললো, পাঁচ

---

* চেচিয়াং প্রদেশের সমুদ্রতট-সংলগ্ন চু সান দ্বীপপুঞ্জের এই পাহাড়ে খুব নাম-করা বৌদ্ধ-মন্দির ও মঠ আছে।

জোড়া ছোটো পাহাড়ি ভেড়া, খরগোসের মতো ধবধবে শাদা, মায়ের ডাকে এসে রাস্তার ধারে ঘাস খুঁজে খাচ্ছে। তিনটে ঘাসুড়ে ছেলে একটা ধানের গোলার সামনে এসে তাদের কাস্তেগুলো ফেলে দিল। এরা এতো স্বাভাবিক রকমের চঞ্চল যে আমি নিজেও অস্থির হয়ে উঠেছিলুম। আকাশ মেঘেব রক্তস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিলুম—"এই জীবনেও মজা আছে এ জানি।"

আজ আর সূর্যের দেখা নেই। স্তূপাকার মেঘ আকাশেব গায়ে থাকে-থাকে সাজানো রয়েছে। তোমার ঐ কথাটা মেঘের অন্ধকারে আবার একটু চাড়া দিয়ে উঠলো, আমাব কালকের বিশ্বাসটার উপর আবার টেনে আনলো খানিক সন্দেহ।

বন্ধু, আমার আরো আশ্চর্য লাগছে এই যে তোমার ঐ কথাটা যেন আমার মনের কাঁচের উপর একটা শাদা চূণকাম করে দিয়েছে। যেন কোনো যাদুকরের সাফাই হাতের মার আমার এই আধ-ময়লা মনের উপর এসে পড়েছে। আমি ব্যথায় প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলুম।

আমি আমার জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখছি, চারিদিকে থমথমে অন্ধকার, চাঁদের আলোও নেই, তারার আলোও নেই, সূর্যের আলোর কথা না হয় নাই ভাবলুম, সে তো অনেক আগেই চলে গেছে। ঐদিকে ঘন কালো বনের গাছের উপরে আমি জানি আছে রাত-ঈগলের বাসা, আরো জানি যে, গাছের নীচে ছোটো ছোটো ঘাস-ঢাকা জমিতে সাজানো আছে সারি সারি কবর—শক্ত মাটিতে নিমজ্জিত হিম-শীতল শাদা অস্থি। কোথাও একটু আলেয়া পর্যন্ত নেই এমনই নিস্তব্ধতা, এমনই বিষণ্ণতা—এ যে আঁধার রাতেরই পূর্ণ জয়।

চোখ বন্ধ করে আমি আমার মনকে প্রশ্ন করি—কিন্তু জীবনে নীরস প্রাণহীন তো কিছু খুঁজে পাই না। এই নীরসতা একটা ছায়ার মতো জীবনের পদচালনার পিছনে-পিছনে সদাই লেগে রয়েছে। যেন পেঁয়াজের কলি, সব সময় জীবন-রূপ পেঁয়াজের পিছনে জোড়া। ভারি আশ্চর্য এই ব্যাপারটা।

বন্ধু, আমায় মাপ করতে হলো—আমি তো তোমার কথার জবাব দিতে পারবো না। ইচ্ছে করে খুবই—কিন্তু তবু আমি তো পশ্চিমের ঝড়ো হাওয়া নই যে, বাতাসের বেগে আকাশ-ঘেরা মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবো। আমার হাতে তো চোখা কলম নেই, আছে কেবল একটা ভোঁতা কোদাল। তাতে করে যখন কোনো সুন্দর চিন্তা বা আশা মনে জাগে তাদের মাটি চাপা দিয়ে দিতে পারি—এ-কাজ অনেক করেছি নিজের হাতে—অভিজ্ঞতা আমার কিছু আছে।

তা ছাড়া বন্ধু, আমার মনে হয় যে শেষপর্যন্ত তোমার ছোঁয়াচই আমার লাগলো, কেননা তোমার ঐ কথাটা ভীষণ শক্তিতে আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করেছে, একটা বিষাক্ত বিছের মতো আমার হৃদয়ের উপর চেপে ধরেছে, চেপে ধরেছে একখণ্ড বিরাট পাথরের মতো। আমি কেবল ধৈর্য্য ধরে আছি, কেবল ধৈর্য্যই ধরে আছি·····

আমার আদর্শ পরিবার

লাও-শ

(১৮৯৭—)

শু ছিং-চুন-এর ছদ্মনাম লাও-শ। ১৮৯৭ সালে পেইচিং-এর এক মাঞ্চু-পরিবারে এঁর জন্ম হয়। যথারীতি পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করে ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এঁর অতি প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'লো-থো-সিযাং-ৎস' বহু ভাষায় 'রিক্সাওয়ালা' নাম নিয়ে অনুদিত হয়েছে। এঁর লেখা ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটকের সংখ্যা এত বৃহৎ যে আধুনিক চীনা গল্প-সাহিত্যের দিকপাল বল্লেও এঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হবে না। সম্প্রতি ইনি 'পেইচিং-ওয়েন-ই' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে কাজ করছেন।

বয়েস যখন বিশের কিছু বেশি হলো সেই বয়সের ছোকরারা প্রেম বিদ্রোহ আর আদর্শ আওড়াবে। এমনভাবে আওড়াবে যেন স্বর্গ-মর্ত্যে সে-ই হচ্ছে একমাত্র পুরুষ! পরিবারের কথা সে ভাবতেই পারে না। বিবাহ মানেই যখন প্রেমের সমাধি তখন বীরপুরুষদের পক্ষে পরিবার হচ্ছে একটা মস্ত বোঝা। ত্রিশ বছর পার হয়ে গেলে বিপ্লব হোক বা নাই হোক সে একই কথা, কিছুই এসে যায় না তাতে। কোনো কাজের ভালো-মন্দ নিয়ে সে আর মাথা ঘামায় না। সংসারের ঘোর-প্যাঁচ দেখে অভিজ্ঞতা তো কিছুটা হয়েছে, তাই কাজের বেলায় আস্ফালনটা একটু কমেছে। যদিও জানা আছে পরিবারের বন্ধনটি কী রকম, ঘোড়া বা গরুর জীবনেরই সামিল, কিন্তু তবু মানুষের জীবনে তো বরাবর এইটাই ঘটে আসছে, অল্পবিস্তর সবাইকে এই অভিজ্ঞতা নিদেনপক্ষে একবার সঞ্চয় করতেই হবে, আর চিরকুমার যখন না থাকলেও চলে তখন বিবাহ তো সহজ ব্যাপার, চিঠি ছাপিয়ে অতিথি-নিমন্ত্রণ, কিছুটা গতানুগতিক, সুখ-দুঃখ তো আছেই, কিছুটা মতামতের গরমিল, কম-সে-কম সবাই মিলে একটা মজা করা।

চল্লিশ বছরে পৌঁছবার পর ছেলেমেয়ে দু-তিনটি হয়েছে। গরীব হলেও চলবে, হাতে কিছু টাকা-পয়সা থাকলেও মন্দ নয়। সংসারে টানাটানির অভিজ্ঞতা কিছু হয়েছে, অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে যা ছোকরা-বন্ধুদের কাছে

বলাও যায় না। ভালোয় ভালোয় বিবাহ করা অথবা অল্প বয়সে ছেলেপুলে হওয়া ভালো, এ-ধরনের উপদেশ যেমন ওদের দিলেও ওরা শুনবে না। এই বয়সে পৌঁছবার পরও আদর্শ বলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে সেটি অবশ্যই আদর্শ পরিবার। ত্রিশ বছর কাটাবার পর সেই চিন্তার রেশটুকু অবধি মনে হয় মন থেকে উঠে গেছে। মানবজীবনের দ্বন্দ্ব আর মজাটাই হচ্ছে এইখানে। অল্প বয়সে আছে দুরন্ত শক্তি—সব কাজেই অসাধারণত্ব দেখাতে হবে, লাইন-পাতা রেলগাড়ির মতো চললে চলবে না ; আর মাঝ-বয়সে পৌঁছেই মনস্তাত্ত্বিক, শারীরতাত্ত্বিক ইত্যাদি নানা 'তাত্ত্বিকের' ঠেলায় রেলগাড়ি তো বটেই এমন কি মালগাড়িতে পরিণত হতে হয়। শুরুর সঙ্গে এখনকার তুলনা করলে দুটি আলাদা মানুষ বলে মনে হবে। কেউ কেউ হয়তো এর জন্যে দিনভর হায় হায় করবে, তবে সেটা নিয়মের ব্যতিক্রম, আসলে সেরকম বড় একটা চোখে পড়ে না।

সামনের বছর আমার বয়স হবে চল্লিশ। আদর্শ পরিবার কী তা তো খুঁটিয়ে বলেইছি ; বেশি ফুঁ দেওয়া কিছু নয়, নিজের বংশের কথা চেপে যাওয়াই মঙ্গল !

আমার আদর্শ পরিবারের জন্য সাতটা ছোটো ঘর চাই ; একটা হবে আমার বসবার ঘর, পুরাকালের ঘটি-বাটি, হস্তলিপি, ছবি এ-সবের বালাই থাকবে না, কেবল থাকবে গুটিকয়েক আরামদায়ক নরম চেয়ার, আর দু-একটা ছোটো টেবিল। একটা পড়ার ঘর, অনেক বই, প্রথম সংস্করণ বা প্রাচীন বই সবই থাকবে আর প্রত্যেকটি হবে আমার প্রিয় বই ! একটা পড়ার টেবিল, টেবিলের উপরটা চীনে-পালিশ-করা, যার উপর গরম চায়ের পাত্র রাখলে গোল শাদা দাগ পড়ে না। লেখাপড়ার সরঞ্জাম খুব একটা কিছু বাড়াবাড়ি নয়, কিন্তু সব কিছুই বেশ যেন কাজে লাগে। টেবিলের উপর-বরাবর যেন দু-একটা ফোটা ফুল থাকে, একটা ছোট্ট ফুলদানিতে গোঁজা। দুটি শোবার ঘর, তার মধ্যে একটা একলা আমার। ছারপোকা থাকবে না, থাকবে একটা বিরাট বড়, খুব নরম খাট। এই খাটের উপর আড়াআড়ি শোওয়া যাবে, আবার লম্বা হয়ে শোয়াও যাবে। যে-রকমভাবেই ঘুমোনো যাক্ না কেন, শুলেই বেশ আরাম পাওয়া যাবে, যেন তুলোর গাদার মধ্যে ডুবে যাওয়া গেলো, হাড়ে কোথাও যেন কঠিন কিছুর আঘাত না লাগে। আর একটা ঘর থাকবে অতিথির জন্য। এ-ছাড়া থাকবে একটা রান্নাঘর, একটা পায়খানা। চাকরদের ঘর বলে কিছু থাকবে না,

কেননা গোড়া থেকেই চাকরের পাট উঠিয়ে দেওয়া হবে। বাড়িতে টেলিফোন থাকবে না, রেডিও থাকবে না, মা চিয়াং[১] থাকবে না, পাখা থাকবে না, লোহার সিন্দুক থাকবে না। প্রথম-প্রথম হয়তো মনে হবে এটা-ওটা নেই, কিন্তু এ-কটা জিনিশ তো ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছি; যদি কেউ সেধে দিতে চায় তবুও নেবো না।

উঠোনটা হবে বেশ বড়। উঠোনের দেয়াল ঘেঁসে থাকবে কয়েকটা ছোটো ফলের গাছ। চাই এক-ফালি চৌকো লম্বাটে জমি, সেটা হবে সমান আর তাতে ঘাস থাকবে না। “চীনে-সূর্য-নমস্কার’[২] করার পক্ষে যথেষ্ট হলেই চলবে। এ-ছাড়া এদিকে-ওদিকে থাকবে নানা রকম ফুল পাতা। দামি গাছ, যত্ন নিতে হয় এমন কিছু থাকবে না, কেবল চাই অনেক চটকদার ফুল। বাড়িতে অন্ততঃ একটা রঙচঙে বেড়াল চাই, আর উঠোনে চাই অন্ততঃ দু-গামলা লাল মাছ। ছোটো গাছে টাঙানো থাকবে ছোট্ট বেতের টুকরি আর তার মধ্যে দু-তিনটে গঙ্গাফড়িং খুশিমতো ডেকে চলবে।

এইবার তাহলে মানুষদের কথা বলা দরকার। ঘর বেশি নেই, তার উপর চাকর-বাকর থাকবে না, অতএব মানুষ বেশি হলে চলবে না। স্ত্রী, একটি ছেলে, একটি মেয়ে, এই হলেই ঠিক খাপ খায়। কর্তা বাড়ির মেঝে আর কাঁচ পরিষ্কার করার ভার নেবেন, উঠোন ঝাঁট দেবেন, গাছপালা ঠিক রাখবেন, মাছের গামলার জল বদলাবেন, গঙ্গাফড়িংদের সবুজ শশা আর কয়েকটা কচি সয়াবীনের দানা খেতে দেবেন। তাছাড়া রাস্তায় ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলা, বই কেনা ইত্যাদি খুচরো কাজও করবেন। স্ত্রী রান্নাবান্না দেখবেন, মেয়ে হাতের কাছে সাহায্য করবে, বারো তের বছরের হলেই সব চেয়ে ভালো হয়, বেশি ছোটো নয় আবার বেশি বড়োও নয়, বরাবর এই বারো-তেরো বছরেরই থাকবে। ছেলেটি তিন বছরের হলেই সবচেয়ে ভালো হয়। কথা কইতে পারে, মোটা-সোটা, দুরন্ত। মা রান্নার কাজ ছাড়া একটু ছুঁচের কাজ করবেন, ছোটো ছেলেটাকে দেখবেন। বড় মাপের কাপড়-চোপড় সব বাইরে কাচা হবে, ছোটোখাটো কাপড় নিজেই জলকাচা করে নিতে হবে।

এতো কাজ থাকার দরুন থিয়েটার সিনেমা দেখার সময় বিশেষ থাকবে না। কিন্তু জন্মদিনের দিন সবাই মিলে সারাদিন বাইরে বেড়াতে যাওয়া হবে। বাড়ি

১। এক ধরনের চীনা পাশা খেলা। বাজী রেখে খেলা হয়, চীনা মহিলাদের খুবই প্রিয়।

২। থাই-চি-ছোয়ান : হাত-পা ছুঁড়ে এক ধরনের চীনা ব্যায়াম।

তদারকের জন্যে কোনো চেনাশোনা বুড়িকে বসিয়ে রেখে যাওয়া যাবে। জন্মদিন ইত্যাদির সময় লোক নিমন্ত্রণ করে ভদ্রতা করা একেবারেই চলবে না। আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ি-থেকে-পাওয়া শুভেচ্ছাপূর্ণ কার্ডগুলো তাল করে বাজে কাগজের টুকরিতে ফেলে দেওয়া হবে। কেবল যারা সত্যিকারের সাহায্যের উপযুক্ত তাদের কিছু টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। উৎসব-উপলক্ষে বা নতুন বছরের সময় প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হবে, তা ছাড়া এক প্যাকেট চীনে-তাস কিনে লোহা-বাদাম আর চীনে-বাদাম বাজী রেখে সবাই মিলে 'সো-হু'[১] খেলা চলবে।

পুরুষটির নির্দ্ধারিত কোনো জীবিকা থাকবে না, কেবল প্রত্যহ কিছু কবিতা আর গল্প লেখা হবে, যার এক হাজার শব্দ চল্লিশ বা পঞ্চাশ ইউয়ান[২] দামে বিক্রি হবে। মহিলাটিরও কোনো কাজ থাকবে না, বাড়ির কাজ ছাড়া কেবল বই পড়বেন। ছেলেমেয়ে মোটেই স্কুলে যাবে না, বাড়িতে মা-বাবাই ছবি আঁকা গান, নাচ—লাফ-ঝাঁপকেও এক ধরনের নাচ বলা যেতে পাবে—সাহিত্য, হাতের কাজ ইত্যাদি শিখিয়ে দেবেন। একটু বড় হলে হয়তো বা তারা ছবি এঁকে বা কিছু লিখে পেটের সংস্থান করে নিতে পারবে। কিন্তু এ হলো পবেব কথা—এখন সে-সব কথা না তোলাই ভালো।

এ-বাড়ির লোকেদের সাধারণ পরিষ্কার খাওয়া-দাওয়া আর সকাল থেকে সন্ধে অবধি কাজ করার ফলে স্বাস্থ্য বেশ ভালোই থাকবে। স্বাস্থ্য সকলের ভালো থাকার দরুন মাথাও থাকবে ঠাণ্ডা। মেজাজ দেখানো বাড়িতে কেউই পছন্দ করবে না। বেড়াল উপরে উঠলো কি না, বা লাল-মাছ আর খরগোসের কী হলো এই ধরনের উৎকণ্ঠা ছাড়া ফ্যাকাশে মুখে উৎকট ব্যাকুলতা কেউ প্রকাশ করবে না।

সবার চেহারা হবে বেশ ভদ্র, দেখলে মানুষের খারাপ না লাগে। পরিচ্ছদ খুব জমকালো কিছু নয়, সাধারণ টেঁকসই। যা পায়ে দেওয়া যায় না এই ধরনের বদ গন্ধওয়ালা শক্ত চামড়ার জুতো একেবারেই চাই না। পুরুষটির বেশ শক্ত শরীর হবে, তবে চেহারায় চিত্র-তারকার ভঙ্গিমা থাকবে না। মহিলাটি বেশ সুগঠিত রূপবতী হবেন, তবে সিঁদুর-ঠোঁট, কলে-পাকানো চুল, স্বর্গে-তোলা নাক, এইসব হলে চলবে না। ছেলেমেয়েরা জিভে জড়িয়ে কথা কইবে না—দুরন্ত হবে, কিন্তু জ্বালাতন করবে না।

---

[১] এক ধরনের চীনা তাসের 'পোকার' খেলা।

[২] চীনা টাকা।

এই পরিবারটি পেইচিং-এ থাকলেই সবচেয়ে ভালো হয়, তা না হলে ছুং তু না ছিং তাও-এ আর তা-ও যদি না হয় তবে নেহাৎ স্থ চৌ-এ। তবে আর যাই হোক চীন দেশের মধ্যে এদের থাকতেই হবে, কেননা চীন হচ্ছে সবচেয়ে সভ্য আর শান্তির দেশ ; আদর্শ পরিবারকে আদর্শ দেশের মধ্যেই প্রকাশ পেতে হবে।

সন্তান লাভের পর

লাও-শ

শিল্পী যে তার বিবাহ হওয়া উচিত শিল্পের সঙ্গে। অর্থাৎ সারাজীবন কৌমার্যব্রত অবলম্বন। হাতে কোনোও কাজ না থাকায় মাঝে মাঝে গল্প লিখেছি, আর যদিও এখনও পর্যন্ত নিজেকে সাহিত্যিক বলে বোধ করিনি তবু সংসার যে একটা বোঝা সেটা টের পেয়ে গেছি। তেল, নুন, আচার আর সিরকার হাঙ্গামার মধ্যে প্রতিবারেই মনে হয় সেই একলা মানুষটির কথা যার নিজের পেট ভরলেই জগতে শান্তি! কী চমৎকার, না?

সংসারের ঝামেলা বেশির ভাগই ছেলেপিলেদের নিয়ে। প্রথমে লেখা-পড়ার খরচের কথা। সে কথা না হয় নাই তুললুম, কেবল যদি দুষ্টুমি আর কান্নাকাটির কথাই বলি, সেটাই বুদ্ধি লোপ ঘটিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ছোটো মেয়ের বয়স তিন; আমি কখন ঘরে থাকবো না ও সেই তক্কে বসে থাকে, তারপর আমার লেখা খসড়ার উপর গোল্লা আর দাঁড়ি কেটে রেখে দেয়। আবার সেটাকে দেখিয়ে এমন মিষ্টি করে বলবে—'সিয়াও-চি লিখতে শিখেছে' যে রাগে নাড়ি ছেড়ে যাবার উপক্রম হয়। তবু তার কথায় সায় দিতেই হবে! যাক গে! হয় তো এই মাত্র মাথায় একটা চমৎকার ব্যঞ্জনা-ভরা শব্দ ঘুরঘুর করছে—এমনই শব্দ যে মনে হয় শেক্‌স্‌পীয়ারও লজ্জায় মারা পড়বে, অবশ্য যদি লিখে ফেলতে পারি। ঠিক এই সময় সিয়াও-চি আমার কনুই ধরে টানবে, নীচু গলায় বলবে—'পার্কে চলো, হনুমান দেখবে না?' যার ফলে এখনও অবধি আমার শেক্‌স্‌পীয়ার হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। সিয়াও-আড়-এর বয়স ঠিক এক। ছেলেটা এখন অবধি 'লিখতে' শেখেনি, হনুমান কথাটা এখনও জানে না, কিন্তু মিষ্টি করে চোখ মিটমিট করে হাঁ করে উপর নীচে চারটে খুঁদে খুঁদে দাঁত দেখায়। আমার হাতে যদি কাজ না থাকে তাহলে ওকে চোখ পিটপিট করতে বলি, দাঁত দেখাতে বলি আর ছোট্ট মোটকাটা প্রায়ই এদিক-ওদিক আঙুল দেখাতে থাকে। আমি যখন কলমটা হাতে তুলে

নিই ও তখন এইসব গুণপনা নিয়ে উপস্থিত হয়। কেবল চাঁদপানা মুখ আর মিটমিট চোখই নয় আবার 'হুকুম' হবে আমিও যেন ঠিক ঐরকম ভঙ্গি করি। এখন উপায় কী ?

এ তো তবু ভালো। দুপুরবেলা সিয়াও-চি কিছুতেই ঘুমোবে না, বিছানায় ঠেসে ধরলেও নয়। মুস্কিলে পড়তে হয়। এইভাবে যখন বেলা চারটে বেজে যাবে তখন ঘুমের জন্যে শুরু হবে ঘ্যান ঘ্যান। পাঁচটা বাজলে দেখা যাবে যে বহু পূর্বেই আমার মধ্যে মানুষের যে গন্ধটুকু ছিল তাও উবে গেছে। সবই অচল, এমন কি পার্কের হনুমান অবধি পচে উঠেছে, তাছাড়া হনুমানের এই পচা গন্ধের জন্যে নাকি আমিই দায়ী। ছোট্ট মোট্‌কাটাও যখন এই রকম ঘ্যান ঘ্যান করবে আর ঘুমোতে চাইবে না সেটাও ঘটবে প্রায় ঐ একই সময়ে যখন সিয়াও-চিও ঘুমোচ্ছে না। বিগড়োবে যখন, এই দুই খুদে ভূত একই সঙ্গে বিগড়োবে। আমি যদি চু কো-লিয়াং[১] হতুম তবে নিশ্চয়ই খুং-ছুং-চির গান ধরতুম! একেবারে নিরুপায়! আর হবি তো হ, ঠিক এই হাঁফধরা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দুটো জরুরি চিঠি এসে হাজির—লেখার পাণ্ডুলিপি এক্ষুনি চাই! এবার আমিও রাগে ফেটে পড়ি। তার একটু পরে স্ত্রী-ও উপদ্রব শুরু করলেন। একই বাড়ির ছোটো বড়ো চারজনে চারটি মত্ত ভূতে পরিণত হলো। হট্টগোলের চোটে মানুষ আঁৎকে উঠবে। চীৎকারের মধ্যে বড়োদের বিবাহচ্ছেদ হয়-হয়—বাচ্চারা কেবলই 'না না' বলে চলেছে। বিবাহবিচ্ছেদের তর্কাতর্কির মাঝে তাদের গোলমাল আর থামে না। একটানা সাতটা অবধি এই চলে। স্বর্গের দুই ছোট্ট দূত ততক্ষণে ঘুমের ঘোরে আর নড়তে পারে না, তালাক দেবার ঘোষণা এতক্ষণে পুরোপুরি ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এ তো তবু ভালো। ছোট্ট মোট্‌কাটার দাঁত উঠবে, সেই শুরু হলো আসল যন্ত্রণা। দিনের বেলাটা তো বেফায়দা গেলোই, আবার রাতের 'কেলাস' করতে হবে। একটু যদি ঝিমিয়েছি তো অমনি ছুঁচ ফুটে ওঠার মতো ভয়ার্ত চীৎকার—ছেলের নাকি দাঁত ঠেলছে—কারুর পক্ষে ঘুমোবার চেষ্টা করা বৃথা। যত দিনে মাড়ি কেটে ওর দাঁত উঁকি দিল ততদিনে বাড়ির সকলে রক্তচক্ষু ব্যাঘ্রে পরিণত হয়েছে।

---

[১] চীনদেশের প্রাচীনকালের এক মহা ধুরন্ধর সেনাপতি। ইনি একবার নিরুপায় হয়ে শহর থেকে সৈন্য সরিয়ে প্রতিপক্ষের অপেক্ষায় শহরের ফটকের উপর বসে 'ছিন্‌' বাদ্যযন্ত্রটি বাজাতে থাকেন। অপর পক্ষের সেনাধ্যক্ষ গুপ্ত-আক্রমণ হতে পারে সন্দেহে শহরে প্রবেশ না করেই চলে যান।

যাই হোক, এইটুকুতে বাড়িতে ভালোবাসার প্রসারে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি। মনে হয় মানবজীবনের চতুর খেলাটা এইখানেই! মনে পড়ছে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস্ যেন এক জায়গায় বলেছেন যে ওয়াইল্ড্‌কে যখন সেই কুৎসিত মামলায় বিচারক সওয়াল করছেন, তখন একবার শুরু করে ওয়াইল্ড্ বেশ সপ্রতিভভাবেই আলাপ উত্তর দিচ্ছেন, খুব রসিকতা করছেন। কিন্তু যেই প্রতিপক্ষ কয়েকজন পুরুষ-বারবিলাসীকে সাক্ষী দিতে ডাকলেন অমনি ওয়াইল্ড্-এর নাড়ি ছাডবার উপক্রম হলো, মামলায় না হেরে আর উপায় রইলো না। হ্যারিস মনে করেন যে ওয়াইল্ড্ বলতে পারতেন—'আমি একজন নাট্যকার; মানুষের জীবন খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে যেরকম মানুষই হোক না সবার সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা রাখতে হয়। এদের সঙ্গে যদি আমার যোগাযোগ না থাকে তো কোথা থেকে আমি নাটকের চরিত্র যোগাড় করবো?' কিন্তু ওয়াইল্ড্ নিজে শেষপর্যন্ত সেরকম কোনও যুক্তিখণ্ডনের কথা তোলেন নি। ব্যাস! মামলায় হেরে গেলেন।

ওয়াইল্ড্‌কে আপাতত একপাশে সরিয়ে রাখা যাক। শিল্পীদের বেশি করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে, হ্যারিসের এই অভিমত যদি বিশেষ করে কেবলমাত্র ওয়াইল্ড্-এর প্রতি আরোপিত না হয়ে সব শিল্পীর প্রতি হয় তবে বলতে হবে যে মতটি নিতান্ত খাঁটি। সংসার-যাত্রার বোঝাও একেবারে এই বকম। ছেলেপিলেদের কথাই ধরা যাক—এতক্ষণে কাজের কথায় আসা গেল—ওদের ভালোইবাসো বা অপছন্দই করো, যাই বলো না কেন, অভিজ্ঞতা হিশেবে ওরাও অত্যন্ত মূল্যবান।

বাচ্চা যখন হয়নি তখন মানুষের জগত হচ্ছে আমেরিকা আবিষ্কারের আগের অবস্থা। এই বাচ্চাই হচ্ছে কলম্বাস, মানুষকে নতুন মহাদেশে নিয়ে উপস্থিত করে। এই যে নতুন মহাদেশ, সেটা খুব কিছু একটা দূরের নয়—আমাদেরই চেনাশোনা রাস্তাঘাট আর বাড়ির মধ্যে রয়েছে। এই দেখো না কেন, বাচ্চা হবার আগে হাটবাজারে যাদের সঙ্গে ছিল আমার কাজ, তারা কারা? তারা ছিল চুল-ছাঁটাইয়ের দোকান, রেস্তোঁরা, বইএর দোকান, ডাক-ঘর ইত্যাদি। শিশু-হাসপাতাল, টফির দোকান, খেলনার দোকান এই সবের অর্থই তখন বোধগম্য হয়নি। এমন কি, ওষুধের দোকানে গাদাগাদা ছোটদের ওষুধ আর গুঁড়ো, খবরের কাগজে ছোটদের জন্যে পেটেণ্ট দাওয়াইএর বিজ্ঞাপন, বড়ো বড়ো দোকানে ছোট্ট ছোট্ট মোজা আর জুতো, এ-সবই বাড়াবাড়ি বেগার বলে

মনে হতো। স্বর্গের দূতটি যেদিন উড়ে এসে হাজির হলো, আমার চোখে কে যেন এক জোড়া আতশী কাঁচ জুড়ে দিলে। হাটবাজার ঠিক আগেরই মতো রইলো, শুধু আমার সঙ্গে সম্বন্ধওয়ালা জিনিশের সংখ্যা আমার অজান্তেই কয়েকগুণ বেড়ে গেল! দেখলুম শিশু-হাসপাতাল কেবলমাত্র ফটকের উপর সাইনবোর্ড ঝুলিয়েই ক্ষান্ত নয়, ভিতরে আবার ডাক্তার আছেন। শুধু ডাক্তার নন, বেশ গেরামভারি হাবভাব, ওঁকে চটানো একেবারেই চলবে না। তারপর ডাক্তারের দেওয়া সেই দৈব-মন্ত্রটি নিয়ে ওষুধের দোকানে গিয়ে দেখি, সত্যিই তো! ঐ সব ছোটোখাটো শিশি, ঘটি, এদেরও ব্যবহার আছে। কেবল যে শিশির ভিতরকার শাদা আঠার মতো, হলদে ময়দার মতো এবং আরো নানা রংএর ওষুধ আর ওষুধের বড়িই কিনতে হবে তাই নয়; তার উপর শিশি কেনো, ঘটি কেনো, গুঁড়ো কেনো, ওষুধের বাটি, দুধ মাপবার চোঙ, রবারের চুষিকাঠি, স্যানিটারি ন্যাপকিন, খেলনা, আরো কতো কি! বড়ো বড়ো দোকানের ঐ-সব ছোটো ছোটো কাপড়ের টুপি, ছোটো ছোটো আসবাবপত্রেরও এবার একটা মানে খুঁজে পাওয়া গেল। আগে মনে হতো, এ-সমস্তই হাবি-জাবি জিনিশ, কিন্তু এখন এসব না হলেই নয়। কোনো কোনো সময় আমি যে সামান্য জিনিশটা চাই, দোকানে সেটা না পাওয়া গেলে দোকানের প্রতি মনে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব জাগে—এতো বড়ো দোকানে এই জিনিশটা রাখে না? আস্তে আস্তে রাস্তার এক মোড় থেকে আর এক মোড়ে শুধু সোনার দোকান আর পুরোনো জিনিশের দোকান ছাড়া অন্য সব দোকানে আমার পদচিহ্ন পড়ে। মায় বন্ধকির দোকানটা পর্যন্ত জানা হয়ে যায়। দোকানদারদের সঙ্গেও ক্রমে আলাপ হলো, এমন কি তাদের সঙ্গে আড্ডা জমে উঠলো। বাচ্চাকে নিয়েই আলোচনা—বেশ চিত্তাকর্ষক। দোকানের ছোকরা থেকে শুরু করে ম্যানেজার অবধি কেবলমাত্র পাটার পিছনে দাঁড়িয়ে ব্যবসা করেই ক্ষান্ত নয়—বাড়িতে যে আমার বাচ্চা রয়েছে! কয়েকটা দোকান সাহস করে আমায় ধারে জিনিশ দিতে শুরু করলো। মনে হলো যে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র আমার ব্যক্তিত্ব বেশ উঁচু ধাপে উঠেছে। অপরে আমায় বিশ্বাস করতে শুরু করলো। তারপর হালখাতার সময় ভিড় করে বিল এসে উপস্থিত। এখন বুঝি, কোনোও উৎসব আর নতুন বছরের মুখে কেন মানুষের এতো ঘর্মস্রাব হয়।

বাচ্চা এসে পৃথিবীটাকে বড়ো করে দিলে। যে-সব জিনিশ লুকিয়ে ছিল সেগুলি চারিদিকে ফুটে উঠলো। বাচ্চা না থাকলে এইটি ঠিক বোঝা যাবে না।

অন্যের বাচ্চাকে মোটাসোটা পরিপাটি দেখে তোমার মনে হবে বাচ্চা মাত্রেই বুঝি এইরকম হয়। জন্মাবামাত্রই বুঝি মাথায় ছোটো টুপি, গায়ে ক্ষুদে কোট, অনেকটা মুরগির বাচ্চার মতো জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর যেন হলদে কাগজে মোড়া। নিজের ছেলে হবার পর বোঝা যায় যে ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। সারা জগতের বাণিজ্য যা কিছু যোগান দিতে পারে একটি শিশুর পক্ষে তার সবই গায়ে নেওয়া আর মাথায় পরা সম্ভব। বাড়ির সবাইকার মনে নানা-রকম হাস্যময় অভিজ্ঞতা চিরদিনের মতো জমা হয়ে ওঠে—শিশু সত্যিই যেন একটি ছোট্ট জীবন্ত দেবতা!

এই ছোট্ট জীবন্ত দেবশিশুটিকে পেলে তবেই ভিতরটা জমজমাট হয়ে ওঠে। মাঝে ভেবেছিলুম যে জানলার দেহলির উপর ফুলের চারা লাগাবার জায়গা করবো। গ্রীষ্মের সময় জানলা খুললে হাওয়ায় ফুলের আর পাতার হালকা গন্ধ ভেসে আসবে, ঘরের ভিতরটা বেশ সুরভিত হয়ে উঠবে। শীতকালে ফুলের উপর সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে ঘরের ভিতরটাকে রঙিন আর প্রাণবন্ত করে তুলবে। বাচ্চার জন্মের পরেই ঐ সব ফুলের টবগুলো অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানলার দেহলি শিশি-বোতলে ভর্তি হয়ে উঠলো, গোনাই যাবে না সঠিকভাবে যে কটা রয়েছে। লেখার ডেস্কের উপব মাঝে মাঝে ন্যাপকিন দেখা যেতে লাগলো, বইএর তাকের উপর দুধের বোতল। বেশ করে ঝাঁটপাট ঝাড়পোঁছের তাৎপর্য এতদিনে বুঝতে পারা গেল। মাঝে মাঝে একবার ঝটপট সাফ করে না দিলেই নয়, না হলে কেউ আবার এসে জিনিশপত্র পাচার করে ফেলতে পারে, সে ভয়ও আছে। গতবার ঝাঁট দিতে গিয়ে খাটের তলা থেকে দান্তের ‘ডিভাইন কমেডি’ খানা খুঁজে পেলুম। জানি না বেটা বইখানাকে ঐখানে গুঁজে রেখে কী খেলা খেলছিল।

খরচের অঙ্ক বেড়ে ওঠে, নানারকম প্রশ্ন এসে জোটে। যখন ছেলে হয়নি তখন একজন চাকরই যথেষ্ট ছিল, আর এখন খুব কম করে দুজনের অবশ্যই দরকার। আগে চাকরে যদি বেশি রোয়াব দেখাতো তবে কিছুদিন বিনা চাকরেই চলতো। রান্নার লোক নেই—বাইরে গিয়ে খাওয়া হোক। কেউ কারুর অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারতো না। বাচ্চা হবার পর এই ধরনের বীরত্ব-ব্যঞ্জক তৎপরতা ভুলে যেতে হলো। তিনদিন যদি ন্যাপকিন কাচবার লোক না এলো তো ঘরে আর মানুষ ঢুকতে পারে না। বাচ্চার জন্যে দুধের ব্যবস্থা, তার জন্যেও লোক না হলে চলে না। বাচ্চা হলেই স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা দুরূহ হয়ে

ওঠে, দুধের বোতল দিনে পাঁচ ছ-বার ফুটোতে হয়। চাকর না থাকলেও চলবে না, আবার থাকলেও হট্টগোল নিরুপায়।

যে-সব ব্যাপারে তুমি নিরুপায় সেইসব ব্যাপারেরও তক্ষুণি উপায় ঠাওরাতে হবে। কবে জাতীয় পরিষদে শিশুদের সব প্রশ্নের ধীরে ধীরে সমাধান হবে তার জন্যে তো বাচ্চা অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে না। এইবার তোমার অভিজ্ঞতার পরিমান বাডলো। মাঝরাতে যদি ওষুধ কিনতে চাও, ওষুধের দোকানের দরজায় সারারাত একটা ছোট্ট ফোকর খোলা থাকে, সেখানে তুমি টাকা দিয়ে ওষুধ নিয়ে যেতে পারো। আগে আমি এই ব্যাপারটার মানেই বুঝতুম না। বিলিতি ওষুধের দোকানেও দাম কমানো যায়—দোকানদাব কিছু বলবার আগেই আমি বলে উঠি—'এখনও পঁয়তাল্লিশ পয়সা ?' যেই এই 'এখনও' শব্দটি ব্যবহার করলুম অমনি আমার পাঁচ পয়সা বেঁচে গেল। তাছাড়া আমাকেও এখন একজন ঝানু দোকানদার বলা চলে। এই হচ্ছে আর এক ব্যাপার। আয়া চাই, তারও দোকান আছে, বন্ধকি টিকিটের সময় ফুরিয়েছে, আবার সুদ দিয়ে সময় বাডিয়ে নিতে পারো—এ-সমস্তও আমায় শিখতে হয়েছে। সূক্ষ্ম চিন্তার সময় একেবারেই নেই, বোধহয় বাচ্চা হবার পর থেকে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাবার জন্যে যতটা অভিজ্ঞতা দরকার তার বহুগুণ বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তো পাঠ্যপুস্তক থেকে টেনে বার করতে হয়, আর এখন আমি একেবারে সজীব একটা বই পড়ছি। এর শুরু যে কোথায় তা আমার অজানা।

এ-ছাড়া আমার নিজের শরীরেরও পরিবর্তন হয়েছে। বাচ্চাদের কথামতো এখন আমাকে স্বীকার করে নিতে হয়, আমি ঘোড়া গরু দুই-ই! তাদের মতো সাজতেও হয়। অবশ্য গরুর ভাণ করে গরু সেজে আমি গরুর মতই ধৈর্য্যবান হয়ে উঠেছি। ছোট্ট মোট্‌কাটা বুঝেছে যে 'আগে বাড়' কথাটা বেশ মজার. অতএব আমাকে ক্রমান্বয় ঘুরতে হবে, মাত্র একবার ঘুরলে মোটেই চলবে না। ওঁর যখন মত পরিবর্তন হবে তখন আমি 'রুখ্‌ যা' অবস্থায় থামতে পার্‌বো, তার আগে নয়। এইখানেই আমি মাতৃত্বের মহত্ব অনুভব করেছি—মনে হয়েছে যে স্ত্রীদের ধরে যারা ঠ্যাঙায় তাদের 'এক ধারসে' ধরে নরককুণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

মাঝ-হেমন্ত উৎসবের আগে এক ওঝা এসে উপস্থিত। চাল চায় না, টাকা চায় না, শুধু জানতে চায় বাড়িতে বাচ্চা আছে কি নেই ? ছোট্ট মোট্‌কাটাকে

দেখে ওঝা ভারি খুশি। বলে, চোদ্দ তারিখে ভোরবেলা বাচ্চার বাঁ কব্জিতে এক লাচ্ছি লাল সুতো বেঁধে দিতে হবে। একবাটি পরিষ্কার জল রাখতে হবে, তিনটে লম্বা ধূপকাঠি পোড়াতে হবে। এতে করে দুঃখ কষ্টের লাঘব হবে। আমাদের ডান-হাতি যে-বাড়ি সেই বাড়ির গিন্নি বাইরে এসে দেখছেন দেখে ওঝা তাঁকেও জিজ্ঞেস করে তাঁর বাড়িতে বাচ্চা আছে কি নেই? তিনি মনমরাভাবে মাথা নাড়েন। চোদ্দ তারিখে কিন্তু এই গিন্নিই মনে করিয়ে দেওয়ায় ছোট্ট মোট্‌কাটার বাঁ কব্জিতে একটা লাল সুতোর ফের বেঁধে দেওয়া হলো। বাচ্চা, ওঝা আর পাশের বাড়ির গিন্নির বশ্যতা স্বীকার করে নিল। ওর মোটাসোটা কব্জিতে লাল সুতো দেখে আমার মনে হলো যে একটা বিরাট বই লেখার কাজ শেষ করার চেয়েও এতে গৌরব বেশি। বাইরে রাস্তায় গিয়ে একজোড়া শশক ঠাকুরের[১] পুতুল কিনলুম। বোধ হলো যে, ঐ ওঝা, লাল সুতো, শশকঠাকুর, এ-সবেরই একটা মস্ত বড়ো অর্থ রয়েছে।

---

[১] ছোট ছেলেরা চাঁদের ভিতর যে-খরগোশটা দেখতে পায়।

বাঁদী-মা

রৌ শ্র

(১৮৯৬—১৯৩১)

চেচিয়াং প্রদেশে এক ছোট্ট শহরে রৌ শ্র-র জন্ম। রৌ শ্র তাঁর ছদ্মনাম, আসলে তাঁর নাম চাও ফি-ফু। স্থানীয় স্কুলেই তাঁর শিক্ষা। কলেজের পড়া শেষ করে তিনি অধ্যাপনার কাজ নেন। অল্প কিছুদিনের জন্যে তিনি চেচিয়াং প্রদেশে নিংহাই জেলার শিক্ষাবিভাগে কর্মচারীর কাজ নিয়েছিলেন। এই সময় তাঁর রচনার দিকে মন যায় এবং চরমপন্থী চিন্তায় তিনি গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হন। তাঁর প্রায় সব লেখাতেই এই চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ আছে।

তাঁর সকল লেখার মধ্যে, 'বাঁদী-মা'কেই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

'বামপন্থী লেখক সংঘ'-এর একজন কর্মঠ সভ্য হিশেবে কুয়োমিনতাং সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারী তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে।

স্বামী চামড়ার ব্যাপারী। তার মানে, গ্রামাঞ্চলে যতো শিকারী আছে তাদের কাছ থেকে গরুর আর বুনো জন্তুর চামড়া সংগ্রহ করে সে শহরে শহরে বেচে আসে। কখনো কখনো এর সঙ্গে একটু আধটু চাষবাসও করে। ক্ষেতে যখন রোয়ার কাজের ভিড়, সেই সময় চারা তুলে বসাতে চাষাদের সাহায্য করে। কেমন করে লাইন ধরে চারা পুঁততে হয় সে-কাজে সে একেবারে পোক্ত; তাই যখনই মাঠে পাঁচজন চারা রুইবার কাজে লাগে ওকে দেওয়া হয় সবার উপরে দাগাবার কাজে। কিন্তু ওর কপাল মন্দ, তাই বছরের পর বছর ওর দেনা বেড়েই চলে। বোধহয় এই দুঃখেই ওকে আফিম মদ আর জুয়ো ধরতে হয়েছিল। দেখতে দেখতে ও এমন উগ্রপ্রকৃতির খিট্‌খিটে মেজাজী লোক হয়ে ওঠে এবং দিনের পর দিন এমন গরিব হয়ে পড়ে যে লোকে ওকে অল্প ক'টা টাকাও ধার দিতে সাহস করে না।

দারিদ্র্যের পিছনে পিছনে এলো অসুখ, আর তার দেহ গেল শুকিয়ে হলদেটে মেরে। তার মুখ হয়ে গেল পিতলের ঘটির মতো, এমন কি চোখের কোণের শাদাটারও রং বদলে গেল। লোকে বল্ল, ওর নেবা হয়েছে আর পাড়ার ছেলেরা তাকে 'হলদে পেটা' বলে ডাকতে শুরু করলে। একদিন সে তার স্ত্রীকে বল্লে—

“আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়। এইভাবে যদি চলতে থাকি তাহলে ঘটি বাটি সবই যাবে। আমার মনে হয় তোমার দেহ দিয়ে এইবার আমাদের বাঁচবার চেষ্টা করাই ভালো। তুমি যদি এখন আমারই সঙ্গে ঘরে বসে থাকো আর উপোস করো তাহলে আর তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি ?”

ওর স্ত্রী মেটে উনুনটার পিছনে বসে তিন বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল। সে ধরা-গলায় একটু থেমে থেমে বলে “আমার দেহ দিয়ে ?”

জ্বরে দুর্বল-স্বরে স্বামী বলে ওঠে “হ্যাঁ তোমার দেহ দিয়ে। তোমাকে আমি ইতিমধ্যেই ভাড়া দিয়ে ফেলেছি—”

“সে কি ?” সে তো প্রায় অজ্ঞান হবার যোগাড়। মুহূর্তের জন্যে ঘরে একটা স্তব্ধতা আসে তারপর সে কথা বলতে থাকে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে।

“তিন দিন আগে ওয়াং এইখানে এসেছিল, জোঁকের মতো বসেছিল। বলে, তার টাকা দিতেই হবে। সে যখন চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। ‘সাতাশ বিঘের দীঘি’র কাছে এসে যখন পৌঁছলুম মনে হলো আর বেঁচে কী হবে ? একটা গাছের তলায় বসলুম। মনে হলো, এইবার এই গাছে চড়ে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো হয়। ভাবছিলুম তাই করি, কিন্তু সাহসে কুলোলো না। কানের কাছে সারাক্ষণ একটা প্যাঁচা ডাকছিল। তার ডাকে আমার অন্তর শীতল হয়ে এলো, আমি চলে এলুম। কিন্তু রাস্তায় স্ন্ মেয়েটার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করলে, এতো বেলায় বাইরে আমি কী করছি ? আমি তাকে সব খুলে বল্লুম, আমার জন্যে কোথাও থেকে কিছু যোগাড় করে দিতে, নয়তো ওর হাতে যে-সব মেয়ে আছে তাদের গয়না বা কাপড় কিছু ধার দিতে যা বন্ধক রেখে আমি কিছু টাকা তুলতে পারি। ওয়াং-এর নেকড়ের মতো সবুজ চোখ প্রতিদিন আমার বাড়ির দরজায় জ্বলজ্বল করছে এ আর আমি দেখতে পারি না। কিন্তু স্ন্ মেয়েটা আমার কথায় হেসে বল্ল।

‘এই যদি হয় তবে তোমার ঐ স্ত্রীটিকে পুষছো কেন, এদিকে নিজের চেহারা তো ঐ রকম হলদে মেরে রয়েছে।’

আমি ঘাড় নীচু করে মুখ বুজে রইলুম। ও বল্লে ‘ছেলেটাকে অবশ্যই তুমি হাত-ছাড়া করতে পারো না, কেননা ঐ তো একটি ছেলে। কিন্তু স্ত্রীকে…… ?’

আমি মনে মনে বলি—বলে কি ? নিশ্চয়ই আমার স্ত্রীকে বেচবার কথা

বলছে না? ও বলে চলে 'স্ত্রীটি যদিও তোমার ধর্মপত্নী, তবু তুমি যেমন গরিব তাতে আর উপায় কী? ওকে ঘরে রেখে কী হবে?' তারপর সে সোজাসুজি কথাটা পেড়ে বসে—

'একটি অবস্থাপন্ন লোক আছেন। তাঁর বয়েস যদিও পঞ্চাশ হলো কিন্তু কোনো ছেলেপিলে হয়নি। তাঁর ইচ্ছে একটি উপপত্নী গ্রহণ করেন কিন্তু গিন্নি তাতে রাজি নন। তিনি কেবল তাঁর স্বামীকে একজন পত্নী ইজারা নিতে অনুমতি দিয়েছেন তিন বছর কিংবা পাঁচ বছরের জন্যে। এখন আমার উপর ভার পড়েছে একটি উপযোগী স্ত্রীলোক খুঁজে দিতে। আমি খুঁজছি একজন বছর ত্রিশের কাছাকাছি, যার দু তিনটি ছেলে হয়ে গেছে। সৎ, পরিশ্রমী আর বড় স্ত্রীর অনুগতা হবে এই রকম। সম্প্রতি গিন্নি নিজেই আমাকে এ-বিষয়ে বলেছেন আর এ-ও বলেছেন যে ঠিক-ঠাক যদি মেলে তাহলে ওঁরা আশি থেকে একশো ডলার পর্যন্ত ক্রয়মূল্য দিতে পারেন। আমি আজ বহুদিন ধরে একটি পছন্দসই মেয়ে খুঁজছি কিন্তু এখনও অবধি কাউকে খুঁজে বার করতে পারিনি।'

তারপর সে বলে যে আমার সঙ্গে দেখা হতেই তার তোমার কথা মনে হয়েছে, আর তুমিই ঠিক এ-কাজ পারবে। তাইতে সে সোজাসুজি আমার মত চায়। খানিকটা কান্নাকাটি করে আমি শেষে সায় দিয়ে দিলুম।"

এই অবধি বলে তার ঘাড় ঝুঁকে পড়ে, গলার স্বর নীচু হতে হতে একেবারে থেমে যায়। তার স্ত্রী একটিও কথা বলে না। একেবারে হতভম্ব হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলতে শুরু করে:

"কাল সেই লোকটির বাড়িতে স্যুন্ মেয়েটা গিয়েছিল। সে বলে যে কর্তা এ-বিষয়ে খুবই উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং গিন্নিও খুশি হয়েছেন। দাম স্থির হয়েছে একশো ডলার, ইজারা হয়েছে তিন বছরের যদি তার মধ্যে ছেলে হয়; যদি না হয় তো পাঁচ বছর। স্যুন্ মেয়ে দিনও স্থির করে এসেছে, এ-মাসের আঠারোই, আর পাঁচ দিন পরে। আজকে ইজারার সর্ত পাঠিয়ে দেবে।"

স্ত্রীর দেহের প্রতি অঙ্গ তখন কাঁপছে। সে অস্ফুটভাবে বলে ফেলে "তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?"

"কাল তোমার সামনে আমি তিন তিনবার পাক খেয়ে গেছি কিন্তু মুখ দিয়ে কিছুতেই কথাটা বেরলো না। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে ব্যবহার করা ছাড়া আর আমাদের কোনও উপায় নেই।"

তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, সে জিজ্ঞেস করে "তুমি তাহলে একেবারে ঠিক করে ফেলেছ ?"

"কেবল সর্তটা লেখার যা অপেক্ষা।"

"ছি ছি, কী ঘেন্নার কথা! ওগো আমার 'বসন্তের ধন'-এর বাপ, আর কি কোনো উপায়ই নেই ?" ঐ হলো ওর কোলের ছেলের নাম।

"ঘেন্না! হ্যাঁ, সে আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু আমরা হলুম গরিব, আর আমরা মরতে তো চাই না। এ-ছাড়া আর কী করতে পারি ? আমি বেশ জানি এই শরীর নিয়ে এ-বছর মাঠের কাজ আমি করতে পারবো না।"

"তুমি 'বসন্তের ধন'এর কথা কী ভেবেছো ? ও তো মোটে তিন বছরটির। মাকে ছাড়া ওর কী করে চলবে ?"

"আমিই তো ওর যত্ন নিতে পারি। আর তা ছাড়া ওর মাই-দুধ ছাড়ার সময়ও তো হয়ে এলো।"

একটু একটু করে ও যেন রেগে ওঠে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

স্ত্রী তখনও বসে। তার স্মৃতির পর্দা আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। একটি খুকি জন্ম নিয়েছে সবেমাত্র। নিজে সে বিছানায় পড়ে আছে মড়ার মতো। না, ঠিক মড়ার মতো নয়, কারণ মড়া তো আস্ত দেহটা নিয়ে মরে; আর তার শরীরটাই হয়ে আছে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। মেঝেতে পাতা শুকনো একগাদা ঘাস তার উপর শুয়ে নতুন-হওয়া বাচ্ছাটা হাত পা ছুঁড়ছে আর ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাচ্ছে। নাড়িটা তখনও তার চারিদিকে জড়ানো। বাচ্ছাটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করলো ওঠবার। কিন্তু শুধু মাথাটুকু ছাড়া আর কিছুই উঠলো না, শরীরটা যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইলো বিছানায় অসাড়। সেই সময় সে তার স্বামীর নৃশংস মূর্তি দেখেছে। জলন্ত লাল মুখ, হাতে এক গামলা ফুটন্ত জল নিয়ে সে বাচ্ছাটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। অতি কষ্টে সে একবার চেঁচিয়ে বলেছিল 'দাঁড়াও', দাঁড়াও, কিন্তু ঐ পশুর তরফ থেকে এ নিয়ে আলোচনার কোনো ইঙ্গিতও ছিল না। সে জবাবই দেয়নি। ভেড়ার বাচ্চাকে কসাই যেমন করে নেয় তেমনি করে সেই নতুন-আসা জীবনটাকে সে তার কর্কশ হাতে তুলে ধরে, তখনও সেটা ট্যাঁ ট্যাঁ করছিল, ঝুপ করে গরম জলে চুবিয়ে দিয়েছিল। সে আর কিছুই শুনতে পায়নি; কেবল

একটা ঝপ্ করে শব্দ আর ফুটন্ত জলের শোঁ শোঁ আওয়াজ। ছোট্ট খুকিটা কোনো শব্দ করেনি। এখন সে ভেবে অবাক হয়ে যায় যে, আচ্ছা, বাচ্চাটা খুব জোরে একবার চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠেনি কেন? এই অপমৃত্যুকে এমন নিঃশব্দে সে বরণ করেছিল কেন? ও হ্যাঁ, এখন মনে পড়ে, কেন সে কিছুই শুনতে পায়নি—সে যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল—তার হৃদপিণ্ডটাকে ছিঁড়ে বার করে নিলে সে যেমন করে অজ্ঞান হয়ে পড়ত ঠিক তেমনি ভাবে।

এই ঘটনার কথা যখন তার মনে উদয় হয় তখন মনে হয় যেন তার সমস্ত কান্না শুকিয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবে "হায়রে ভাগ্য বড়ো ক্রুর।"

'বসন্তের ধন' মাই ছেড়ে ওর মুখের দিকে তাকায়—"মা, মা"।

চলে যাবার আগেরদিন সন্ধেবেলা বাড়ির সবচেয়ে অন্ধকার কোণটি বেছে সে বসেছিল। উনুনের সামনে তেলের কুপিটার থেকে জোনাকির আলোর মতো একটা শিখা মিটমিট করছে। 'বসন্তের ধন'কে কোলে নিয়ে নিজের মাথাটাকে ছেলের চুলের উপর এলিয়ে দিয়েছিল। তার চিন্তা এখন ভাসতে ভাসতে চলে গেছে অনেক দূরে; সে যে কতদূর তা সে নিজেই বলতে পারে না। ক্রমশঃ সেই ভাবনার সূত্রগুলো গুটিয়ে গুটিয়ে বর্তমানের মধ্যে তার প্রত্যক্ষ সন্তানের উপর এসে পড়ে। খাটো গলায় সে তাকে ডাকে ঃ

"বসন্তের ধন, বাবা আমার!"

মাই টানতে টানতে সে জবাব দেয়—"কী মা।"

"মা কাল চলে যাবে… …"

ছেলেটা শুধু বলে "হুঁ।" ব্যাপারটা সে স্পষ্ট বোঝে না তবু কী যেন বুঝে নিজের মাথাটা মার মাথায় ঘসতে থাকে।

"মা ফিরে আসবে না। তিন বছর মা আর ফিরবে না।" বলে সে চোখ মোছে।

মাই থেকে মুখ ছেড়ে ছেলে বলে "মা কোথায় যাচ্ছে? মন্দিরে?"

"না, মা যাচ্ছে এখান থেকে দশ মাইল পথ, লি-দের বাড়িতে।"

"আমিও যাবো।"

"মাণিক, একলা কোথায় যাবে?

আবার দুধ খেতে খেতে সে বিদ্রোহীর কণ্ঠে বলে ওঠে "উঁ।"

"তুমি বাড়িতে বাবার কাছে থাকবে। বাবা আমার মাণিককে দেখবেন।

বাবা মাণিকের সঙ্গে ঘুমোবেন, মাণিককে খেলতে নিয়ে যাবেন। বাবা যা বলবেন মাণিক তাই করবে। ব্যাস্। তারপর তিন বছর হয়ে গেলে……”

কাঁদো কাঁদো-স্বরে ছেলে বলে “বাবা আমাকে মারবে।”

ছেলেটার ডান্ গালে একটা কাটার দাগ, তারই উপর হাত বোলাতে বোলাতে মা বলে “বাবা আর তোমাকে মারবে না।” ‘বসন্তের ধন’এর কচি বোনকে খুন করবার তিন দিন পরেই কোদালের বাঁট দিয়ে বাপ তাকে মেরেছিল, তার-ই দাগ।

ছেলেকে তার আরও কী-যেন বলবার ছিল। কিন্তু ঠিক তখনই দরজা ঠেলে তার স্বামী ঢুকলো। তার দিকে এগিয়ে এসে একটা হাত পকেটে ঢুকিয়ে বলে “পাওনার থেকে সত্তর ডলার এরি মধ্যে পেয়ে গেছি। বাকি ত্রিশটা পাবো তুমি ওখানে পৌছবার দশদিন পরে।”

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

“ওরা তোমাকে নিতে পাল্কী পাঠাবে।”

আবার চুপচাপ।

“পাল্কী বেহারারা সকালের খাওয়ার পরই আসবে।”

এই বলে সে আবার দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

সেদিন রাত্রে স্বামী-স্ত্রী কেউই কিছু খেলে না।

*　　　*　　　*

পরদিন সকালে বসন্তের বৃষ্টি ঝিরঝির করে পড়ছে। পাল্কী ভোরেই এসে পৌচেছে। সারারাত সে ঘুমোয় নি। প্রথমে সে ‘বসন্তের ধন’এর যতো ছেঁড়া কাপড় সমস্ত সেলাই করেছে। বসন্তকাল ফুরিয়ে গিয়ে এখন গ্রীষ্ম আসন্ন। তবুও ছেলে শীতকালে যে-তুলো-ভরা ছেঁড়া মেরজাইটা পরত সেটা অবধি সে বার করে, এবং সব জিনিশ জড়ো করে বাপের হাতে তুলে দেবার জন্যে নিয়ে যায়। বাপ তখন বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তারপর সে স্বামীর পাশে বসে দুটো কথা বলবার চেষ্টা করে। কিন্তু দীর্ঘ রাত্রি একটানাভাবে আস্তে আস্তে কেটে যেতে থাকে, তার একটি কথাও বলা হয় না। মধ্যে দু একবার সে সাহসে বুক বেঁধে স্বামীকে ডাকবার জন্যে প্রস্তুত হয়, কিন্তু তার মুখ দিয়ে পরিষ্কার কোনো কথা বার হয় না। তা ছাড়াঁ, কিছু শোনাও যায় না। অবশেষে সে চুপ করে শুয়ে পড়ে।

সবেমাত্র যখন তার একটু ঝিমুনি এসেছে ঠিক সেই সময় ‘বসন্তের ধন’ জেগে

ওঠে। মাকে ধরে টানে এবং উঠতে চায়। ছেলেকে কাপড় পরাতে পরাতে মা বলে "বাড়িতে সোনা আমার লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, কেমন? কান্নাকাটি করবে না, তাহলে বাবাও মারবে না। মা তোমার জন্যে অনেক মিষ্টি কিনে দেবে। কেঁদো না মাণিক, কেমন?"

ছেলেটা হাঁ করে গান ধরে, তার মুখে দুঃখের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই।

ঠোঁটের পাশে চুমু দিয়ে মা বলে "গান গেয়ো না, বাবার ঘুম ভেঙে যাবে।"

পাল্কী-বেহারারা দরজার ধারে একটা তক্তায় বসে হুঁকো টানে আর খোশগল্প করে চলে। একটু পরেই পাশের গ্রাম থেকে স্ন্ মেয়েটা এসে উপস্থিত হয়। বুড়ি পাকা ঝুনো। ঘটকীর কাজ করে দেখেছে শুনেছে অনেক। ভিতরে ঢুকে চাদর থেকে বৃষ্টির জল ঝেড়ে সে বলে:

"বৃষ্টি পড়ছে! তার মানে এর পর থেকে তোমাদের ঘরের শ্রীবৃদ্ধি হবে।" ঘরের এদিক-ওদিক দুএকবার ব্যবসাদারি চালে টহল দিয়ে ছেলের বাপকে দু একটা কথা বলে, সহজ ভাষায় যার মানে দাঁড়ায় যে ওকে কিছু দালালি দিলে ও খুশি হয়। কারণ ওর চেষ্টাতেই তো এতো সহজে এবং এমন লাভজনক-ভাবে ইজারার বন্দোবস্তটা হলো।

"খোলাখুলিভাবে বলি তবে 'বসন্তের ধন'এর বাপ, আয় পঞ্চাশ ডলার দিলে পরে তো লোকটা একটা উপপত্নীই কিনতে পারতো।"

তার পর সে তাড়া দিতে থাকে। মা কিন্তু 'বসন্তের ধন'কে কোলে নিয়ে নির্জীবের মতো বসেই থাকে। বুড়ি চড়া গলায় চেঁচিয়ে ওঠে:

"পাল্কী-বেহারারা তাদের আস্তানায় সন্ধেবেলায় ফিরে গিয়ে তবে খাবে। তুমি যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নাও।"

মা বুড়ির দিকে এমন ভাবে তাকায় মনে হয় যেন বলছে:

"সত্যি আমি যেতে চাই না। তার চেয়ে বরং না খেয়ে শুকিয়ে এইখানেই থাকি।"

ঘটকী ওর মনের কথা বুঝতে পারে। এগিয়ে গিয়ে একমুখ হেসে বলে:

"ওরে আমার বোকা মেয়ে। এই হলদে-পেটো তোকে আর কী-ই বা দেবে? যে-পরিবারে যাচ্ছিস তাদের যে খেয়ে ফেলে ছড়িয়েও যথেষ্ট থাকে। দশ বিঘে জমি, অগাধ টাকা, নিজেদের বসত-বাড়ি, চাকর-বাকর, গরু বাছুর এ-সব কতো! গিন্নীটি ভালোমানুষ, বড়ো ভদ্র ব্যবহার। কারুর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি কিছু মিষ্টি উপহার দেওয়া চাই। আর কর্তাবুড়ো—বুড়ো বল্লে অবশ্য

ভুলই বলা হলো মুখটা শাদা, দাড়ি একেবারেই নেই। লেখাপড়া করে করে কাঁধ দুটো ঝুঁকে পড়েছে কেমন মোলায়েমভাবে। তবে আমি আর বলে কি করব। পাল্কী থেকে নামলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে ঘটকালিতে আমি কখনো মিথ্যে বলি না।"

সে আস্তে আস্তে চোখ মুছে ফেলে তারপর মৃদুভাবে বলে "বসন্তের ধনকে এমনি ভাবে কী করে আমি ছেড়ে যাই।"

তার কাঁধে হাত রেখে মা আর ছেলের মুখের কাছে মুখ এনে বুড়ি বলে ওর জন্যে ভেবো না। ওর তো তিন বছর বয়েস হলো। শাস্ত্রে আছে 'তিন চারে দেবে পা; ছেলে ছাড়বে আপন মা।' ওর তো তোমাকে ছাড়বার বয়েস হয়ে গেছে। ওখানে থাকতে একটু চেষ্টা করে পেটে দু-একটা ছেলে যদি ধরতে পারো তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

পাল্কী-বেহারারা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তারা অনুযোগ করে "এ-তো আর কচি কনেটি নয়, তবে এতো কাঁদবার কি আছে?"

বুড়ি 'বসন্তের ধন'-কে ওর কোল থেকে কেড়ে নেয়। বলে "আমি একে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।"

ছেলেটা কেঁদে হাত-পা ছোঁড়ে কিন্তু শেষটা তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। পাল্কীকে চড়তে চড়তে মা বলে—

"ওকে ঘরের ভিতর নিয়ে এসো। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।"

স্বামী মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। নড়েও না, কোনো কথাও বলে না।

* * *

দুটো গ্রামের মধ্যে তফাৎ দশ মাইল; দু খেপেই পাল্কী পৌছে যায়। বসন্তের ঝিরঝিরে বৃষ্টি হাওয়ার ধাক্কায় পাল্কীর কাপড়ের পরদা ফুঁড়ে ওর গায়ের কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে। চুয়ান্ন কি পঞ্চান্ন বছরের একটি মোটা সোটা ধূর্ত-চোখ মহিলা ওকে অভ্যর্থনা করে নিলেন। "ইনিই নিশ্চয় বাড়ির গিন্নি"—মনে মনে এই কথা বলে সে আড়চোখে একবার তাঁর দিকে তাকায়। তিনি ওকে যত্ন করে সিঁড়ির দিকে নিয়ে যান। একজন লম্বা রোগা মানুষ, পাতলা গোল-মতো মুখ, বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। নবাগতাকে বেশ খুঁটিয়ে দেখে একগাল হেসে বল্লেন—

"বেশ তাড়াতাড়িই তো এসে পৌচেছে। কাপড়-চোপড় ভিজে গেছে নাকি?"

মহিলাটি ভদ্রলোকের উপস্থিতিকে একেবারে লক্ষ্যই করলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—

“পাল্কীতে তোমার কিছু জিনিশ আছে ?”

“না, কিছুই নেই।”

প্রতিবাসী মেয়েরা দরজার বাইরে জড়ো হয়েছিল। এরা তিনজনে যখন বাড়িতে ঢুকছে সবাই উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলো।

কেন যে তার পুরোনো বাড়ির কথা কেবল মনে পড়ে আর ‘বসন্তের ধন’কে ভুলতে পারছে না তা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। জীবনের যে-নতুন তিনটে বছর তার শুরু হচ্ছে তার জন্যে যে ওর খুশি হয়ে ওঠা উচিত এ তো অতি সুস্পষ্ট। এ-বাড়িটা এবং এই স্বামী যে তাকে ইজারা নিয়েছে, দুই-ই তার পুরোনো বাড়ি আর পুরোনো স্বামীর চেয়ে অনেক ভালো। এই ভদ্রলোকটি নিঃসন্দেহে বেশ ভালো সহৃদয় মানুষ, ধীরভাবে কথা বলেন, এমন কি গিন্নিটির এই মধুরতা, যত্ন এবং প্রগল্‌ভতাও অপ্রত্যাশিত। তিনি তাঁর বিবাহ-জীবনের সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। যেদিন তাঁদের সুন্দর আনন্দময় বিবাহিত জীবন শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ত্রিশ বছরের ঘটনা। বছর পনের-ষোল আগে তাঁর একটি সন্তান হয়েছিল। ছেলেটা নাকি ভারি সুন্দর এবং ওঁর মতে ভারি চালাক। কিন্তু দশ মাস বয়েস হবার আগেই বেচারা বসন্ত রোগে মারা যায়। এর পর তাঁর আর ছেলে-পিলে হয়নি। গিন্নি নাকি চেয়েছিলেন তাঁর স্বামী একটি উপপত্নী ঘরে আনুন, কিন্তু সে ওঁকে ভালোবাসার জন্যেই হোক বা ওঁর প্রতি ভালোবাসা না থাকার জন্যেই হোক এখনও পর্যন্ত উপপত্নী গ্রহণ করেন নি। গৃহিণীর উপাখ্যান শুনতে শুনতে সেই সরলপ্রাণ মেয়েটির মনে কখনো আনন্দ কখনো দুঃখ জেগে ওঠে। একবার উৎফুল্ল একবার নিরাশ হয়ে পড়ে। শেষে বুড়ি তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা তাকে জানায়। শুনে তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে ; গিন্নি কিন্তু বলেন—“তোমার তো এরই মধ্যে অনেক ছেলেপিলে হয়েছে, কাজেই এ-সব বিষয়ে তুমি সবকিছুই জানো। অন্ততঃ আমার থেকে বেশি তো নিশ্চয়ই।” এই বলে তিনি চলে যান।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কর্তা নিজেও তাঁর সংসারের বিষয়ে অনেক কিছু বলেন। খানিকটা ঝোঁকের সঙ্গেই বলেন। কিছুটা নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যে, কিছুটা ওর চোখে নিজেকে আকর্ষণীয় করবার লোভে। মেয়েটি একটা লাল কাঠের দেরাজ-আলমারির পাশে বসেছিল। এমন আলমারি নিজের বাড়িতে

তার কোনোদিন ছিল না। সে যখন বড়ো বড়ো চোখ করে সেদিকে তাকিয়ে ছিল তখন তিনি এসে তার সামনে বসলেন।

"তোমার নাম কী ?"

সে কোনো জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে খাটের দিকে এগিয়ে যায়। তিনি পিছনে পিছনে গিয়ে হেসে বলেন "লজ্জা করছে ? বুঝেছি, তুমি ভাবছো তোমার স্বামীর কথা, না ? এখন তো আমিই তোমার স্বামী।" তাঁর গলার স্বর বেশ শান্ত। তিনি ওর হাতের আস্তিনটা একটু টেনে বলেন—"দুঃখু করো না। তুমি হয়তো তোমার ছেলের কথাও ভাবছো। কিন্তু—"

কথাটা আর শেষ হয় না। আর একবার হেসে অপর হাতে নিজের জামা খুলতে থাকেন।

বাইরে গিন্নি কাকে কসে গালাগালি দিচ্ছেন তারই শব্দ মেয়েটির কানে আসে। কাকে যে বকছেন তা বোঝা যায় না। হয়তো রাঁধুনিকে কিংবা হয়তো ওকেও হতে পারে! যাকেই হোক, কিন্তু তার মনে হতে থাকে সে-ই যেন এই গালাগালির কারণ।

বিছানা থেকে কর্তা ডাকেন "শোবে এসো। গিন্নি ঐ রকম সারাক্ষণই বকেন। চাকরটাকে ওঁর একটু বেশি পছন্দ, তাই সারাক্ষণ রাঁধুনি-বৌ ওয়াংকে উনি বকেন, কেননা চাকরটার আবার পছন্দ ঐ রাঁধুনি-বৌটাকে।"

* * * *

দিনের পর দিন চলে যায়। ক্রমে পুরোনো বাড়ির চিন্তা দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে আর এখানকার সবকিছু নিকটতর পরিচিত হয়ে ওঠে। কখনও কখনও সে শুনতে পায় 'বসন্তের ধন' কাঁদছে আর অনেকবার স্বপ্নে তাকে দেখে। কিন্তু স্বপ্ন ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে আর তার দৈনন্দিন কর্তব্য-কর্মের বোঝা উঠতে থাকে বেড়ে। সে আবিষ্কার করে গিন্নির তার প্রতি ভীষণ সন্দেহ। উপরে উপরে মনে হয় ভারি দরাজ, কিন্তু তাঁর ঈর্ষা ভিতরে ভিতরে তাঁকে গুপ্তচরের সামিল করে তোলে। সারাক্ষণ তাঁর স্বামী নতুন মেয়েটার জন্যে কী করলেন না-করলেন এই সন্ধান করেন। কর্তা বাইরে থেকে এসে প্রথমেই যদি মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেন গিন্নির তাহলেই সন্দেহ হয় ওরই জন্যে নিশ্চয় কিছু একটা বিশেষ উপহার এসেছে। আর তাহলে সেই দিনই রাত্রে কর্তাকে গিন্নির ঘরে গিয়ে গরম গরম উপদেশ শুনতে হয়। "শেষে একটা শেয়ালে তোমাকে যাদু করে নিলে ?"—"তোমার বুড়ো হাড়ের কতো দাম

তোমার জানা আছে ?” ইত্যাদি ইত্যাদি বচন প্রায়ই শোনা যেতো। তারপর থেকে কর্তার ফেরবার সময় মেয়েটি যদি একা থাকতো সে তাঁকে এড়াবার চেষ্টা করতো। গিন্নি কাছাকাছি থাকলেও সে বুদ্ধিমানের মতো একটু দূরেই সবে যেতো এবং চেষ্টা করতো তার এইসব ব্যবহার যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক এবং বিনীতভাবে করবার। তা নইলে গিন্নি চোখ রাঙিয়ে বলতেন এসব আর কিছুই নয়, পাঁচজনকে দেখানো যে গিন্নিই ওকে কষ্ট দিচ্ছেন। সময় যতো যায় একে একে বাড়ির সব কাজই তার ঘাড়ে এসে পড়ে—যেন সে সামান্য একজন দাসী। সে নিজের ইচ্ছেতে বুদ্ধিমানের মতো গিন্নির কাপড়ও ধুয়ে দিত ; যদিও গিন্নি তাকে বলতেন—“আমার কাপড় কাচবার তো তোমার কোনো দরকার নেই। এমন কি তোমার নিজের কাপড়ও তো তুমি ওয়াং বেটিকে দিয়ে কাচাতে পারো।”

ঠিক তার পরেই আবার তিনি বলতেন—“একবার শুয়োরের ঘরটা দেখে এসো তো বোন। ঐ শুযোর দুটো কেন যে এত চেঁচায় বুঝি না। বোধহয় খাবার নেই। ওয়াং বেটি কিছুতেই ওদের খাওয়াবে না।”

আট মাস পরে শীতকালে তার খিদে কেমন মরে গেলো! ভাত খেতে আর ভালো লাগতো না। কেবল সিমাই আর রাঙা আলু। কিছুদিন তাই খেয়ে তা-ও আর ভালো লাগে না। বেশি খেলে পেটে খাবার থাকে না, উঠে আসে। স্কোয়াশ আর কুল খেতে ইচ্ছে হয়, অথচ সে-সবের সময় এখন নয়, কোথায় পাওয়া যাবে ? খবর শুনে এই সবের লক্ষণ কী তা সম্‌ঝে কর্তা ভারি খুশি, সারাদিন তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকে। যতো কিছু পাওয়া সম্ভব সমস্তই তিনি মেয়েটির জন্যে কেনেন। নিজে রাস্তায় গিয়ে কমলালেবু কিনে আনেন, এবং ছোটো ছোটো সোনালি রংএর কমলালেবু আনবার ফরমাস দেন। বারান্দায় এদিক ওদিক পায়চারি করতে করতে নিজের মনে বিড়বিড় করে কী যে বকেন কেউ তা শুনতে পায় না। একদিন তিনি দেখেন মেয়েটি ওয়াংকে নতুন বছরের পিঠের জন্যে গম পিষতে সাহায্য করছে। কয়েক মুঠি মাত্র পেষা হতেই তিনি তাকে ডেকে বল্লেন—“তুমি এবার বিশ্রাম করো। চাকররাই গম ভাঙতে পারবে, ওরাও তো সবাই পিঠে পাবে।”

মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা আর সবাই যখন খোশগল্প করছে কর্তা তখন আলো জ্বেলে একা একা কবিতার বই পড়তেন। চাকরেরা জিজ্ঞেস করে—“এখনও আপনি এসব পড়েন কেন কর্তা ? আপনি তো আর পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন না।”

কর্তা তাঁর নরম গালে হাত বুলোতে বুলোতে হেসে বলেন—"আহা! জীবনে আনন্দের খবর কি আর তোরা জানিস?

বিয়ের রাতের ফুল আর আলো।
সোনার জলে লেখা পরীক্ষার্থীর নাম!

বুঝলি বচন দুটো? এই হচ্ছে মানুষের জীবনের দুটো সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা। দুটোই আমার জীবনে ঘটে গেছে অতীতে, তবু আজ আমার যে-আনন্দ সে এ-দুটোর চেয়েও আরো বেশি।"

এ-কথা তাঁর দুই স্ত্রী ছাড়া আর যে শোনে সে-ই হেসে ওঠে। গিন্নির কাছে এসব ভালো লাগে না। প্রথমটা তিনি মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা শুনে খুশিই হয়েছিলেন, কিন্তু শেষে আদরের ঘটা দেখে চটে ওঠেন এই ভেবে যে এসব তো তাঁরই প্রাপ্য হতো যদি নিজে পেটে ছেলে ধরতে পারতেন! একবার—সেটা ছিল পরের বছর তৃতীয় মাস—মেয়েটি একটু অসুখ আর মাথা-ধরা নিয়ে তিন দিন বিছানায় শুয়ে রইলো। কর্তার খুবই ইচ্ছে সে বিশ্রাম করে। শুধু তাই নয়, কেবলই খোঁজ নেন সে কিছু চায় কি না! এই দেখে গিন্নি ভীষণ চটে ওঠেন। বলেন, অসুখ না ঢং। তিন দিন ধরে এই নিয়ে খালি বক্ বক্ করেন আর মুখে যা আসে তাই বলে মেয়েটিকে যাচ্ছেতাই করেন। গিন্নি বলেন, এই বাড়িতে এসে অবধি মেয়েটা নিজেকে একজন মস্ত লোক বলে ভেবেছে। গায়ে ব্যথা আর মাথায় ব্যথা এইসব দেখিয়ে উঁচুদরের উপপত্নীর ভড়ং করতে চাইছে। নিজের বাড়িতে এমন প্রশ্রয় ও নিশ্চয় কোনোদিন পায়নি। সেখানে নিশ্চয় তাকে রাস্তার কুকুরের মতন পেটে একপেট ছানা নিয়ে খাবারের ধান্দায় ঘুরতে হতো। এখন ঐ পাজি বুড়োটা—স্বামীকে তিনি এই বলে সম্বোধন করলেন—লাই দিয়ে মাথায় উঠিয়েছে কিনা, তাই উনি যেন একেবারে ননীর পুতুলটি হয়ে পড়েছেন।

একদিন ওয়াংকে তিনি বলেন—"হবে তো ভারি একটা ছেলে! কেন, আমাদের কি কারু ছেলে হয়নি নাকি? আমি নিজেই তো একটা দশ মাস পেটে ধরে নিয়ে বেড়িয়েছি। কই, এমন তো কখনো করিনি! আর তা ছাড়া ওঁর ছেলে তো এখনও বিশ বাঁও জলে। জন্মাবে যখন, হয়তো একটা ব্যাঙ হয়ে জন্মাবে, কে বলতে পারে? আগে বেরুক পেট থেকে, তারপর না-হয় আমার সামনে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াক। এরই মধ্যেই অতো দেমাকের কি? এখনও সেটা একটা মাংসপিণ্ড।"

মেয়েটি সে-রাত্রে কিছুই খেলে না। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই সমস্ত কটু কথা শোনে আর মুখ বুজে কাঁদে। কর্তা জামা খুলে বিছানায় বসে এই সব শুনে ঘেমে ওঠেন, আর থরথর করে কাঁপতে থাকেন। একবার ইচ্ছে হয় উঠে জামা পরে নিয়ে বাইরে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে তাকে কয়েক ঘা কষিয়ে দিয়ে আসেন, তাতে যদি কিছুটা রাগ কমে। কিন্তু সে-শক্তি যেন ওঁর নেই। আঙুলগুলো কাঁপতে থাকে, বাহু দুটো মনে হয় দুর্বল। নিঃশ্বাস ফেলে বলেন "হায়, ওকে আমি বড়ো লাই দিয়ে ফেলেছি। আজ ত্রিশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, একদিনের জন্যেও চড় মারা তো দূরে থাক নখ দিয়ে একটা চিমটি অবধি ওকে কাটিনি। আর তার ফলে বুড়ির মেজাজ হয়েছে যেন খিটখিটে বিধবার মতো।"

তিনি মেয়েটির কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলেন—"কেঁদো না, লক্ষীটি, কেঁদো না! করুক গে ও খ্যাক্ খ্যাক্। নিজে হচ্ছে দামড়া মুরগির মতো; অপরে যদি ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায় তো দু-চক্ষে দেখতে পারে না। তোমার পেটে সত্যি যদি ছেলে জন্মায় তাহলে তোমার জন্যে দুটি গহনা আমি রেখেছি। সবুজ জেড্এর একটা আংটি আর শাদা জেড্এর—"

বাইরে গিন্নির অবিশ্রান্ত কটূক্তি তাঁর কথার স্রোত বন্ধ করে দেয়। গায়ের জামা খুলে ফেলে মাথা অবধি তিনি কম্বলে ঢেকে ফেলেন। তারপর ওর বুকের উপর নিজের মুখ রেখে ফিস্ ফিস্ করে বলেন "আমার একটা শাদা জেড্এর……"

দিন দিন পেটটা বড় হতে হতে শেষে চাল মাপবার বড় কুন্কের মতো হয়। গিন্নি তখন একজন দাই আনার ব্যবস্থা করেন। তিনি এমন কি, টক্‌টকে রঙিন কাপড় বার করে আর পাঁচজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে জামা সেলাই করতে বসেন।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ শেষ হয়েছে। বছরের ছটা মাস পরিবারের সবাই আশায় আশায় কাটিয়েছে। হেমন্তের শুরুতেই শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে গ্রামে। তারপর একদিন বাড়ির মধ্যে আশার স্রোত প্রায় কূল ছাপিয়ে ওঠে। প্রতীক্ষা আর উন্মুখতায়-ভরা একটা আবহাওয়া! বিশেষ করে কর্তা বিষম উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। হাতে একটা পঞ্জিকা নিয়ে উঠোনে কেবল পায়চারি করতে থাকেন, আর সেই পাঁজি থেকে কী একটা যেন মুখস্থ করবার চেষ্টা করেন। নিজের মনে কেবলই বলে চলেন—"ব্যাঘ্রের প্রভাবটাই

বেশি বলে ঠেকছে।” কখনো কখনো তাঁর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি বন্ধ জানালাটার দিকে নিবদ্ধ হয়। সেখান থেকে দাইএর চাপা গলার আওয়াজ আসে। কখনো বা তিনি আকাশে মেঘে-ঢাকা সূর্যটার দিকে তাকান।

ঘরের ভিতর দরজার কাছে ওয়াং দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি তাকে শুধোন—“এখন কী রকম?”

ওয়াং খানিকক্ষণ নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে, তারপর বলে—“এখুনি হবে, এখুনি হবে!”

কর্তা আবার পাঁজিটা হাতে নিয়ে উঠোনে পায়চারি করতে শুরু করেন।

এইভাবে চল্লো যতক্ষণ পর্যন্ত না ধূসর সন্ধ্যারাগ মাটির উপর থেকে উঠে ছেয়ে ফেল্লে চারিদিক, আর এদিকে-ওদিকে চারিদিকে বাতি জ্বলে উঠলো বসন্ত-পুষ্পের মতো। সেই সময় জন্ম নিল একটি ছেলে। ঘরের ভিতর তার জোর গলার কান্না শোনা গেলো। কর্তাও এককোণে বসে আনন্দের চোটে প্রায় কেঁদে ফেল্লেন। বাড়িতে খাওয়ার ইচ্ছে কারুরই ছিল না তবুও যৎসামান্য আহারের আয়োজন করে সকলে খাবার টেবিলে জড়ো হলেন। সেইখানে গিন্নি চাকরদের বললেন—“খানিকক্ষণের জন্যে খবরটা যেন গোপন থাকে, নইলে নজর লেগে যেতে পারে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো মেয়ে হয়েছে!”

একমাস পরে খোকার শাদা নরম মুখে হেমন্তের রোদ লাগে। মেয়েটি ছেলেকে দুধ খাওয়ায় আর পাড়ার উৎসুক মেয়েরা তাকে ঘিরে থাকে। তাদের কেউ বলে, ছেলের নাকটি ভালো, কেউ বলে মুখটি, আবার কেউ করে কান দুটির সুখ্যাতি। কেউ বলে মাকে আগের থেকে ভালো দেখাচ্ছে; রং ফর্সা হয়েছে, গায়েও সেরেছে। আর গিন্নি কেবল এটা ওটা হুকুম দিয়ে যত্ন আত্তি করে চলেন বুড়ি-ঠাকুরমার মতো। তিনি বলেন—“খুব হয়েছে! খোকাকে আর কাঁদিও না।”

কর্তা ছেলের নাম নিয়ে অনেক ভাবনা অনেক চিন্তা করলেন কিন্তু ঠিক নাম খুঁজে পেলেন না। গিন্নির ইচ্ছে যে নাম হবে তার মধ্যে থাকবে “দীর্ঘজীবন, ঐশ্বর্য, আর সম্মান” এই সব মানে, কিংবা “আনন্দ, সমৃদ্ধি, উল্লাস আর বার্ধক্য” এইরকম কিছু। সব থেকে ভালো “দীর্ঘজীবন” বা তারই কোনো প্রতিশব্দ, যেমন “পাকা বয়েস” বা এই ধরনের শব্দ। কর্তার কিন্তু অন্যরকম মত। এসব নাম বড়ো পুরোনো এবং সাধারণ। তিনি তাঁর পুরোনো পুঁথি পত্তর ঘেঁটে নাম খুঁজে বেড়াতে থাকলেন। এক পক্ষ চলে গেলো, একটা পুরো মাস চলে গেলো,

তবু ঠিক মনের মতো একটা নাম বার হলো না। তিনি চান নামটা দিয়ে একদিক দিয়ে যেমন হবে ছেলেকে আশীর্বাদ করা আবার অন্য দিক দিয়ে, এই যে বুড়ো বয়সে তাঁর ছেলে হলো এটাও যেন বোঝায়। ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। একদিন তিনি তিন মাসের ছেলেকে হাঁটুর উপর বসিয়ে আলোর তলায় বসে চশমা পরে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন নামের খোঁজে ; মা একধারে চুপ করে বসে অন্য কথা ভাবছে , তার মন অনেক দূরে চলে গেছে। সে হঠাৎ বলে ওঠে—"আমার মনে হয় ওকে 'হেমন্তের ধন' বলে ডাকলে বেশ হয়।" ঘরে যারা বসে ছিল সবাই তার দিকে চেয়ে শোনে। "ও তো হেমন্তেরই সময় জন্মেছে। হেমন্তের কাছ থেকে পাওয়া। ওর নাম রাখো হেমন্তের ধন।"

"চমৎকার!" বলে কর্তা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। "এতদিন কত চেষ্টাই না আমার ব্যর্থ হয়েছে। আমার জীবনেও হেমন্ত এসেছে। পঞ্চাশের উপর বয়স হলো। তার উপর ও জন্মালোও হেমন্তকালে ; আর হেমন্তেই প্রকৃতির মধ্যে সব কিছু সুপক্ক হয়। 'হেমন্তের ধন' চমৎকার নাম। তা ছাড়া শাস্ত্রে লিখেছে 'হেমন্তের ফসলখানি—ফলিবে ফলিবে জানি'—আর সত্যিই এই তো আমার ফসল!"

তারপর তিনি ছেলের মায়ের সুখ্যাতি শুরু করে বলেন, শুধু লেখাপড়ায় কিছু হয় না, বুদ্ধিই হচ্ছে ভগবানের দান। এসব কথায় মেয়েটি ভারি বিব্রত বোধ করে। সে তার চোখের পাতা নামিয়ে জল-ভরা চোখে ভাবে "আমি আমার 'বসন্তের ধন' এর কথা ভাবছিলুম ; তাই!"

'হেমন্তের ধন' দিন দিন যেমন সুন্দর হয়ে ওঠে তেমনি মায়েরও ন্যাওটা হয়ে ওঠে। তার অদ্ভুত রকমের বড়ো বড়ো চোখ। তাই দিয়ে সে অপরিচিতদের দিকে অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, যদিও মাকে চিনতে পারে এক দৃষ্টিতেই, এমন কি দূরে থাকলেও। সারাদিন সে মাকে আঁকড়ে থাকে, কিন্তু কর্তার অত ভালোবাসা সত্ত্বেও ছেলে বাপের দিকে ফিরেও তাকায় না। গৃহিণী বাইরেই ভালোবাসা দেখাতেন ; ভাব দেখাতেন যেন তাঁর নিজেরই ছেলে, কিন্তু ছেলের নিজের বড়ো বড়ো চোখে তিনিও অপরিচিতের দলে রয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের উপর ছেলের অবলম্বন যতোই শক্ত হয়ে আসতে লাগলো মায়ের বিদায়ের দিনও ততোই এগিয়ে এলো। শীত যেতে না যেতে এলো বসন্ত ; বসন্ত ফুরোতে না ফুরোতে এলো গ্রীষ্ম। কাজেই মায়ের তিন বছরের মেয়াদ যে ফুরিয়ে এলো এই কথাটাই সবার মনে জাগে।

পুত্রস্নেহের বশে কর্তাই প্রথমে কথাটা গিন্নির কাছে পাড়লেন। তিনি বল্লেন, আর একশো ডলার দিয়ে মেয়েটাকে বরাবরের জন্যে কিনে নেওয়া যাক।

গিন্নি জবাব দিলেন—"ওকে যদি কেনাই স্থির হয়, তাহলে তার আগে আমাকে বিষ দাও।"

কর্তা রাগে গুম হয়ে অনেকক্ষণ কথা বল্লেন না। তারপর একটু হেসে বল্লেন—

"তোমার কি মনে হয়, মাকে ছেড়ে কচি ছেলে—"

গিন্নি বাঁকা স্বরে উত্তর দিলেন—"ও, তাই বুঝি? আমি বুঝি ওর উপযুক্ত মা হতে পারি না?"

এদিকে ছেলের মায়ের মনে তখন দুটো অনুভূতির সংঘাত চলেছে। প্রথমতঃ অনেক দিন ধরে ওর মাথার মধ্যে একটা কথা বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে—"তিন বছর, তিন বছর, তিন বছর।" তিন বছর তার মনে হয়েছিল দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তাই সে এই বাড়িতে দাসীবৃত্তি করতে রাজি হয়েছিল; সে দেখে যে তার এই 'হেমন্তের ধন' যে তার কাছে বাস্তব, সে-ও যেমন, তেমনি তার 'বসন্তের ধন'এর স্মৃতি তার কাছে ঠিক তেমনি জীবন্ত তেমনি মোহময়। 'হেমন্তের ধন'কেও যেমন সে প্রাণ ধরে ছাড়তে পারবে না তেমনি 'বসন্তের ধন'কেও ছাড়া তার পক্ষে আরও মর্মান্তিক। তার মনে বড়ো একটা ইচ্ছে যে বাকি জীবনটা এই নতুন বাড়িতেই কাটিয়ে দেয়। সে বুঝতে পারে যে 'বসন্তের ধন'এর বাবা আর বেশি দিন বাঁচবে না, হয়তো তিন-চার বছরের মধ্যেই সে পরপারের যাত্রী হবে। সে ঠিক করে তার দ্বিতীয় স্বামীকে বলবে 'বসন্তের ধন'কে পুষ্যি নেওয়ার কথা, যাতে তার দুই ছেলেই তার কাছে থাকতে পারে।

প্রথম গ্রীষ্মের রোদে বাড়ির বাইরে বারান্দায় বসে এই সব দিবাস্বপ্ন অতি সহজেই আসে। মাঝে মাঝে যখন সে ঐখানে বসে 'হেমন্তের ধন'কে দুধ খাওয়ায় সে যেন দেখতে পায় 'বসন্তের ধন'ও দাঁড়িয়ে আছে। সে হাত বাড়ায় তাকে কাছে টেনে নেবার জন্যে, কিন্তু কই সে ওখানে তো নেই!

কাছেই দরজার কাছে গিন্নি দাঁড়িয়ে—মুখে দয়া, চোখে নিষ্ঠুরতা—এক দৃষ্টে ওকে লক্ষ্য করছেন। এই দেখে সে চমকে উঠে ভাবে—"না না, যতো তাড়াতাড়ি পারি চলে যাওয়াই ভালো, সারাক্ষণ ও আমার পিছনে চরের মতো লেগে আছে।" কিন্তু আবার তার কোলের ছেলে কেঁদে উঠলেই সে উপলব্ধি

করে যে ও-ই হচ্ছে তার আসল, ও ছাড়া আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না। এই বুঝে সে সংযত হয়।

পরে কর্তা তাঁর পরিকল্পনার কিছু অদল-বদল করেন। তিনি ঠিক করেন সেই স্যূন্ মেয়েটাকে ডেকে পাঠিয়ে 'হেমন্তের ধন'এর মায়ের প্রথম স্বামীর কাছে পাঠাবেন ; পাঠিয়ে বলবেন আরও ত্রিশ ডলার, আর না হলে বড় জোর পঞ্চাশ ডলার দিয়ে তিনি আরো তিন বছর তার স্ত্রীকে এখানে রাখতে পারবেন কি না? আর গিন্নিকে এই কথা বলেন যে "হেমন্তের ধন যখন পাঁচে পড়বে তখন সে তার মাকে ছাড়তে পারবে।"

গিন্নি তখন মালা হাতে উপাসনা করছিলেন। বৌদ্ধ মন্ত্র জপতে জপতে তিনি উত্তর করেন—

"ওর বাড়িতে নিজের একটা সন্তান রয়েছে। তোমার উচিত ওকে ওর বিয়ে-করা স্বামীর কাছে ফিরে যেতে দেওয়া।"

কর্তা মাথা নীচু করে একটু ইতস্ততঃ করে বলেন—

"কিন্তু 'হেমন্তের ধন'এর কথাটা একবার ভেবে দেখো। বেচারার দুবছর বয়সেই মায়ের মাসের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে—"

গিন্নি মালা রেখে বলেন—"আমি ওকে মানুষ করবো। আমি ওর দেখা শুনা করবো। তোমার কি ভয় হচ্ছে আমি ওকে খুন করবো?"

এই কথায় কর্তা সেখান থেকে উঠে বেরিয়ে যান। গিন্নি তাঁর উদ্দেশে বলতে থাকেন—

"আমার কাজের সুবিধে হবে বলেই এই ছেলে হওয়া। 'হেমন্তের ধন' আমার। আমার নয়, তোমারই বংশ নির্বংশ হবার ভয় ছিল, তবু তোমার পরিবারের ভাতই তো আমায় খেতে হয়! বুড়ো হয়ে তোমার ভীমরতি হয়েছে, কচি খোকা বনে গেছ। তোমার সব বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আর কদিনই বা তুমি বাঁচবে যে ঐ মেয়েটাকে নিয়ে আঁকড়ে থাকতে চাও? মরবার পরও সতীনের সঙ্গে ঘর করবার আমার আর ইচ্ছে নেই।"

গিন্নির এই সব কাটা কাটা কথার বাকিটা আর কর্তার কানে গেলো না— তিনি তখন অনেক দূরে চলে গেছেন।

গরমের সময় ছেলের মাথায় একটা ফোড়া উঠলো ; মাঝে মাঝে তার অল্প জ্বর হতে থাকলো। গিন্নি কাজেই দেবতাদের কাছে মানত করতে থাকেন আর নানা রকম দৈব ওষুধ এনে ফোড়ার উপর ঘষেন আর ছেলের পেটে

ঢালেন। মায়ের কাছে অসুখটা মোটেই শক্ত অসুখ বলে ঠেকে না ; কাজেই ছেলেকে সারাক্ষণ কাঁদানোতে আর ঘামানোতে সে আপত্তি করে। মুখে একটুখানি ওষুধ ছুঁইয়েই সে লুকিয়ে সেটা ফেলে দিতে থাকে।

গিন্নি স্বামীর কাছে একটা সরব নিঃশ্বাস ফেলে বলেন "দেখছো তো, খোকার অসুখটা যেন কিছুই নয়, ও নিয়ে ওর চিন্তাই নেই। খোকা যে দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে তা-ই মানবে না। ভিতরের ভালোবাসাটাই হলো গভীর ভালোবাসা ; আর মুখের ভালোবাসা মিথ্যে ভুয়ো।"

মেয়েটি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। কর্তা কিছুই বলেন না।

'হেমন্তের ধন'এর প্রথম জন্মদিনে সারাদিন ধরে উৎসব। বাড়িতে ত্রিশ-চল্লিশ জন অতিথি। কেউ এনেছে কাপড়, কেউ এনেছে সেমাই, কেউ এনেছে ছেলের গলায় ঝোলাবার রুপোর সিংহ। আবার অনেকে এনেছে ছেলের টুপিতে সেলাই করে দেবার জন্যে দীর্ঘায়ু-দেব-এর সোনার জলে আঁকা মূর্তি। অতিথিদের ঝল্‌মলে জামার হাতার ভিতর থেকে কত রকম উপহার বেরতে থাকে। তাঁরা সবাই ছেলের অগাধ খ্যাতি আর অক্ষয় জীবন কামনা করেন। কর্তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে—গালে যেন অস্তরবির রংএর ছটা।

সন্ধের মুখে ঠিক যখন ভোজ আরম্ভ হচ্ছে সেই সময় গোধূলির কুয়াশার ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক অতিথি এসে দাঁড়ায় উঠোনে। সকলে তাকিয়ে দেখে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মতো একটা গেঁয়ো লোক, কাপড়ময় তার তালিমারা, মাথায় লম্বা চুল, বগলে একটা কাগজের মোড়ক। কর্তা অবাক হয়ে তার কাছে এগিয়ে যান, গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে আসছ? তার মুখ দিয়ে বিশেষ কিছু কথা বার হয় না ; যা বার হয় তার মর্মও কর্তা বোঝেন না। তারপর হঠাৎ তাঁর মনে হয় : এ নিশ্চয় সেই চামড়ার ব্যবসাদার।

নীচু গলায় তিনি বলেন—"তুমি উপহার এনেছো কেন? তোমার তো এসবের কোনোই দরকার ছিল না।"

অতিথি জবাব দেবার আগে একবার ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে, তারপর বলে—

"আমি—আমি এসেছিলুম আপনার স্ত্রীর দীর্ঘজীবন কামনা করতে আর—"

এই বলতে বলতে থেমে সে মোড়কটা বার করে, তারপর কাঁপা হাতে দুতিন পুরু কাগজ খুলে ফেলে। চারটে অক্ষর বার হয়, প্রত্যেকটা লম্বায় চওড়ায় এক ইঞ্চি করে। পিতলের তৈরি অক্ষরগুলো রুপো দিয়ে মোড়া।

অক্ষর কটার মানে "তোমার দীর্ঘজীবন যেন দক্ষিণের পাহাড়গুলোর সঙ্গে পাল্লা দেয়।"

গিন্নি এসে আগন্তুককে দেখেন,—খুব খুশি হন না। তাহলেও কর্তা তাকে নিয়ে যান খাবার টেবিলে, যেখানে অতিথিরা এরই মধ্যেই নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কথা বলতে আরম্ভ করেছে।

দু ঘণ্টা ধরে খাবার আর মদ্যপানের ফলে ফূর্তির ফোয়ারা খুলে যায়। চীৎকার করে 'জোড় বিজোড়' খেলা চলে। বাজি রেখে গামলা গামলা মদ উড়ে যায়। এমন হট্টগোল শুরু হয় যে গোলমালে বাড়ি যেন কাঁপতে থাকে। চামড়ার ব্যাপারীই একমাত্র দু বাটি মদ খেয়েও চুপ করে বসে থাকে, অতিথিরা কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। মদের ঝোঁক যখন কেটে আসে সবাই তাড়াতাড়ি এক এক বাটি ভাত খেয়ে শুভ ইচ্ছা জানিয়ে উঠে পড়ে, তারপর দুজন তিনজন করে একসঙ্গে লণ্ঠন নিয়ে চলে যায়।

চামড়ার ব্যাপারী শেষ অবধি খায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না চাকরেরা থালা বাটি নিতে আসে ততক্ষণ সে টেবিল থেকে ওঠে না। তারপর বারান্দার এক অন্ধকার কোণে গিয়ে নিজের ইজারা-দেওয়া স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে।

মেয়েটি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে—"কেন এলে তুমি ?"

"তুমি কি ভাবছো আমি নিজে থেকে আসতে চেয়েছিলুম ? তা মোটেই নয় ; কিন্তু কী করব, না এসে পারলুম না।"

"তবে এত দেরি করে এলে কেন ?"

"বেশ বল্লে! উপহার কেনবার টাকা চাই তো? সারা সকাল এখানে ওখানে ঘুরে ভিক্ষে করে এর ওর কাছে হাত পেতে বেড়িয়েছি। তারপর শহরে যেতে হয়েছে জিনিশটা কেনবার জন্যে। এতো হেঁটে ক্লান্ত হয়েছি, ক্ষিদেও পেয়েছে—তাই তো দেরি হয়ে গেল।"

মেয়েটি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে—"আর বসন্তের ধন ?"

লোকটি লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—"বসন্তের ধনএর জন্যেই আমার আসা।"

ভয়ে মেয়েটি বলে ওঠে—"বসন্তের ধন-এর জন্যে ?"

লোকটি আস্তে আস্তে বলতে থাকে—"গরমের সময় থেকে 'বসন্তের ধন' বেজায় রোগা হয়ে যেতে থাকে। তারপর এই হেমন্তকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে অসুখে পড়লো। আমার কাছে তো টাকা নেই যে ডাক্তার দেখাবো কি

ওষুধ কিনবো, তাই এখন কাজেই তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। ওর জন্য যদি আমরা কিছু না করি তাহলে বেচারা বোধহয় আর বাঁচবে না।” একটু থেমে সে বলে—“তাই তোমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করতে এলুম……”

মেয়েটির মনে হয় যেন কয়েকটা বেড়ালে মিলে তার বুক আঁচড়াচ্ছে আর পেটের ভিতরকার নাড়ি চিবচ্ছে। তার ইচ্ছে হয় কাঁদে, কিন্তু আজকের দিনে যখন সবাই ‘হেমন্তের ধন’এর সুখ কামনা করছে তখন সে নিজে কি করে কাঁদতে বসে ? চোখের জল চেপে সে বলে—

“আমার নিজেরও তো টাকা নেই। এরা এখানে আমাকে মাসে এক টাকা করে দেয় হাত খরচের জন্যে। আমার তো আর নিজের কোনো দরকার হয় না, তাই সেটা ছেলের খরচেই চলে যায়। কি করা যায় তাহলে ?”

দুজনেই খানিক চুপ করে থাকে।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে—“বসন্তের ধনকে এখন দেখছে কে ?”

“পাড়ায় একজনের কাছে তাকে রেখে এসেছি। আজ সন্ধের মধ্যেই ফিরে যাবো ভেবেছিলুম। আচ্ছা এবার তাহলে রওনা হওয়া যাক।”

লোকটি চোখের জল মুছে নেয়।

কান্নায় মেয়েটির গলা আটকে আসে, সে বলে—“একটু দাঁড়াও, দেখি ওঁর কাছ থেকে কিছু পাই কি না।”

এই বলে সে চলে যায়।

কিছুদিন পরে কর্তা হঠাৎ একদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন—

“তোমাকে যে সবুজ জেড্‌এর আংটিটা দিয়েছিলুম সেটা কোথায় ?”

“সেদিন রাত্রে তাকে দিয়ে দিয়েছি। ও বাঁধা দেবার জন্যে নিয়ে গেছে।”

কর্তা রেগে বলেন—“তোমাকে তো সেদিন পাঁচ ডলার দিয়েছি।”

“পাঁচ ডলার যথেষ্ট নয়।”

কর্তা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন—“বুঝেছি, তুমি কেবল তোমার প্রথম স্বামী আর প্রথম ছেলের কথাই ভাবো, আমি যতোই করি না কেন। আমি ভাবছিলুম তোমায় আরো দু’ বছর রাখবো ; কিন্তু দেখছি সামনের বসন্তকালেই তোমার চলে যাওয়া ভালো।”

মেয়েটি এমন স্তম্ভিত হয়ে যায় যে কাঁদতেও পারে না।

কিছুদিন পরে কর্তা আবার কথাটা তোলেন। "ঐ আংটিটা ছিল অতি মূল্যবান। তোমাকে দিয়েছিলুম এই জন্যে যে তুমি ওটা হেমন্তের ধনকে দেবে। তখন স্বপ্নেও ভাবি নি যে সুযোগ পেলেই তুমি ওটা বাঁধা দেবে। ভাগ্যিস্ আমার স্ত্রী খবরটা পান্ নি। নইলে পরে এই নিয়ে এখন তিন মাস কথা শুনতে হতো।"

মেয়েটি দিন দিন ফ্যাকাশে আর রোগা হয়ে যেতে থাকে, চোখের দৃষ্টি কেমন নির্জীব হয়ে আসে, আর তার কানে বাজে সারাক্ষণ বিদ্রূপ আর গালাগালির রেশ। সে সর্বদাই ভাবে বসন্তের ধনএর কথা আর তার অসুখের কথা। কবে কখন তার গ্রাম থেকে কোনো লোক আসবে, কিংবা কোনো যাত্রী যাবে তাদের গ্রামে, সব সময় সেই খোঁজে থাকে। ছেলের সম্পূর্ণ আরোগ্যের খবরের জন্যে সে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে, কিন্তু কোনো খবরই আসে না। সে দু-এক ডলার ধার করে বসন্তের ধনএর জন্যে কিছু মিষ্টি কেনে কিন্তু নিয়ে যাবার জন্যে কাউকে পায় না। হেমন্তের ধনকে কোলে নিয়ে ফটকের ধারে বড়ো রাস্তার কাছে বসে বসে দেখে কে আসছে যাচ্ছে—এইভাবে সারাদিন যায়। ব্যাপারটা গিন্নির একেবারেই পছন্দ হয় না ; তিনি কর্তাকে কেবলই বলেন—

"দেখতে পাচ্ছো না কি ওর এখানে আর পোষাচ্ছে না ? এখন ও যতো তাড়াতাড়ি পারে বাড়ি ফিরে যেতে পারলে বাঁচে।"

মাঝে মাঝে রাত্রে হেমন্তের ধনকে কোলে নিয়ে ঘুমতে ঘুমতে হঠাৎ সে স্বপ্নে চীৎকার করে ওঠে। ছেলে জেগে উঠে কাঁদতে থাকে। কর্তা প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন।

"কী হয়েছে ? বলো কী হয়েছে ?"

মেয়েটি কোনো জবাব দেয় না, কেবল চাপড়ে চাপড়ে হেমন্তের ধনকে ঘুম পাড়ায়।

"তুমি কি স্বপ্নে দেখলে নাকি তোমার বড়ো ছেলেটি মারা গেছে ? কী চীৎকার ! আমার পর্যন্ত ঘুম ভেঙে গেলো।"

সে তাড়াতাড়ি বলে—"না, না, আমার মনে হলো আমার সামনে একটা গোরস্তম্ভ দেখলুম।"

আর কোনো প্রশ্ন হয় না। মেয়েটির মানসপটে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য ভাসতে থাকে। তার ইচ্ছে করে সে নিজে সেই গোরস্তম্ভের মধ্যে প্রবেশ করে।

শীত ক্রমে শেষ হয়ে যায়। শীতের বিদায়-বার্তা বহন করে আনে যে-সব ছোটো ছোটো পাখী তারা তার জানলার নিচে অবিরাম গান গায়। প্রথমে ছেলেকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হলো। ছেলের এই সঙ্কটের সময় তার ফাঁড়া কাটিয়ে দেবার জন্যে তাও-বাদী পুরোহিতদের ডাকা হলো। তারপর ছেলের সঙ্গে তার নিজের মায়ের চিরদিনের বিচ্ছেদের বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেলো।

সেদিন ওয়াং গিন্নিকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে—"ওর জন্যে একটা পাল্কীর ব্যবস্থা করবো?"

গিন্নি মালা জপতে জপতে উত্তর করেন—"হেঁটে যাক। পাল্কীতে গেলে ভাড়া দিতে হবে তো, ওর আছেই বা কি যে ভাড়া দেবে? ওর স্বামী তো শুনি খেতেই পায় না, কাজেই ওর আর অতো বাবুয়ানায় দরকার কি? আর এমনই বা কি দূর? আমার কালে আমিও দশ পনের মাইল হেঁটেছি, আর ওর পা তো আমার থেকেও লম্বা। ও তো এক বেলায়ই পৌঁছে যাবে।"

সেদিন সকালে হেমন্তের ধনকে কাপড় পরাতে পরাতে মায়ের চোখের জল আর বাধা মানে না। ছেলে খালি ডাকে 'কাকীমা, কাকীমা'! গিন্নির হুকুমে ছেলে ঐ নামেই তাকে ডাকতে শিখেছে, কারণ তাঁর ইচ্ছে ছেলে তাঁকেই বলে 'মা'। ছেলের ডাকে মা সাড়া দেয় শুধু কান্নায়। তার ইচ্ছে করে কিছু একটা বলে ছেলেকে। বলে—"মানিক আমার, আজ আমাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি। আমার কথা ভেবো না।" কিন্তু কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয় না। তা ছাড়া কথা কইলেও দেড় বছরের ছেলে কী-ই বা বুঝবে?

বিষণ্ন মুখে কর্তা এসে তার হাতে হাত গলিয়ে দেন। হাতে দশটা কুড়ি সেণ্টের মুদ্রা।

আস্তে আস্তে তিনি বলেন—"এই দু ডলার রাখো।"

ছেলের কাপড়ে বোতাম লাগানো শেষ করে সে টাকাগুলো নিজের ভিতর-পকেটে রেখে দেয়।

গিন্নি যখন আসেন, দেখেন কর্তা চলে যাচ্ছেন। তিনি বলেন—

"হেমন্তের ধনকে আমার কাছে দাও, যাতে তুমি চলে যাবার সময় কান্না না ধরে।"

মেয়েটি কিছু বলে না। ছেলে কিন্তু বেঁকে বসে। ক্রমাগত গিন্নির গালে চড় মারতে থাকে। গিন্নি চটে ওঠেন।

"আচ্ছা এখন থাক, দুজনে গিয়ে খেয়ে এসো, তারপরে কিন্তু ওকে আমার কাছে দিয়ে যেও।"

ওয়াং এসে তাকে সাধাসাধি করে পেট ভরে খেয়ে নিতে।

"দু সপ্তাহ ধরে তুমি কেবল এমনি করছো। আগের চেয়ে কতো রোগা হয়ে গেছো। আয়নায় নিজের দিকে একবার দেখেছো কি ? আজ তোমাকে ঐ পুরো বাটির ভাত খেতে হবে। এখনও দশ মাইল হাঁটা বাকি।"

মেয়েটি নিরুৎসাহভাবে জবাব দেয়—"তোমার দয়া আমার মনে থাকবে।"

রোদ চড়ে ওঠে। দিনটা ভারি চমৎকার। হেমন্তের ধন এখনও কিছুতেই তার মাকে ছাড়বে না ; শেষে গিন্নি এসে জোর করে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যান। ছেলেটা চীৎকার করে গিন্নির পেটে ছোটো ছোটো পা দিয়ে লাথি ছুঁড়তে থাকে আর খুদে হাতে তাঁর চুল ধরে টানে। মা পিছন থেকে বলে—

"দুপুরের খাওয়াটা অবধি আমি থেকে যাই।"

গিন্নি তার দিকে মার-মূর্তিতে ঘুরে দাঁড়ান—"এক্ষুনি পুঁটলি বেঁধে বেরিয়ে যাও। যেতে তো হবেই, না কি ?"

ছেলের কান্না সরে যায় তার কাছ থেকে দূরে।

পুঁটলি-পত্র বাঁধবার সময় সে আবার ছেলের কান্না শুনতে পায়। ওয়াং পাশে দাঁড়িয়ে তাকে খুশি করবার চেষ্টা করে আর সেই সঙ্গে চোখও রাখে কিছু সরাচ্ছে কিনা। অবশেষে মেয়েটি তার বগলে সেই পুরোনো পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সামনের ফটক দিয়ে যেতে যেতে সে আবার হেমন্তের ধনএর কান্না শুনতে পায়। কোনো রকমে পা টেনে টেনে এক মাইল পথ হাঁটবার পরও মনে হয় যেন সেই কান্নাই শুনছে। ঝলসানো রোদ্দুরে রাস্তাটা পড়ে রয়েছে তার সামনে একটানা—যেন আকাশের মতো অশেষ। একটা পাহাড়ি নদীর কাছে এসে তার মনে হয়, এই ক্লান্ত চলনের শেষ করে ঐ আয়নার মতো পরিষ্কার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

কিন্তু জলের ধারে কিছুক্ষণ বসে সে আবার তার ছায়া নিয়ে এগিয়ে চলে সেই একই দিকে।

দুপুর পেরিয়ে যায়। এক গ্রামের এক বুড়ো চাষা তাকে জানায় এখনও পাঁচ মাইল পথ বাকি।

মেয়েটি বলে—"খুড়ো, দয়া করে গ্রাম থেকে আমার জন্যে একটা পাল্কী জোগাড় করে দিতে পারো? আমি আর হেঁটে যেতে পারছি না।"

"অসুখ করেছে না কি?"

"হ্যাঁ।"

গ্রামে ঢোকবার সিংদরজার কাছে সে বসেছিল।

"কোথা থেকে আসছো তুমি?"

এর জবাব দিতে তার একটু বাধ-বাধ ঠেকে, তারপর বলে—

"আমি ঐ দিকে যাচ্ছিলুম। সকালে বেরিয়েছিলুম, মনে করেছিলুম হেঁটেই যেতে পারবো।"

বুড়ো তার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে, তারপর দুজন বেহারা আর একটা পাল্কী ঠিক করে দেয়: ছাদ-খোলা পাল্কী, ছাদ লাগাবার মতো এখনও যথেষ্ট গরম পড়ে নি।

বেলা চারটের সময় গ্রামের ময়লা সরু রাস্তা দিয়ে এক ছাদ-খোলা পাল্কী এগিয়ে চলে। তার মধ্যে বসে আধা-বয়সী এক মেয়ে—বাঁধাকপির হলদে শুকনো পাতার মতো তার মুখখানা ম্লান এবং ফ্যাকাশে। চোখ বোজা; নিঃশ্বাস পড়ছে অতি ক্ষীণ। রাস্তার লোকে তার দিকে বিস্ময় আর দাক্ষিণ্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আর একদল ছেলে বেহারাদের পিছনে পিছনে হল্লা করে ছোটে, যেন গ্রামে কি এক অত্যাশ্চর্য বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে।

সেই ছেলের দলের মধ্যে বসন্তের ধন-ও ছিল। সে যেন একদল শুয়োর তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এইভাবে চীৎকার করতে করতে আসছিল। কিন্তু যখন সে দেখে পাল্কীটা একটা মোড় ঘুরে ঢুকলো তাদেরই বাড়ির গলিতে তখন সে অবাক হয়ে থেমে পড়লো হাত তুলে। নিজেদেরই বাড়ির সামনে পাল্কীটাকে থামতে দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে একটা থামকে আশ্রয় করে দাঁড়ায়। অন্য ছেলেরা ভয়ে ভয়ে তারই চারিপাশে ঘিরে থাকে। মেয়েটি পাল্কী থেকে নামে, কিন্তু এমনই হতবুদ্ধি হয়ে যায় যে বসন্তের ধন যে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে—শতচ্ছিন্ন জামা গায়ে, মাথায় জট-পাকানো চুল, সেই তিন বছর আগে যেমন ছিল প্রায় ততটুকুই—সেই বসন্তের ধন, তাকে সে দেখতে পায় না। হঠাৎ সে কান্নার সুরে ডেকে ওঠে—

"বসন্তের ধন!"

অন্য ছেলেরা চমকে ওঠে। আর বসন্তের ধন ভয়ে বাড়ির ভিতর বাবার কাছে ছুটে পালিয়ে যায়।

নোংরা অন্ধকার ঘরে মেয়েটি অনেকক্ষণ বসে থাকে কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তার একটি কথাও হয় না। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে, লোকটি ঘাড় তুলে বলে—

"যাও এবার বরং খাবারের কিছু ব্যবস্থা করো।"

সে জোর করে উঠে দাঁড়ায়, তারপর ঘরের এক কোণে যায়। খানিক পরে দুর্বলকণ্ঠে বলে—

"চালের হাঁড়িতে তো কিছুই নেই।"

লোকটি তার দিকে চেয়ে একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসে।

"বড়লোকের বাড়িতে কাটিয়ে এসেছো? চাল? ঐ সিগারেটের কৌটোয় দেখ।"

সেদিন রাত্রে লোকটি ছেলেকে বলে "বসন্তের ধন, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে ঘুমোতে যাও।"

ছেলেটি উনুনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, সে কাঁদতে শুরু করে। তার মা কাছে গিয়ে ডাকে, "বসন্তের ধন, মাণিক আমার।" কিন্তু হাত বাড়িয়ে আদর করতে যেতেই সে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

"এরই মধ্যে দুষ্টুমি শুরু হয়েছে? মার খাবে বলে রাখছি!"

নোংরা সরু খাটিয়াটায় সে শুয়ে থাকে, চোখে তার ঘুম নেই। পাশে বসন্তের ধন—কি রকম যেন অচেনা, অপরিচিত। তার দুর্বল মস্তিষ্কে ভেসে আসে একটা ছবি—যেন পাশে শুয়ে আছে হেমন্তের ধন, মোটাসোটা, আদুরে। পাশে যে কে তাকে না চিনেই সে ছেলের দিকে হাত বাড়ায়। ছেলেটি ঘুমোতে ঘুমোতে পাশ ফেরে। সে ছেলেকে বুকে চেপে ধরতেই তার নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ তার বুকের মধ্যে সমাহিত হয়; সে আপনা থেকেই তাকে আঁকড়ে ধরে।

মৃত্যুর মতো স্তব্ধ শীতল দীর্ঘ অন্তহীন রাত্রি একটানা চলতে থাকে…

স্বামী

শেন ৎসুং-ওয়েন

(১৯০২—)

শেন ৎসুং-ওয়েন-এর জন্মস্থান কুইচৌ, সে-ছুয়ান ও হুনান এই তিন প্রদেশের সঙ্গমস্থলে ফং-হুয়াং-ছিং গ্রামে। ছ-বছর বয়সে তাঁকে গ্রাম্যস্কুলে দেওয়া হয় এবং তখন থেকেই তিনি স্কুল পালাতে শিখেছিলেন।

বারো বছর বয়সে শেন ৎসুং-ওয়েনকে সামরিক স্কুলে দেওয়া হয়। এর দুবছর পরে তিনি তাঁর রেজিমেণ্টের সঙ্গে হুয়াই-হুয়া পর্যন্ত যান। সেখানে যে ষোলো মাস তিনি ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে সাত-শ মানুষের মাথা কাটা তিনি দেখেছিলেন।

শেন বালক বয়স থেকেই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। উনিশ বছর বয়সে সৈন্যবিভাগের কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি পেইচিং শহরে যান এবং সেখানে গিয়ে খবরের কাগজে কাজ নেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পেইচিং-এর একটি নাম-করা মাসিক পত্রিকার একজন সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময়ে য্যু তা-ফু, বিখ্যাত কবি শু চ্র-মো সঙ্গে এবং অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়।

আর্থিক-সঙ্গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি শাংহাই-এ গিয়ে বসবাস করতে এবং প্রচুর লিখতে শুরু করেন। হু ইয়ে-ফিন ও তাঁর স্ত্রী তিং লিং-এর সঙ্গে সেইখানেই তাঁর আলাপ হয়।

১৯২৪ থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি চল্লিশখানি বই প্রকাশ করেছিলেন। ইনি বহুদিন পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি লেখা ছেড়ে পেইচিং-এর যাদুঘরে প্রত্নতত্ত্বের কাজে নিযুক্ত আছেন।

আজ সাতদিন ধরে কেবলই বৃষ্টি পড়ছে, বসন্তের বৃষ্টি। নদী উঠেছে ফেঁপে, আর এই ফেঁপে ওঠার ফলে আফিংএর নৌকো আর "ফুলের নৌকো" অর্থাৎ গণিকাদের নৌকোগুলো, যা নদীর তীরে নোঙর করা থাকতো, তা একেবারে পাড়ের গা ঘেঁসে উঠে এসে জলের ধারের 'পা-ঝোলা-বাড়ি'গুলোর খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।

"চার সাগরের বসন্ত" নামে যে চায়ের দোকান সেখানে কোনো নিষ্কর্মা লোক চা খেতে এলে ঠিক নদীর উপরের জানলাটিতে হেলান দিলে দেখতে পাবে একটা মিনার ; দূরে ওপারে বৃষ্টির আবছায়া আর লাল রং-এর পীচফল ; আর দেখতে পাবে নৌকোর মেয়েরা তাদের নাগরদের চণ্ডুর চোঙ্-এ আগুন দিচ্ছে। নৌকোগুলো প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে, আর প্রায়ই উপরে আর

নিচে ডাকাডাকি চলে। চায়ের দোকান থেকে লোকটি ডাকলে মেয়েটি যদি সাড়া দেয় তখন দুজনে মিলে খানিকটা কর্কশ অভদ্র ভাষায় কথা চলে; তারপর সে চায়ের দাম চুকিয়ে দিয়ে ভিজে দুর্গন্ধ গলিটা পার হয়ে নোংরা জমিটার ওধারে অবশেষে সেই অপেক্ষমান নৌকোয় গিয়ে উপস্থিত হয়।

নৌকোয় উঠে পড়লে পরে আধ ডলার থেকে পাঁচ ডলার খরচ করলেই সে যেমন খুশি চণ্ডু খেতে আর ঘুমোতে পাবে আর নৌকোয় যে-স্থূলকায়া গুরু-নিতম্বিনীটি বাস করেন তিনি তাকে সারা রাত সেবা করবেন।

নৌকোর স্ত্রীলোকরা এইসব কাজকে এক কথায় বলে 'ব্যবসা'। এরা সব ব্যবসা করতে এসেছে। সত্যি কথা বলতে কি এদের বাণিজ্যের সঙ্গে এদেব স্থনীতির কোনো দ্বন্দ্ব নেই, এদের স্বাস্থ্যেরও কোনো ক্ষতি হয় না। এরা আসে গ্রাম থেকে, চাষীদের ঘর থেকে, সেখানে এদের দিন কাটে ক্ষেতের কাজে আর ধান কেটে। এরা গ্রাম ছেড়ে, যাঁতা ছেড়ে, গরু-বাছুর ছেড়ে, তাদের জোয়ান স্বামীর বাহুবন্ধন ছেড়ে চলে আসে। কোনো হঠাৎ-আলাপ-হওয়া মানুষের কাছে খোঁজ পেয়ে তার সঙ্গে চলে এসে নৌকোয় শুরু করে দেয় 'ব্যবসা'। শীঘ্রই তাদের গেঁয়ো চেহারা বদলে গিয়ে শহুরে হয়ে দাঁড়ায়। তারা নানারকম অনাচারে অভ্যস্ত হয়, যা শুধু শহরেই মানায়, এবং ক্রমে তারা উচ্ছন্নে যায়। কিন্তু তাদের এই বিনষ্টি এত ধীরে ধীরে আসে যে প্রায় কারুর চোখেই পড়ে না। তবু কোনো কোনো স্ত্রীলোক যে-কোনো অবস্থাতেই থাকুক না, যত্ন করে তাদের গ্রাম্য ধরণটুকু বজায় রাখে। এবং সেই কারণেই শহরের এই ছোট্ট নদীটির 'ফুলের নৌকো'-তে সব সময়েই কমবয়সী মেয়েদের আসা-যাওয়ার আর অন্ত নেই।

ব্যাপারটা অতি সহজ। যে-মেয়ের ছেলেপুলে হবার খুব বেশি আগ্রহ নেই সে ইচ্ছে করলেই শহরে চলে যেতে পারে। কেবল প্রতি মাসে সে তার দুরাত্রির রোজকার গ্রামে তার সৎ এবং পরিশ্রমী স্বামীটিকে পাঠিয়ে দেবে। স্বামী থাকবে গ্রামে ক্ষেত-খামারের কাজ নিয়ে পরম সন্তোষে, ধান বিক্রি করে এবং নিজের জমির অধিকার বজায় রেখে। স্ত্রীর উপর স্বামীর দাবীও রইল, আবার দিনের পর দিন ঘরে লাভের কড়িটাও এলো। কাজেই এমন প্রায়ই হয় যে নব-বিবাহিত বহু স্বামী বিয়ের পর তার বৌ-কে পাঠিয়ে দেয় শহরে আর নিজে চুপচাপ থাকে জোত-জমি নিয়ে।

তরুণ স্বামীর যখন 'ফুলের নৌকো'য় তার তরুণী স্ত্রীর কথা মনে পড়ে, অথবা

যখন নতুন বছর এসে পড়ে তখনই স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া প্রথা। সে তখন মাড়-দেওয়া পরিষ্কার কাপড়টি পরে কোমরবন্ধে তার তামাকের বটুয়া আর নল ঝুলিয়ে—এই তামাকের নল ক্ষেতে কাজ করবার সময় সর্বক্ষণ তার মুখেই লেগে থাকতো—আর এক চাঙাড়ি আলু বা পিঠে কাঁধে করে শহরে এসে পৌছয়। সেখানে ঘাটের যত নৌকো সব নৌকোয় খোঁজ নিতে থাকে। ঠিক যেন কোনো এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের খোঁজ করছে। অবশেষে যেখানে তার স্ত্রীলোকটি বাস করে সেইখানে এসে পৌছয়। পৌছিয়ে তার নৌকো সম্বন্ধে সঠিক খবর নিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠে তার কাপড়ের জুতো-জোড়াটা ঘরের বাইরে সযত্নে খুলে রাখে। তারপর সে যা এনেছে মেয়েটির হাতে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অবাক চোখে তার আপাদ-মস্তক দেখতে থাকে। স্বামীর চোখে তার স্ত্রী যে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বদলে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মাথায় একরাশ ঝলমলে চুল, ক্ষুদে চিমটে দিয়ে খুঁটে তোলা সরু কৃত্রিম ভুরু। শাদা পাউডার আর আল্‌তা-মাখা গাল। তার শহুরে হাবভাব আর শহুরে পোষাক দেখে গেঁয়ো স্বামী বেচারা হক্‌চকিয়ে যায়। স্বামীর নির্বোধ ভাবটা সহজেই স্ত্রীর চোখে পড়ে। স্ত্রী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে—"সেই যে পাঁচ ডলার পাঠিয়েছিলুম পেয়েছিলে তো?" অথবা—"শুয়োরগুলোর বাচ্চা হয়েছে কি?" যে-স্বরে সে কথা কয় তা অবশ্য আগের মতো আর নেই। কাজেই স্বামী এই স্বাধীন নম্র-ভাবাপন্না মহিলার সঙ্গে তার গ্রাম্য চাষী-বৌএর কোনো মিলই খুঁজে পায় না।

কিন্তু স্বামীটি যখন শোনে যে তার স্ত্রীলোকটি টাকার খবর নিচ্ছে আর ঘরের শুয়োরের বাচ্চার খোঁজ করছে তখন সে উপলব্ধি করে যে কর্তা হিসেবে সংসারে তার যে স্থান তা এই নৌকোতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যায় নি, এবং মহিলাটিও গ্রামের সব কিছু একেবারে ভুলে যান নি। সুতরাং তার সাহস আবার ফিরে আসে; সে আস্তে আস্তে তার তামাকের পাইপ আর চকমকি বার করে। এইবার দ্বিতীয়বার তার চমক লাগে যখন মেয়েটি তার হাত থেকে হঠাৎ পাইপটা ছিনিয়ে নেয় এবং একটা 'হাতামেন' মার্কা সিগারেট তার কর্কশ হাতের তেলোয় গুঁজে দেয়। কিন্তু চমকটা ক্ষণিকের—স্বামীটি সিগারেট ফুঁকতে আর গল্প করতে শুরু করে। সন্ধ্যাবেলায় যখন খাওয়া শেষ হয়ে যায়, তখনও সে সিগারেটটা খাচ্ছে—জিনিশটা তার কাছে নতুন আর মজার। ঠিক সেই সময় একজন খদ্দের এসে উপস্থিত হন।

হয় একজন নৌকোর মালিক কিংবা বণিক—পায়ে গরুর চামড়ার ঘোড়-তোলা জুতো, অনেক পকেটওয়ালা কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে মোটা চকচকে রুপোর চেন। কড়া মদের ঝোঁকে টলতে টলতে নৌকোয় উঠে চীৎকার করে—চুমু চাই আর ঘুম চাই! এই উচ্চ কর্কশ চীৎকার আর চলন-বলনের ঘটা দেখে স্বামীটির তার গ্রামের বড় বড় লোকদের কথা মনে পড়ে—গ্রামের মোড়ল অথবা জমিদার। লোকটিকে দেখে এবং কোনোরকম আদেশের অপেক্ষা না রেখেই সে ভয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে পাটাতনের তলায় গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ে; তারপর আনমনা হয়ে নদীর উপরের ঝাপ্সা আঁধারের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামায়। রাত এসে নদীর চেহারা বদলে দিয়েছে। নদীর দুই তীরে আলো জ্বলতে থাকে। স্বামীটি তার ঘরের মুরগির কথা আর বাচ্চা শুয়োরের কথা ভাবতে থাকে। এই সব ছোট্ট প্রাণীগুলি হচ্ছে তার আপনজন, তার বন্ধু—সে এসেছে তার স্ত্রীর কাছে কিন্তু নিজের ঘরকে দূরে ফেলে।

নিঃসঙ্গতার একটা ক্ষীণ অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে—সে আর কিছু চায় না, শুধু ঘরে ফিরে যেতে চায়।

কিন্তু ফিরে কি সত্যিই যায়? তা যায় না। দশ মাইল দূরে তার বাড়ি, পথে আছে শেয়াল, বন-বেড়াল আর পাহারাদার সৈনিকের দল। এই সমস্ত বিরক্তিকর বস্তু। বেচারার ফিরে যাবার ইচ্ছে যতই হোক ফেরবার কোনো উপায় নেই। যে-বুড়িমার হাতে নৌকোর ভার সে তাকে নিমন্ত্রণ জানাবে রাতে "সান্ ইউয়ান কোয়ান" থিয়েটারে যেতে। তারপর বুড়িমার সঙ্গে বসে বসে সে "চার সাগরের বসন্ত"-এ খানিক চা খাবে। এ-ছাড়া এত দূরে শহরে যখন এসেছে তখন শহরের বাতি আর রাস্তায় লোকের ভিড় এটাও দেখা দরকার। কাজেই পাটাতনের ফাঁকে যেখানে সে বসেছিল সেখানেই বসে থাকে, নদীর দৃশ্য উপভোগ করে আর কতক্ষণে নৌকোর বুড়িমা ফুরসৎ করে তার কাছে আসতে পাবে তারই জন্যে অপেক্ষা করে। অবশেষে যখন তীরে যাবার সময় হয়, আস্তে আস্তে উঠে নৌকোর গা বেয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে। পাড় থেকে যখন তার ফেরবার সময় হবে ঠিক ঐ রকম করেই আবার সে চুপি চুপি ফিরে আসবে অতিসাবধানে, যাতে একটুও শব্দ না হয়, যাতে বিছানায় শুয়ে ঐ যে লোকটা চণ্ডু খাচ্ছে সে চটে না ওঠে।

শোবার সময় হলে সে খানিক বসে বসে 'সিলিয়াং' পাহাড়ে ঘড়ি-ঘরের

ঢাকের শব্দ শোনে, তারপর কাঠের দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে দেখে নেয় যে অতিথিটা তখনও সেখানে রয়েছে! কিছু না বলে সে একটা নতুন তোষকের উপর গা মেলে শুয়ে পড়ে। মধ্যরাত্রে যখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে অথবা তখনও আধঘুমন্ত অবস্থায়, তখন তার স্ত্রী একটুখানি ফাঁক পেয়ে পাটাতনের তলায় গুঁড়ি মেরে ঢুকে শুধোয়, "মিছরি খাবে নাকি?" বৌ কিনা, স্বামী যে মুখে এক টুকরো মিছরি রাখতে কত ভালোবাসে তা সে ভোলে কেমন করে? স্বামী বলে, সে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর মিছরি আগেই খেয়েছে। তবু তার স্ত্রী কয়েকটা মিছরি তার মুখের মধ্যে গুঁজে দেয়। তারপর সে নিজের কাছেই কেমনধারা একটা লজ্জা পেয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এদিকে স্বামীটি মিছরি চুষতে চুষতে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে; পাশের ঘরে তার স্ত্রী যে এক অতিথিকে সেবা করছে তাতেও বিন্দুমাত্র আপত্তি করে না।

এমনি স্বামী গ্রামে অনেক আছে। এইসব গ্রামে জন্মায় এই ধরনের জোয়ান মেয়ে আর সৎ বিশ্বাসী স্বামী। মেয়েরা আসে তাদের শরীর বিক্রি করতে, পুরুষরা ভালো করেই জানে এই ব্যবসাতে লভ্য কেমন হয়। তারা বুদ্ধিমান। স্ত্রীদের উপর তাদের অধিকার বজায় রইল; ছেলেপুলে যদি জন্মায় সে-ও তাদের সম্পত্তি আর মেয়েদের রোজগারের অংশবিশেষ তো তারা পাবেই।

নদীর তীরে নৌকোগুলি বাঁধা থাকে। এত নৌকো যে বাইরের লোকের পক্ষে গুণে তা শেষ করা শক্ত। একমাত্র যিনি জানেন যে কতগুলি নৌকো আছে এবং যিনি প্রত্যেকটি নৌকো এবং তার অধিবাসিনীকে চেনেন তিনি হচ্ছেন বুড়ো জল-সরিফ।

লোকটির একটি মাত্র চোখ। লোকে বলে তিনি তাঁর যৌবনে, একটা লোককে খুন করেছিলেন, সেই মারামারিতে তাঁর একটি চক্ষু যায়। কিন্তু মানুষ দু-চোখ দিয়ে যা দেখতে পায় নি তাঁর এক চোখ তাই দেখেছে। সমস্ত নদীর বাসিন্দা তাঁর উপর নির্ভর করে। ছোটো ছোটো নৌকোগুলির ওপর তাঁর যে-কর্তৃত্ব এবং প্রভাব স্বয়ং চীন-সম্রাটেরও অত প্রভাব চীন মহাদেশের ওপর নেই।

যখন নদী ফেঁপে ওঠে জল-দারোগার ব্যস্ততা তখন চরমে ওঠে। সর্বত্রই তাঁকে দেখা-শোনা করতে হয়; কোথায় কোন নৌকো থেকে বাপ-মা চড়ায় গেছে তাদের বাচ্চাকে ফেলে, তাই বাচ্চাটা দুধের জন্যে কাঁদছে; কোন

নৌকোয় ঝগড়া বেধেছে ; এ-ছাড়া কোন নৌকোয় দেখবার কোনো লোক নেই বলে ভেসে বেরিয়ে যাবার মতো হয়েছে এ-সব তাঁর জানা দরকার। আজকে অবশ্য নদীর তীরের একটা ব্যাপারে সমস্ত নদীর জীবন আলোড়িত। ছোটো ছোটো তিনটে ডাকাতি হয়ে গেছে ডাঙায়। পুলিশ বলেছে তারা প্রত্যেকটি জায়গা তল্লাস করেছে; এমন কি জমির উপর যত ফাটল আছে, সেখানেও। কিন্তু তবুও হৃত-জিনিশের কোনোই সন্ধান তারা পায় নি। পায় নি তো পায় নি কিন্তু সেই কারণে জল-সরিফের চোখে আজ আর ঘুম নেই। পুলিশে তাঁকে খবর পাঠিয়েছে। যে-পুলিস সব সময় মিথ্যে কথা বলে তারাই তাঁকে আদেশ করেছে আজ মধ্যরাত্রে সশস্ত্র জল-পুলিসের সঙ্গে হাজির থেকে তিনি যেন নৌকোগুলিতে তল্লাস করান।

খবরটা তিনি পেয়েছেন সকাল বেলা। সারাদিনের মধ্যে তাঁর আজ অনেক কিছু করবার আছে। যে-সব লোকেরা তাঁকে প্রায়ই ভালো মদ আর ভালো মাংস খাইয়েছে তাদের প্রতি তাঁর কর্তব্য-পালন করতে তিনি আজ কৃতসংকল্প। সুতরাং তিনি নদীর ধারে গিয়ে প্রথম নৌকো থেকে শেষ অবধি প্রত্যেক নৌকোয় উঠে কিছু কিছু গল্প করেন। তারপর খোঁজ করেন নৌকোয় কোনো বাইরের লোক আছে কিনা।

জল-সরিফের পদে যাঁরা নিযুক্ত হন তাঁরা সাধাবণতঃ জলের অধিপতি হয়ে বসেন। জল সম্বন্ধে সব কিছু তাঁরা জানেন। জল-সরিফ আসলে এক সময়ে জলেই বাস করতেন এবং যে-কাজ করতেন তা আইন এবং সরকারি কানুনের বহির্ভূত। সরকারি কর্মচারীরা ঠিক এঁদেরই কাজে লাগান নদীর কাজকর্মে নিযুক্ত করে। তবে বয়েস বেড়ে চলে। পৃথিবীরই নানা ভাগ্য পরিবর্তন হয়, জল-সরিফের পরিবার বৃদ্ধি হয়, মদ খাওয়াও হয় অনেক, তারপর একটা সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন লাভ করে অবশেষে তিনি জগতের মাঝে সন্মানার্হ শান্ত শিষ্ট অধিবাসী হিসেবে দাঁড়িয়ে যান। জল-সরিফ সরকারকেও সাহায্য করেন আবার নৌকোর মানুষদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ বন্ধু-ভাব রাখেন। এইভাবে তিনি নদীর উপর একটা নৈতিক ব্যবস্থার পত্তন করেন। সরকারি কর্মচারীরাও তাঁকে যেমন খাতির করেন তেমনি বহু বারবণিতা তাঁকে বাবা বলে ডাকে।

জল-সরিফ একটা তক্তার উপর দিয়ে লাফিয়ে একটা নতুন রং-করা নৌকোর সামনের দিক দিয়ে নৌকোয় উঠছিলেন। নৌকোটা বাঁধা ছিল একটা "পা ঝোলা" বাড়ির নিচে। সেই বাড়িতে আছে একটা দোকান। সেখানে পদ্মবীজ

বিক্রি হয়। চারিদিক চুপচাপ। তিনি জানেন নৌকাটা কার। নৌকোতে উঠেই তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন “ফুলবৌ !”

কোনো উত্তর নেই। মেয়েটিও আসে না, বুড়িও বেরিয়ে আসে না। জলসরিফ এ-সব বোঝেন, তিনি ভাবেন, এই সকালেই কোনো ছোকরা এসে জুটেছে নৌকোতে, কাজেই তিনি সেইখানেই দাঁড়িয়ে খানিকটা অপেক্ষা করেন।

তারপর তিনি আর একবার ডাকেন। বুড়ির নাম ধরে ডাকেন, ‘উতু’র নাম ধরে ডাকেন। ‘উতু’ হচ্ছে নৌকোর ছোট্ট ঝি-টি। রোগা মুখ, গলার স্বর খ্যানখেনে, অন্য সকলে বাজারে চাল কিনতে গেলে সে সবসময় নৌকোয় থাকে। চাল কিনে তারা ফিরে এলে উতু ভাত ফোটায়, প্রায়ই মার খায়, আর একটুতেই কাঁদে। কিন্তু উতু-র কাছ থেকেও কোনো সাড়া আসে না। তাঁর মনে হয় কুঠ্‌রির মধ্যে থেকে কিসের যেন একটা শব্দ আসছে, যেন মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ। সবাই যে পাড়ে গেছে তা তো মনে হয় না, সবাই যে স্বপ্নে বিভোর তা-ও বোধ হয় না। কাজেই তিনি নিচু হয়ে কুঠ্‌রির দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন এবং অন্ধকারের দিকে ফিরে বলেন—“কে ওখানে ?” কিন্তু তবুও ভিতর থেকে কোনো উত্তর আসে না।

তিনি চটে উঠে এইবার উঁচু গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন—“কে ওখানে ?’

“আমি !” একজন পুরুষ মানুষেব গলা ভিতর থেকে শোনা যায়। গলাটা তাঁর অপরিচিত। ভীত ত্রস্ত স্বর। সেই স্বর বলতে থাকে—“এরা সবাই পাড়ে গেছে।”

“সবাই পাড়ে গেছে, অ্যাঁ ?”

“হ্যাঁ, ওরা……”

তার কেমন মনে হয়, এই ধরনের জবাবে আগন্তুককে চটানো হবে ; আগন্তুকের জন্যে তার হয়তো কিছু করা দরকার। লোকটা তাই অন্ধকারের মধ্যে থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসে ; বেরিয়ে এসে পালের দড়িটা মুঠিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে উঠে উপরের দিকে আগন্তুকের পানে ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকায়। বেচারা লজ্জা পায় আর ভয় পায়। কী যে করতে হবে জানে না।

প্রথমেই তার চোখে পড়ে একজোড়া প্রকাণ্ড লম্বা শুয়োরের চামড়ার বুট জুতো, মনে হয় পার্সিমন তেল-মাখানো। জুতো জোড়ার উপরে চোখে পড়ে নরম হরিণের চামড়ার খয়েরি রং-এর নানা পকেটওয়ালা একটা কোমরবন্ধ আর এক জোড়া লোমশ হাত, তাতে প্রকাণ্ড একখানা সোনার আংটি। এর উপরে

সে লক্ষ্য করে একটা চওড়া মুখ যেন ছোটো ছোটো অসংখ্য কমলালেবুর খোসা দিয়ে তৈরি। লোকটিকে খরিদ্দার ভেবে সে অত্যধিক নরম স্বরে খানিকটা খোসামোদের ভাণ করে শহুরে লোকদের অনুকরণে কথা কইতে থাকে ; বলে —"হুজুর দয়া করে আসন গ্রহন করুন। ওরা শীঘ্রই ফিরবে।"

তার কথার ঢং-এ আর তার মাড় দেওয়া কাপড় পরবার ধরনে সরিফ তখনই ধরে ফেলেন যে এ-লোকটা সবে মাত্র গ্রাম থেকে এসেছে। মেয়েরা নৌকোয় নেই এটা জেনেই তখনই তিনি চলে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু এই ছোকরাটি হঠাৎ তাঁর ঔৎসুক্য জাগায়। তাই তিনি রয়ে যান।

পাছে সে অস্বস্তি বোধ করে তাই লোকটির দিকে তিনি পিতৃসুলভ দয়ার্দ্র দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞেস করেন, "কোথা থেকে আসছ তুমি? তোমায় তো চিনিনে।"

ছেলেটি খানিকক্ষণ ভাবে, তার মনে হয় সে-ও এই আগন্তুককে এর আগে কখনো দেখে নি। সে বলে—"আমি কাল এখানে এসেছি।"

"গমের শীষ কি বেরিয়েছে নাকি?"

"ও গম, অ্যাঁ? জল-কলের সামনে আমাদের গম? আর আমাদের সেই শুয়োরটা—আমাদের—"

হঠাৎ তার মনে হয় তার জবাবগুলো ঠিক প্রশ্নের অনুযায়ী হচ্ছে না ; মনে পড়ে, ইনি একজন শহুরে ভারিক্কি লোক, এঁর সামনে "অ্যাঁ" "আমাদের" "জল-কল" "শুয়োর" এইসব বেখাপ্পা শব্দ উচ্চারণ করা উচিত হয় নি। এই অনুচিত কাজ করে ফেলার ফলে সে আর নিজের কথা শেষ করতে পারে না।

কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে ভয়ে ভয়ে সরিফের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসতে থাকে। ভাবখানা, ওর অবস্থা বুঝে ওকে যেন ক্ষমা করা হয়।

সরিফ সমস্তই বেশ পরিস্কার বুঝতে পারেন এবং তার কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারেন যে লোকটা নৌকোর মেয়েটিরই কোনো আত্মীয় হবে। তিনি জিজ্ঞেস করেন—"ফুলবৌ কোথায় গেছে? শিগ্‌গিরই ফিরবে কি?"

এবারে স্বামীটি আগের চেয়ে আরো সাবধানে উত্তর দেয়। সে বলে "কাল এখানে এসেছি।" একটু পরে আবার বলে "কাল রাত্রে এসেছি।" অবশেষে সে জানায় যে তাকে নৌকোয় পাহারা রেখে ফুলবৌ, বুড়িমা আর উতু তিন জনে পাড়ে গেছে মন্দিরে ধুনো জালতে। তারপর আবার একবার সরিফকে বোঝাবার চেষ্টা করে কেন সে নৌকা পাহারা দিচ্ছে, সেই সময় সে বুঝিয়ে বলে যে সে হচ্ছে ফুলবৌ-এর "মরদ"।

ফুলবৌ সরিফকে সাধারণতঃ "বাবা" বলেই ডাকতো। সরিফ এই প্রথম তার "জামাই"-কে দেখলেন এবং নিজে থেকে তিনিই কুঠ্‌রির মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

কুঠ্‌রির মধ্যে ছোট্ট একটি বিছানা। তার উপর ফুল-কাটা রেশমের আর লাল ছিটের বালাপোষ পরিষ্কারভাবে পাট করা। আগন্তুক এলে বিছানার একপাশে বসতে পারে। আর, বাইরে থেকে কুঠ্‌রিটা অন্ধকার মনে হলেও ফাঁক দিয়ে যথেষ্ট আলো আসার ফলে ভিতর থেকে কুঠ্‌রিটাকে উজ্জ্বল মনে হয়।

ছেলেটি আগন্তুকের জন্যে সিগারেট আর দেশলাই খুঁজতে গিয়ে এমন ধড়ফড় করে যে বাদাম-ভরা একটা ছোটো বাটিই উল্টে ফেলে। গোল গোল চেস্‌নাট বাদামগুলো ঘরের অন্ধকার মেঝেতে চকচকে কালো সোনার মতো গড়াতে থাকে। ছেলেটি সেগুলি আবার মেঝে থেকে তুলে বাটির মধ্যে রাখতে থাকে ; আগন্তুককে যে দু-একটা দিতে হয় এ-ধারণাই তার নেই। কিন্তু তার অতিথি পরম সপ্রতিভ-ভাবে মেঝে থেকে বাদাম কুড়িয়ে দাঁতে করে ভাঙতে থাকেন আর বলতে থাকেন, এই হাওয়ায়-শুকনো বাদামগুলো খেতে বড়ো সুস্বাদু।

ছেলেটি খাচ্ছে না দেখে সরিফ বলেন—"এমন সুস্বাদু, তোমার ভালো লাগে না বুঝি ?"

"খুব ভালো লাগে। আমার বাড়ির পিছনেই একটা গাছে হয়। গেল-বছর কত যে হয়েছিল তার ঠিক নেই। সবুজ কাঁটাওয়ালা খোলসের মধ্যে থেকে এমন সুন্দরভাবে ফেটে বেরিয়েছিল যে কী বলব।" এই বলে সে একটু হাসে। ভারি খুশি হয়ে ওঠে—মনে হয় যেন নিজের ছেলের বিষয়ে কথা কইছে।

সরিফ বলতে থাকেন—"জানো, এমন বড় বড় চেসনাট বাদাম সচরাচর দেখা যায় না।"

"আমি এগুলি বেছে রেখেছি।"

"তুমি বেছে রেখেছ ?"

"হ্যাঁ, ফুলবৌ খেতে ভালবাসে কি না, তাই এ-বছর পর্যন্ত জমিয়ে রেখেছিলুম।"

"তোমাদের দেশে বাঁদুরে বাদাম পাওয়া যায় ?"

"বাঁদুরে বাদাম আবার কী ?"

সরিফ তখন বুঝিয়ে বলতে থাকেন—"উঁচু উঁচু পাহাড়ে একরকম বাঁদর থাকে। মানুষ এসে যখন তাদের গালমন্দ দেয় তারা তোমার ঐ মুঠোর মতো বড় বড় চেস্‌নাট বাদাম ছুঁড়ে মারে। লোকে এই চেস্‌নাটের লোভে ইচ্ছে করে গালাগালি দিয়ে বাঁদরদের ক্ষ্যাপায় আর বাদাম কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।"

বাদামের দৌলতে এই হাবাগোবা লোকটি একজন মনের কথা বলবার মানুষ পায়। চেস্‌নাট বাদাম সম্বন্ধে সে যা কিছু জানে সব সরিফকে বলে; চেস্‌নাট কুঞ্জে কি হয়েছিল বলে, এবং বাদামপুর বলে যে জায়গাটা আছে তার গল্প করে। তারপর চেস্‌নাট কাঠের লাঙল যে কেমন অসাধারণ মজবুত হয় তা জানায়। বেচারা কথা কইবার একজন লোক পেয়ে যেন বেঁচে যায়। আগের দিন রাত্রে সারা রাত নৌকোর কুঠরির মধ্যে মদ খাওয়া আর চণ্ডু ফোঁকা হয়েছে আর সে বেচারা পাটাতনের নিচে একরত্তি কোণে ঘাপ্‌টি মেরে কাটিয়েছে। উতু-র সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে দেখেছে উতু শুয়োরের মতো ঘুমে ঢুলছে! সকাল বেলা তার বৌ-এর সঙ্গে ঘরোয়া কথা বলবার একটা সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বৌ নাকি পাড়ে গিয়ে সাত-মাইল-সাঁকোর ওধারে যে-মন্দির তাতে ধুনো জ্বালাতে যাবে, তাই তাকে নৌকোটা পাহারা দিতে বলে গেছে। সে অনেকক্ষণ ধরে সেইখানে বসে বসে অপেক্ষা করেছে। কেউই ফেরে নি। একটু পরে সে নদীর বিচিত্র দৃশ্য দেখতে থাকে; সবই তার কাছে নতুন। নদীর দৃশ্য তাকে পীড়া দেয়। কুঠরিটার মধ্যে শুয়ে সে বন্যায় ফুলে-ওঠা নদীর কথা ভাবতে থাকে আর ভাবতে থাকে এখন যদি সে গ্রামে থাকত তাহলে তার বাঁশের জালে কত মাছ ধরা পড়ত। মাছগুলোকে ধরে তাদের কান্‌কো ফুটো করে বেতের ছিলেয় ঝুলিয়ে রোদে শুকিয়ে নিত। মনে মনে মাছগুলোকে সে গুনছিল; তার গোনা তখনও শেষ হয় নি এমন সময় নৌকোয় আগন্তুকের আবির্ভাব। হঠাৎ তার মনে হল মাছগুলো সব যেন জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

অতিথিকে দেখে ছেলেটি ধারণা করে নেয় যে ইনি গল্প-স্বল্প করতে খুবই ভালোবাসেন। এই সুযোগে তাই সে তার স্ত্রীকে যা কিছু বলতে চেয়েছিল তা সমস্তই তাঁকে বলে ফেলে।

গ্রামের খবর তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে শোনায়। বাচ্ছা শুয়োরটার স্বভাব হয়েছে একগুঁয়ে; তার নাম রাখা হয়েছে 'আহ্লেদে'; পাথরের কারিগর একটা যাঁতা কেটেছে; এই সব বলে অবশেষে বলে একটা কাস্তের গল্প। কাস্তেটা এমন একরত্তি যে জল-সরিফ বিশ্বাসই করতে পারবেন না।

"দেখুন তো একবার ব্যাপারখানা, আশ্চর্য নয় কি? আমি দিব্যি গেলে বলছি সমস্ত জায়গায় আমি সেটাকে খুঁজেছি—বিছানার নিচে, দরজার পাশে, গোলায় সর্বত্র। কোথায় লুকোনো ছিল কে জানে?. এর জন্যে ফুলবৌ-কে আমি কত বকেছি। বৌ কেঁদেছে। কিন্তু তবু জিনিশটা খুঁজে পাইনি। "ভূতে মারে ঢেলা—চক্ষু অন্ধকার"—এই আর কি! রয়েছে কি না চালের পেটিটার মধ্যে। ছটি মাস ধরে চালের পেটির মধ্যে লুকিয়ে ব্যাটা ভাত খাচ্ছে! সারা দেহে তার দগ্‌দগে ঘায়ের মতো মর্চে ধরেছে। বুঝছেন তো? কেমন করে চালের পেটির মধ্যে এলো আর ছমাস লুকিয়ে রইল বলুন তো? ওঃ এইবার মনে পড়েছে। ওটা দিয়ে আমি বাঁশের কঞ্চি চাঁছতুম। একদিন হাতই ফেল্লুম চেঁছে। রক্ত পড়ছিল ঝুঁঝিয়ে, রাগের চোটে কাস্তেটাকে দিলুম ছুঁড়ে ফেলে।…কাস্তেটাতে নদীর ধারে একটি বেলা বসে বসে শান তুলেছি; এখনও চমৎকার আছে। এখনও মাংস কামড়ে ধরতে পারে। অসাবধান হলেই রক্ত ছুটিয়ে দেবে। ফুলবৌ-কে খবরটা এখনও দেওয়া হয় নি। যা কান্নাকাটি করেছিল, নিশ্চয়ই ভোলে নি এখনও। বুঝলেন তো—খুঁজে পেয়েছি কাস্তেটাকে, হাঃ হাঃ, খুঁজে পেয়েছি।"

"তবে তো ভালোই হলো।"

"হ্যাঁ ওটাকে পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি সন্দেহ করতুম ফুলবৌ ওটাকে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারতুম না। যাক্ এখন ব্যাপারটা চুকলো। আমারই অন্যায় হয়েছে। আমি ওকে বলেছিলুম 'কাস্তে যদি খুঁজে না পাও তো পিটুনি খাবে।' তবে আমি গায়ে হাতটি ওঠাই নি। কিন্তু আমার রাগ দেখে বেচারা ভয়েই অস্থির। অর্ধেক রাত কেঁদেই কাটিয়ে দিল!"

"কাস্তেটাকে ঘাস কাটানোর কাজে লাগানো যায় না?"

"কাজে লাগানো, অ্যাঁ? বহু কাজে লাগানো যায়। এমন সুন্দর, এমন সরু কাস্তে! কী বলছেন আপনি—ঘাস কাটা? অমন একখানা কাস্তে দিয়ে সব করা যায়—আলু ছাড়ানো, বাঁশি কোঁদা, আরো কত কি! ছোট্ট জিনিশটি, কিন্তু দাম তিনশোটি পয়সা—সরেস ইস্পাত। এমন একখানা কাস্তে সবার ঘরে থাকা উচিত—বুঝছেন তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি বই কি। অমন কাস্তে সবারই ঘরে একটা করে থাকা উচিত—বুঝেছি তুমি কী বলতে চাও।"

ছেলেটি ধরে নেয় জল-সরিফ সবই বুঝেছেন। সে তখন জল-সরিফের কাছে তার মন খুলে ধরে। সে বলে যে তার আশা সামনের বছরে ফুল বৌ তাকে একটি ছেলে দেবে—এ-কথা কেবল তার নিজের বৌকেই বলা চলে এক বালিশে মাথা রেখে। এমনিভাবে সে অনেকক্ষণ কথা বলে চলে, অনেক অবুঝ খেয়ালি সব কথা। তারপর আগন্তুক যখন উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হন তখন তার মনে পড়ে এঁর নাম জিজ্ঞেস করা হয় নি তো!

"হুজুরের নামটা দয়া করে বলে যান। আপনার একটা কার্ড যদি রেখে যান তো আমি ওদের বলতে পারবো কে এসেছিলেন।"

"ওকে বলো যে একজন লম্বা মতন লোক এসেছিলেন—আমি যে-রকম বুট পরে আছি সেই রকম বুট পরে এসেছিলেন। বোলো যে আজ রাতে যেন কোনো অতিথিকে না নেয়। আর বলো যে আমি আসছি।"

"আপনি বলছেন, ওকে বলতে আজ রাতে কাউকে না নিতে। আপনি আসছেন?"

"ঠিক বলেছো। আমি আসছি। আর তোমাকে মদ খাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলুম—কারণ আজ থেকে আমরা দোস্ত।"

"হ্যাঁ, আমরা দুজনে দোস্ত।"

সরিফ তার চওড়া মোটা হাত দিয়ে ছেলেটির কাঁধ চাপড়ান, তারপর এক-লাফে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে আর একটা নৌকোতে চলে যান।

সরিফ চলে যেতে স্বামীটি ভাবতে বসে, লোকটা কে হতে পারে? এমন একজন মহাশয় ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলা তার এই প্রথম। লোকটিকে দেখে ও যেরকম অভিভূত হয়েছিল তা ওর মন থেকে কোনোদিন মুছে যাবার নয়। তারা দুজনে শুধু যে গল্প করেছে তা নয়, তিনি ওকে বন্ধু বলে ডেকেছেন, মদ খাওয়াবেন বলেছেন। সে ভাবে, ইনি ফুল বৌ-এর একজন নিয়মিত অতিথি; এর কাছ থেকে ফুল বৌ নিশ্চয় অনেক টাকা পেয়েছে। হঠাৎ তার মনটা আনন্দে ভরে ওঠে; খাটো গলায় আস্তে-আস্তে একটা পাহাড়ি গান গাইতে থাকে:

জল বেড়েছে,
মাছ আসছে বাঁধের দিকে!
বড় মাছগুলো যেন বড় বড় ঘাস-চটি।
ছোট মাছগুলো যেন ছোট ছোটো ঘাস-চটি।

আরো খানিক অপেক্ষা করে সে—কিন্তু ফুল বৌ ফেরে না—কারুর ছায়াটির পর্যন্ত দেখা নেই। ছেলেটির আবার মনে পড়ে ঐ লোকটির জমকালো চেহারা আর তার কথাবার্তা। মনে পড়ে লম্বা বুট-জোড়া চক্‌চক্ করছে, পালিশটা তেমন ভালো নয়, বোধহয় সস্তা পার্সিমন তেল-মাখানো। মনে পড়ে হলদে রং-এর ভারি আংটিটা, কত যে দাম হতে পারে বলা শক্ত। এ-ধরণের জিনিশ যার শুধু দামই আছে আর কিছু নেই, লোকে কেন যে ভালোবাসে তা ওর মাথায় ঢোকে না। লোকটির মাথা নাড়ার আর কথা বলবার কায়দা, রাজা-রাজড়ার ধরণ এই সব মনে পড়ে—এই হচ্ছে ফুল বৌ-এর টাকার দেবতা। ও আবার গান ধরে :

পাহাড়ের গর্তে কাপ্তেন
পোড়ায় কাঠকয়লা
পাহাড়ের নীচে দারোগা কুড়োয় ছাই।
ছাই পেলে রাঙা আলু বাড়বে যে ভালো ;
কেবল—
যে পোড়ায় ছাই তার মুখ হয় কালো।

তুপুরবেলায় প্রতি নৌকোয় ভাত রান্না হয়। ফুল বৌ-এর নৌকোর ভিজে জ্বালানি কাঠ জ্বলতে চায় না। জায়গাটা ধোঁয়ায় ভরে যায়, চোখ দিয়ে জল পড়ে আর হাঁচি আসে। ফিনফিনে রেশমের চাদরের মত ধোঁয়াটা জলের উপর সমান হয়ে বিছিয়ে পড়ে। বেচারা কি যে করবে ভেবে পায় না। সে শোনে নদীর ধারের সরাইখানার রসুই তার হাঁড়ার কানায় রান্নার হাতা ঠুকছে ; পাশের নৌকোর গরম কড়ায় বাঁধাকপি ছাড়া হচ্ছে ; তবু ফুল বৌ ফেরে না। ভিজে কাঠে আগুন ধরাবার কায়দা সে এখনও শেখে নি। ছোট্ট লোহার উনুনটিতে তাই আঁচ পড়ে না। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও শেষটা যখন হয় না তখন সে উনুনটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে দেয়।

খাবার কিছুই নেই। খিদে পেয়েছে। পেটে খিদে নিয়ে সে একটা বেঞ্চিতে বসে পাটাতনের উপর পা ঠুক্‌ঠুক্ করতে থাকে। তারপর একটা ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরে ঘুরে মনটাকে খিঁচড়ে দেয়। নৌকোয় যে লম্বা লোকটা এসেছিল তার চেহারা ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যেন টুকরো টুকরো কমলালেবুর খোসা দিয়ে তৈরি লাল রং-এর মুখ, যেন মদের ভাঁটিতে রক্ত গোলা। মুখে একটা দারুণ অসন্তোষের ভাব, আর ঐ টাকার গরম। তার মনের সব শান্তি

নষ্ট হয়ে যায়। মনে পড়ে ওর হুকুম, একেবারে স্বামীর মুখের উপর—"আজ সন্ধ্যেবেলা যেন কাউকে না নেওয়া হয়। আমি আসছি।" এ-কথা বলার পর ওকে মেরে ফেলা উচিত। রাঙা-আলু-খেকো মুখ দিয়ে কি রকম অভদ্রের মতো কথাটা বল্লো! কেন বল্লে এইভাবে? বলার কি অধিকার আছে ওর?

যত এইসব ভাবে তত চটে ওঠে। রাগের উপর খিদের তাড়না তার মনে আদিম বাসনার ধাক্কা তোলে। তার সরল মন চিন্তায় ভরে ওঠে।

আর গান আসে না। হিংসেয় গলা যেন শুকিয়ে যায়। সুখ আর নেই। তার চাষাড়ে মন বলে কালই বাড়ি ফিরে যাবে! তারপর আর একবার উনুন ধরাতে গিয়ে এমন ক্ষেপে যায় যে টান মেরে সমস্ত কাঠ জলে ফেলে দেয়। বলে, "কাঠের মাথায় বজ্জরপাত হোক। যা সমুদ্দুরে ডুবে মর্‌গে।"

কাঠগুলোকে অবশ্য অন্য এক নৌকোর লোকেরা জল থেকে তুলে নেয়। সে দেখে জল থেকে ভিজে কাঠগুলো ওঠানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা ঐ দিয়ে একটা উনুন ধরাতে শুরু করে। দেখতে দেখতে বেশ আঁচ উঠে যায়, ফট্ ফট্ কাঠ ফাটার আওয়াজ আসতে থাকে। নিজের চোখে এই ব্যাপার দেখে রাগের বদলে তার এমন লজ্জা পেতে থাকে যে সে ঠিক করে কেউ ফিরে আসবার আগেই বাড়ি ফিরে যাবে।

কিন্তু সবেমাত্র সে রাস্তায় এসে নেমেছে এমন সময় তার ফুল বৌ-এর সঙ্গে দেখা। উতু আর তার স্ত্রী হাত ধরাধরি করে আসছে—উতু-র হাতে একটি আনকোরা নতুন ছড়টানা দোতারা। এমন একটা চমৎকার জিনিশ ওর স্বপ্নেরও অগোচর।

ফুল বৌ জিজ্ঞেস করে "কোথায় চলেছো গো?"

"বাড়ি ফিরছি।"

"তোমায় নৌকোয় থাকতে বলেছিলুম না, শুনছো? কী হচ্ছে কি? কেউ তোমায় কিছু বলেছে নাকি?"

"আমি বাড়ি যাবো। আমায় যেতে দাও।"

"যাও বলছি নৌকোয় ফিরে।"

সে তার স্ত্রীর মুখের ভাব লক্ষ্য করে—কথার চেয়েও অনেক কঠিন, অনেক দৃঢ়। তা ছাড়া দোতারা যে তারই জন্যে কেনা তা-ও বুঝতে পারে। তাই আর গোঁয়ার্তুমি চলে না। কপালের ঘামটা হাতে করে মুছে ফেলে। "আচ্ছা আচ্ছা" বলে বিড়বিড় করে বকতে বকতে নৌকোয় ফিয়ে আসে।

একটু পরেই নৌকোর বুড়িমা ফিরে আসে হাতে কয়েকটা শূয়োরের ফুসফুস নিয়ে। বুড়ি এমন হুড়মুড় করে আসে যে মনে হয় যেন ফুসফুসটা চুরি করে পুলিশের ভয়ে পালাচ্ছে। তার গাল দুটো রক্তবর্ণ, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে। সে নৌকোয় পা দিতেই ফুল বৌ কুঠ্‌রির মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে—

"জানো গো আমার স্বামীর কাণ্ড? উনি যে নৌকো ফেলে বাড়ি পালাচ্ছিলেন।"

"সে কি—থিয়েটার না দেখেই চলে যাচ্ছিলেন?"

"রাস্তার মোড়ে ওনার সঙ্গে দেখা। আমরা তাড়াতাড়ি কেন ফিরিনি, তাই এতো রাগ।"

"সে তো আমার দোষ। ভগবান বুদ্ধের দোষ। কসাই-এর দোষ। আমারই অন্যায় হয়েছে একটা পয়সার জন্যে কসাই-এর সঙ্গে এতক্ষণ বচসা করা, আর তারও উচিত হয়নি ফুসফুস দুটোতে ঠেসে জল ভরে দেওয়া।"

মেয়েটি তার স্বামীর সঙ্গে কুঠ্‌রিতে বসেছিল, সে বলে ওঠে—"না, আমারই দোষ।" তারপর হঠাৎ সে কাপড় ছাড়তে আরম্ভ করে দেয়, এবং ইচ্ছে করেই তার লাল রংএর রেশমি মনোলোভা কাঁচুলিটা অনাবৃত করে দেখায়।

স্বামীর দৃষ্টি সেই কাঁচুলির দিকে আবদ্ধ হয়। মুখে আর কথা নেই। অবর্ণনীয় একটা কিছু তার রক্তের স্রোতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

বাইরে বুড়িমা আর উ তু জ্বালানি কাঠ নিয়ে আলোচনা করে।

"কে চাল ধুয়েছে?"

"এ কি, কে জ্বালানি কাঠ চুরি করেছে?"

"হয়তো উনি আগুন জ্বালাতেই পারেন নি…গাঁয়ের লোক কিনা, শুধু দেবদারু কাঠ জ্বালাতে জানে।"

"কালই তো আমরা এক বাণ্ডিল কাঠ খুলেছি না?"

"সে তো সবই গেছে দেখছি।"

"তাহলে যাও, নৌকোর সামনে থেকে আর একটা বাণ্ডিল নিয়ে এসো, বুঝলে?"

স্বামীটি বসে বসে সব শোনে, কিছুই বলে না, একদৃষ্টে ছড়টানা দোতারাটার দিকে দেখতে থাকে।

মেয়েটি বলে—"তাঁত দুটো লাগানোই আছে, একবার ছড়টা টেনে দেখ না।"

প্রথমটা আওয়াজ বেরোয় না। হাঁটুর উপর রেখে সে কাঠটা ভালো করে

পরীক্ষা করে দেখে। সুর বাঁধার সময় আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তার হারানো সুর ফিরে আসে। আনন্দে সে ফিক্ করে হেসে ফেলে।

খানিক পরেই সারা কুঠ্‌রিটা ধোঁয়ায় ভরে যায়। মেয়েটি তখন বলে দোতারাটা নিয়ে বাইরে আসতে; সে-ও দোতারা হাতে মেয়েটির পিছনে পিছনে নৌকোর সামনের পাটাতনে গিয়ে বসে।

ভাত খাবার সময় উতু বলে—

"সেই গানটা বাজান না—ম চিয়াং নিউ আর চীনের প্রাচীরের গানটা। আপনি বাজান, আমি গাইবো।"

"আমি বাজাতে জানি না।"

"তাই বই কি! মিথ্যে বলে আমায় ঠকানো হচ্ছে।"

"সত্যি ঠকাচ্ছি না।"

বুড়িমা বলে—"ফুল বৌ যে বল্লো, তুমি বেশ ভালো বাজাতে পারো। তাই মন্দিরের কাছে দোতারা বিক্রি হচ্ছে দেখে তোমার জন্যে কিনতে বল্লুম। কপাল জোরে বেশ সস্তায় পেয়েছি। গ্রামে তো পুরো এক ইউয়ান দিলেও মিলবে না।"

"তা বটে, কত দাম নিলো?"

"ষোলো সেণ্ট। সবাই বল্লে, দাম হিসেবে জিনিশটা ভালোই হয়েছে।"

উতু বলে ওঠে—"কে আবার বল্লে, ভালোই হয়েছে!"

বুড়িমা বিষম চটে উঠে বলে—"কে বলেছে ভালো হয়নি শুনি?"

আসলে দোতারাটা দোকানির কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসা হয়েছে; একটি কড়িও দিতে হয়নি। বুড়িমার মুখের উপর উতু তর্ক করে। বুড়িমা উতুকে গাল দেয়। ফুল বৌ হাসে। ছেলেটি ভাবে বুড়িমার বোকামিতে সবাই হাসছে, তাই সে-ও হাসিতে যোগ দেয়।

ভাত খেয়েই ছেলেটি দোতারায় ছড় টানে—নতুন যন্ত্রে চড়া আওয়াজ বেরোয়। উতু বাটি আর চপস্টিক ছেড়ে গান ধরে। বুড়িমা উতু-র মাথায় কয়েক ঘা চপস্টিকের বাড়ি দিতে সে তাড়াতাড়ি ভাত শেষ করে এঁটো বাসন জড়ো করে ডেকচি ধুতে যায়।

সন্ধেবেলা কুঠরির সামনেটায় পাল টাঙানো হয়। ছেলেটি বাজায় আর উতু গান গায়। ফুল বৌও মাঝে মাঝে যোগ দেয়। একটুকরো লাল কাগজ কেটে কেরোসিন লণ্ঠনের উপর ঢাকনা দেওয়া হয়। কুঠরির মধ্যেটা লাল

আলোয় ভরে ওঠে ; মনে হয় যেন কার বিয়ে হচ্ছে। ছেলেটির মন খুশিতে ভরে যায়। তার মনে হয় যেন সে নববর্ষের উৎসবে মেতেছে। কিন্তু তাদের এই আনন্দে হঠাৎ ছেদ পড়ে কয়েকটা মাতাল পল্টনের' আবির্ভাবে। নদীর পাড় থেকে তারা গানের আওয়াজ পেয়ে হুড়মুড় করে নৌকোয় উঠে আসে।

তারা চীৎকার করে—"কে গায়? কী নাম? পাঁচ শো দেবো। শুনতে পাচ্ছিস্ না—পাঁচ শো!" হেঁড়ে গলায় তাদের চীৎকার—মনে হয় যেন মুখে একমুখ আখরোট ভরে কথা কইছে।

গান-বাজনা হঠাৎ থেমে যায়। মাতালগুলো নৌকোর উপর পা ঠুকে তুম্ দাম্ আওয়াজ করতে থাকে। তারপর তারা চাঁদোয়াটা খোলবার চেষ্টা করে কিন্তু জোড়ের মুখটা খুঁজে পায় না।

"কালা সাজা হচ্ছে? বোবা সাজা হচ্ছে? কে ব্যাটা ভিতরে ঢুকে ফূর্তি করছে? আমি কাউকে ডরাইনে—স্বয়ং সম্রাটকেও ভয় করিনে। কি, আমি সম্রাটকে ডরাই নাকি?"

খন্‌খনে গলায় একজন বলে—"সুন্দরী! এসো বেরিয়ে—আমায় টেনে তোলো দেখি নৌকোয়।" সঙ্গে সঙ্গে পালের উপর পাথর ছোঁড়া শুরু হয়। আর ভিতরে যারা আছে তাদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হতে থাকে। ওরা ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। বুড়িমা তাড়াতাড়ি আলোটা কমিয়ে পালটা সরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি দোতারাটা বগলে নিয়ে পাটাতনের নীচে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ে। একটু পরে সে শুনতে পায় পল্টনগুলো চীৎকার করে হাঁক দিতে দিতে ফুল বৌকে আর উতু-কে এমন কি বুড়িমাকেও চুমু খেতে খেতে কুঠ্‌রির মধ্যে ঢুকছে। শুনতে পায় তারা বলছে—"কে এখানে গান-বাজনা করছিলো? ধরে নিয়ে এসো তাকে।"

বুড়িমা কোনো কথা বলতে সাহস করে না, ফুল বৌ-এরও বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। পল্টনরা চীৎকার করে গাল পাড়তে থাকে—

"বের করে আনো ব্যাটা কচ্ছপের বাচ্ছাকে। বাজাক আমাদের সামনে দোতারা। এক হাজার দেবো। জগতের শ্রেষ্ঠ বীর মং-তেও এতো উদারতা দেখাতে পারেন নি। এক হাজার দেবো—এক হাজার রাঙা আলু। যাও টেনে বের করে আনো তাকে, নইলে আগুন লাগিয়ে দেবো নৌকোয় এক্ষুনি। তাড়াতাড়ি যাও—একবার রাগলে আর মানুষ চিনবো না বলে দিচ্ছি।"

"আমরা ঘরের লোকেরা মিলে একটু আমোদ করছিলুম……"

"তোর মুখে আগুন, বেজন্মা বুড়ি। তোর বয়েস হয়ে গেছে, তোকে আমরা ছুঁতে চাইনে। যা গিয়ে দোতারা-ওয়ালাকে বল্ বেরিয়ে আসতে। আমি গাইতে চাই।" বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়, ভাব দেখে মনে হয় কুঠ্‌রির পিছনে খুঁজতে যাবে। বুড়ি এমনই ভয় পেয়ে যায় যে মুখ তার হাঁ হয়ে আসে, সে মুখ আর বন্ধ করতে পারে না। ফুল বৌ দেখে ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে দাঁড়াচ্ছে; সে এগিয়ে এসে মাতাল সৈনিকটার হাত দুটো ধরে নিজের ভরাট বুকের উপর রাখে। মাতাল এর অর্থ বুঝে বসে পড়ে। বলে—"বেশ, টাকা দেওয়া যাবে। আজ সন্ধেটা এখানেই ঘুমুবো তবে।"

সে ফুল বৌ-এর বাঁ দিকে শুয়ে পড়ে, অন্যটা ডান দিকে।

পাটাতনের নীচে ছেলেটির মনে হয় কুঠ্‌রিটা যেন হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে; সে বেড়ার ফাঁক দিয়ে চুপিচুপি বুড়িমাকে ডাকে। বুড়িমাকে ওরা আজ বিষম অপমান করেছে। বুড়িমা গুঁড়ি মেরে তার কাছে যায়। ছেলেটি এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারে না যে কি ঘটেছে।

সে প্রশ্ন করে—"কী ব্যাপার?"

"ছাউনি থেকে গোটা দুই পল্টন এসেছে, চুরচুরে মাতাল। এখনই চলে যাবে।"

"চলে যেতেই হবে। আমি তোমাদের বলতে ভুলে গেছি। আজ সকালে একজন লোক এসেছিলেন—চওড়া মতো মুখ—দেখে মনে হয় বড়ো রাজকর্মচারী। তিনি বলেছেন, আজ রাত্রে তিনি আসবেন, কোন অতিথি যেন না নেওয়া হয়।"

"প্রকাণ্ড বুট-পরা একজন লোক বুঝি? গলাটা পেটা ঘড়ির মতো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই। তাঁর আঙুলে একটা মস্ত সোনার আংটি।"

"তবে জল সরিফই বটে। কখন এসেছিলেন?"

"আজ সকালে। অনেকক্ষণ বসেছিলেন—কয়েকটা চেস্‌নাট বাদামও খেয়ে গেছেন।"

"তিনি কিছু বলে গেছেন কি?"

"বলেছেন তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। আমায় বলে গেছেন দেখতে যেন অপর কোনো অতিথি না থাকে। আমায় একপাত্র মদ খাওয়াবেন তাও বলেছেন।"

বুড়ি খানিকটা ভাবে। এ-ও কি সম্ভব যে জল সরিফ নিজেই এখানে রাত

কাটাতে চান? কে জানে, জল সরিফ হয়তো তার মতো একটা বুড়িকেই চান? ব্যাপারখানা যে কী তার মাথায় আসে না। চুপিচুপি সে কুঠ্‌রির মধ্যে ফিরে যায়, পল্টন দুটোকে জিভ বার করে ভেংচি কাটে, শূয়োর কুকুর পেড়ে গাল দেয়, তারপর আবার পাটাতনের নিচে ফিরে আসে।

ছেলেটি বলে—"তাহলে কী করবো আমরা?"

বুড়িমা মাথা নাড়ে।

সে জিজ্ঞেস করে—"ওরা কি এতক্ষণে চলে গেছে?"

"না ওরা ঘুমোচ্ছে।"

"ঘুমোচ্ছে—"

অস্পষ্ট আলোয় বুড়ি তার মুখ দেখতে পায় না কিন্তু তার গলার স্বরে তার মনের ভাব বোঝে; বলে—"চলো ভাই, পাড়ে গিয়ে কিছু আমোদ করা যাক। আজ রাতে 'সান্ ইউয়ান কোয়ান্' থিয়েটারে খুব ভালো পালা আছে—'ছিউ হু'র বৌএর সঙ্গে তিনটি ঠাট্টা'।" ছেলেটি কোনো কথা বলে না।

অবশেষে সৈনিকরা যখন চলে যায় মেয়েরা কুঠ্‌রিতে মাতাল পল্টনদের বিষয়ে কথা বলে আর হাসে। ছেলেটি কিন্তু পাটাতনের নিচেই বসে থাকে, বেরিয়ে আসতে চায় না। বুড়ি দু'বার ডেকেও কোনো সাড়া পায় না। কেন যে তার মেজাজ হঠাৎ এত খারাপ হয়ে গেল তা-ও বুঝতে পারে না। বুড়ি ফিরে এসে নোট চারটে পরীক্ষা করে দেখে—জাল নোট আর ভালো নোটের তফাৎ বুড়ির জানা। নোটগুলো ভালোই। আলোর নিচে ধরে ফুল বৌকে নোটের নম্বর ছবি এইসব আঙুল দিয়ে দেখায়, তারপর নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে শোঁকে। শুঁকে বলে নোটগুলো মুসলমান কসাই-এর দোকান থেকে এসেছে—এখনও গোস্ত চর্বির গন্ধ।

উতু পাটাতনের নিচে যায়। গিয়ে বলে—

"এসো ভাই এবার বেরিয়ে লক্ষীটি। ওরা চলে গেছে। এসো এবার আমরা গান-বাজনা করি……"

ফুল বৌ ব্যাপারটা বোঝে, উতু-কে টেনে সরিয়ে আনে।

কোনো উত্তর নেই। একটু আগেও সে আঙুল দিয়ে দোতারার তার দুটো আস্তে আস্তে বাজাচ্ছিল, এখন তাও থেমে যায়।

সবাই চুপ হয়ে যায়। বাইরে রাস্তায় তারা শোনে একটা উৎসবের আওয়াজ দূর থেকে ভেসে আসছে; ঘড়ি পেটা হচ্ছে, ঢাকের আর শিঙের আওয়াজ।

কোনো এক ব্যবসায়ীর বাড়িঁ বিয়ে। অতিথিরা এসে অভিনন্দন জানায়, তাদের ভুরি ভোজন করানো হয়, পালাগান শোনানো হয়। সারারাত ধরেই উৎসবের গোলমাল শোনা যাবে।

ফুল বৌ একা চুপিসাড়ে পাটাতনের নিচে স্বামীর কাছে যায়। একটু পরেই ফিরে আসে।

বুড়িমা বলে—"কী বলে কি ?"

ফুল বৌ মাথা নেড়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

জল সরিফের আসার আশা ওরা ছেড়ে দিয়ে যে যার শুয়ে পড়ে। বুড়িমা উতু আর ফুল বৌ কুঠ্‌রির মধ্যে শোয় ; ছেলেটি পাটাতনের নিচেই থাকে। মাঝরাতে জল পুলিশের সঙ্গে জল সরিফের উদয় হয়। বাতাসে একটা নিথর ভাব—যেন কাক-চড়াই পর্যন্ত চুপ করে গেছে। চারজন পুলিশ নৌকোর মাথায় পাহারা দেয়। ভিতরে ঢোকেন দারোগা আর জল সরিফ। বুড়িমা আলোটা উস্কে দেয় ; সে বোঝে যে ব্যাপার কিছু গুরুতর নয়। ফুল বৌ গায়ে কাপড় টেনে বিছানার উপর উঠে বসে ; আগন্তুকদের 'আপনি' 'আপনি' বলে সম্বোধন করে এবং উ-তুকে বলে চা ঢালতে। উ তু তখন স্বপ্ন দেখছিল, গ্রামে ফিরে গিয়ে জাম কুড়োচ্ছে।

স্বামীটিকে বুড়িমা ঘুম থেকে ঠেলে তোলে। সরিফকে দেখে আর তার সঙ্গে কালো কোর্তা-পরা জমকালো একজন নতুন লোক দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। মুখ দিয়ে আর রা সরে না—আবার যে কী ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারে না।

পুলিশের দারোগা বলেন—"এ কে ?"

সরিফ জবাব দেন—"ফুল বৌ-এর স্বামী। গ্রাম থেকে সবে এসেছে।"

ফুল বৌ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—"ধর্মাবতার, মাত্র কাল এসে পৌঁচেছে।"

দারোগা ছেলেটির দিকে দেখেন, তারপর মেয়েটির দিকে তাকান ; মুখে কিছু বলেন না। বোঝেন সরিফ যা বলেছেন তা সত্যি। তিনি কুঠ্‌রির এদিক ওদিক খুঁজতে থাকেন, যতক্ষণ না একটি ছোট্ট বাটিভরা চেস্‌নাট বাদামের উপর নজর পড়ে। সরিফ একমুঠো চেস্‌নাট বাদাম তুলে দারোগার কোর্তার প্রকাণ্ড পকেটের মধ্যে ভরে-দেন। দারোগা হেসে ওঠেন।

একটু পরে তাঁরা অন্য নৌকোয় তদন্ত করতে চলে যান। বুড়িমা পাল টেনে দিচ্ছিলো, এমন সময় একজন পুলিশ ফিরে এসে বলে—

"বুড়িমা, ফুল বৌকে বলো এখনি দারোগা আসছেন, তাকে আরো একটু ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবেন বলে—বুঝতে পেরেছো?"

"শিগ্‌গীরই আসবেন তো?"

"তদন্ত শেষ হলেই আসবেন।"

"ঠিক তো?"

"আমি কি কখনো মিথ্যে বলেছি?"

স্বামীটি বুড়ির আনন্দ দেখে অবাক হয়ে যায়। কারণ, ফুল বৌকে আবার দ্বিতীয়বার কেন যে পুলিশে পরীক্ষা করতে আসবে তা ও ভেবেই পায় না। দেখে ফুল বৌ বিছানায় শুয়ে পড়লো। সন্ধ্যের রাগটা এখন আর নেই; ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলে বৌ-এর সঙ্গে বিছানার ধারে বসে দুটো কথা বলতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কথা না বলে সে চুপচাপ বসেই থাকে।

বুড়ি তার মনের ভাব বোঝে, ওর বাসনাটা কী তা বোঝে, আরো বোঝে ওর নিষ্পাপ সরলতা। ফুল বৌকে তাই শুধু বলে রাখে—"দারোগা শিগ্‌গীরই ফিরে আসছেন।"

ফুল বৌ তার ঠোঁট কামড়ায়। কোনো কথা বলে না, আনমনা হয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবে।

পরদিন বাড়ি ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে ছেলেটি খুব ভোরে ওঠে। চুপচাপ, মুখে কথা নেই। চটিটা পায়ে দিয়ে নেয়, তামাকের ডিবেটা পকেট হাতড়ে খুঁজে বার করে রাখে। সব কিছু গুছিয়ে যখন সে একেবারে তৈরি হয় তখন নিচু তক্তপোষটার একপাশে গিয়ে বসে। দেখে মনে হয় যেন কি বলবার আছে, অথচ কিছুই বলতে পারে না।

তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করে—"কাল না তুমি সরিফকে বলেছ তাঁর ওখানে তুমি দুপুরে খাবে?"

সে কোনো জবাব দেয় না।

"তিনি শুধু তোমারই জন্যে ভোজের আয়োজন করেছেন।"

"আর তোমাকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে চান, যাবে না?"

"................................"

"মান থিয়েন হুংএর মাংসের গোল্লা, দুপুর হলে তবে মাংসের হাঁড়ির ঢাকনা তোলা হবে—যা তুমি পছন্দ কর।"

তবুও উত্তর আসে না। সে যাবেই।

ফুল বৌ-এর ভারি খারাপ লাগে। সে বেরিয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ নৌকোর সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ফিরে এসে কাল রাত্রের পল্টনদের দেওয়া নোটগুলো পকেট থেকে বার করে; বার করে গুণে সেগুলোকে আঙুলে করে পাকিয়ে স্বামীর বাঁ-হাতে গুঁজে দেয়। সে কোনো কথা বলে না। ফুল বৌ ভাবে সে বুঝি আরো টাকা চায়, তাই বলে—"বুড়িমা, সেই তিনটে নোট যা তোমায় দিয়েছিলুম, কোথায় সেগুলো?" বুড়ি টাকাটা ফিরিয়ে দিলে সেগুলিও স্বামীর হাতে গুঁজে দেয়।

কিন্তু স্বামীটি মাথা নেড়ে নোটগুলো মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ছোটো ছেলের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। উতু আর বুড়িমা দেখে গতিক সুবিধের নয়; তারা পাটাতনের নিচে সরে পড়ে। উতু ভয় পেয়ে যায়। এত বড়ো ধাড়ি একটা পুরুষ মানুষ যে এমন করে কাঁদবে এটা তার ভারি আশ্চর্য লাগে। উতু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে কুঠ্‌রির কড়ি থেকে দোতারাটা ঝুলছে। ওর ইচ্ছে হয় একটা গান ধরে, কিন্তু গাইতে পারে না।

জল সরিফ যখন তাঁর নিমন্ত্রিতদের খাবার জন্যে ডাকতে আসেন, এসে দেখেন নৌকোয় খালি উতু আর বুড়িমা রয়েছে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করে জবাব পান স্বামী-স্ত্রী অতি প্রত্যুষেই গ্রামে ফিরে গেছে।

বন্যা

তিং লিং

(১৯০৫)

চীনা লেখিকাদের মধ্যে তিং লিং-এর খ্যাতিই বোধ করি সব চেয়ে বেশি। তিং লিং ছদ্মনাম এঁর আসল নাম হচ্ছে চিয়াং পিং-চ্র। জাপানেও এঁর লেখার যথেষ্ট পাঠক আছে।

হুনান্-এর লিলিং সহরে তিং লিং এক দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন এবং শিক্ষার জন্যে তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল।

তিং লিং তাঁর বিপ্লবী স্বামী হু ইয়ে-ফিন ও সেন্ ৎসুং-ওয়েন কিছুদিন শাংহাইএ একত্র বাস করতেন। এই বিখ্যাত ত্রয়ী তখনকার দিনের বহু আলোচনার বস্তু ছিলেন। হু ইয়ে-ফিন কুয়োমিনতাং সরকারের হাতে নিহত হবার পর সেন ৎসুং-ওয়েন তিং লিং-এর সঙ্গেই থাকতেন এবং তিনি বহু চেষ্টা করেছিলেন তিং লিংকে চরমপন্থীর পথ থেকে ফেরাতে। কিন্তু তিনি সক্ষম হন নি।

যুদ্ধের সময় চীনা কমিউনিষ্ট সরকারের রাজধানী ইয়েনান-এ এসে তিনি রচনাকার্য স্থগিত রেখে কেবল জনসাধারণের কাছ থেকে এবং যুদ্ধের ভিতর থেকে মাল মশলা সংগ্রহ করেছেন ভবিষ্যতের রচনার জন্য। চীন দেশে কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হবার পর তাঁর বহু লেখা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং বহু পুরস্কার লাভ করেছে। সম্প্রতি তিনি রাজনৈতিক কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়ে চীন দেশে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন।

পাশের গ্রাম থেকে যে সব আত্মীয়েরা এসেছিলেন তাঁরা বাড়ির সবার সঙ্গে বসে এক মনে কান পেতে শুনছিলেন। ঘরটা ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসে; খোলা দরজার বাইরে, খোড়ো চালের নীচে একটা ঝাপ্‌সা নীল রেখার মতো চাঁদের আলো পড়ে। পাঁচ বছরের লাও ইয়াও মায়ের কোলে তার সদ্য কামানো মাথা রেখে শুয়ে; অন্য সকলের সঙ্গে তারও খুদে কানদুটো উৎকর্ণ। কেন যে সে শুনছে তা তার জানা নেই, কি শুনতে পাবে তাও সে জানে না, কিন্তু এটা পরিস্কার যে ঠিক এই সময়টিতে চুপ করে শোনাই হচ্ছে একমাত্র কাজ!

কাছাকাছি কোথায় একটা কুকুর ডেকে ওঠে। এলোমেলো বাতাসের খস্‌খস্ শব্দ। ঐ যে শী শী শব্দটা ওটা বোধহয় গাছের ভিতর দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার ধ্বনি……

"ঐ শোনো! কিছু শুনতে পাচ্ছো না? চুপ!"

শব্দ একটা আসছে বটে। দূরে কে যেন ক্ষীণ স্বরে কাঁদছে।

"কে যেন চীৎকার করছে ওখানে।"

"বাজে কথা! কই আমি তো কিছু শুনতে পাই নি।"

"না না, নিশ্চয় ওটা কারুর গলা!"

খানিকক্ষণ কেউ আর কোনো কথা কয় না। তারপর খানিকক্ষণ সবাই উস্‌খুস্‌ করে। বুড়ি ঠাকুমা, আধ-কালা মানুষ, মাথা-ভরা টাক, তিনিও হঠাৎ দন্তহীন মাড়ি দিয়ে বিড়বিড় বকতে স্বরু করেন:

"হে দয়াময় ঈশ্বর, কি করি আমি? গনৎকার হাত দেখে বলেছিল এ-বছর আমার ফাঁড়া আছে। এখানে যেন বান এসে না পৌছয় ভগবান! বরাবর একটা না একটা কিছুতে আমি বেঁচে যাই। কি সব ভয়ানক বিপদই না আমার জীবনে গেছে! হ্যাঁ কেউই অবশ্য নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারে না—কিন্তু এ-ও বলছি মরতে আমি ডরাই নে! বুড়ো হাড়ের যাবার সময় হয়েছে; কেবল ছেলে পিলে নাতি পুতিদের ছেড়ে যাওয়া এইটেই যা শক্ত।"

"ছেলেই থাক আর নাতিই থাক যার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। ভাগ্যের দেবতা সবাইকে সমানভাবে দেখেন, সেই হচ্ছে আসল বিপদ।"

"ওরে বাপ-খেকো ছেলে! চুপ কর! বুড়ি যদি শুনতে পায়!"

"বুড়ির উচিত এখন ঘুমতে যাওয়া। ওলো দিদি! ঠাকুমাকে বিছানায় শুইয়ে দাও। এতটা পথ হেঁটে নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে!"

বোনটি বুড়ির কানে চীৎকার করে বলে—"ঘুমোবার সময় হয়েছে ঠাকুমা।"

"দূর! আমি আজ ঘুমচ্ছি নে। ওদের জন্যে বসে থাকবো। কখন ফিরবে ওরা?"

"কে জানে কখন? ওরা কোথায় যে গেছে তাও জানি না। একটু শব্দও তো কানে আসে না আর। আজ রাত্রে কি কিছু ঘটবে বলে মনে হয়?"

"তা আমি কি করে বলব? স্বয়ং বুদ্ধও বলতে পারেন না।"

"বুদ্ধ? চুলোয় যাক তোমার বুদ্ধ! আমাদের পিছনে কেন সে লেগেছে বলো দেখি? বন্যা, বন্যা, কেবল বন্যা, আর এই বানের পিছনে প্রতি বছরই এই বুদ্ধ! জাহান্নমে যাক। এই বুদ্ধকে উচ্ছন্নে দেবার জন্যে আমাদের সকলের এক হওয়া উচিত। কেন আমরা বাঁধ মেরামত করবো? কিসের জন্যে এই

রাতের পর রাত পাহারা? চলে আয় রক্তের স্রোত, আয় চলে! দে এই বুদ্ধটাকে ডুবিয়ে! আমাদের এই শত্রুটাকে!”

“চুপ করো তা ফু। যে মূর্তি তোমাকে দেখতেও পায় না তাকে নিয়ে এত উত্তেজনা কেন?”

“ও কথা ঠিক। কিন্তু ও যা বলছে তাও তো সত্যি। বন্যা, বন্যা, আর বন্যা, প্রতি বছরই তো হচ্ছে।”

“এ বছরটা অন্য বছরের থেকে অনেক খারাপ হবে, দাঁড়াও না দেখতেই পাবে।”

কেউ আর চুপ করে শোনে না। সাধারণতঃ এই সব বলিষ্ঠ চাষী-মেয়েরা বেশি কথা বলে না। কিন্তু এই দারুণ উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা আজ ওদের মুখরা করে তুলেছে, ওরা সকলে একসঙ্গে কথা কইতে শুরু করে দেয়। বড় ছেলেরা, যাদের বাঁধের কাজে যেতে দেওয়া হয়নি তাদের বাপদের সঙ্গে, তারাও পাল্লা দিয়ে যোগ দেয়, আর এই সব-কিছুর মধ্যে ঠাকুমা নিজের সঙ্গে কথা বলে চলেন—

“কত বছর আগে মনে নেই—তখন আমি ঐ খুদে লুং-আরটার মতন—আমাদের কাদা আর গাছের ছাল খেয়ে থাকতে হয়েছিল! সত্যি বলছি! আমি আমাদের পরিবারের কতজনের কাছে যে একের পর এক গেছি! আমাদের সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকে। অত বড় দল আমাদের প্রতিদিন ছোট হতে থাকে—দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি আর সব রকমের ক্লেশ—সর্বত্র মড়ার ছড়াছড়ি! কাক আর কুকুরের ভুরি ভোজনের পালা! কত মরেছিলো? তা জানি না—প্রথমে আমার ছোট্ট ভাইটি গেল—মায়ের শুকনো মাই টানতে টানতে। তারপর গেল আমার বোন, কাকিমা, মিয়েন কাকা……আমার বয়েস তখন সাত বছর। আমিই কোনো রকমে টিকে রইলুম; আজ অবধি আছি! বিশ্বাস করবি কি তোরা? ভিখিরি হয়েছিলুম তবু না খেয়ে মরিনি! ক্রীতদাসী হয়েছি, বেদম প্রহার সয়েছি! আর আজ আমার বয়স ষাটেরও উপর—পঁয়ষট্টি—তবু এ সব দিন আমার পরিষ্কার মনে আছে। ঐ লুং-আর-এর মতো ছোট্টটি, মাথায় চড়াইএর ল্যাজের মতো ছোট্ট এক বেণী……আমার জীবনে সেই প্রথম বন্যা, তারপর থেকে……”

ঐ টেকো বুড়ির সঙ্গে তুলনাটা লুং-আর-এর মোটেই পছন্দ হয় না। বুড়ির নীরস ঘ্যান্‌ঘেনে বাক্যস্রোত চলতে থাকে; লুং-আর কেমন যেন ভয় পেয়ে

আস্তে আস্তে ঘরের এ পাশ থেকে ও পাশে তার ভাইএর কাছে যায়। লাও ইয়াওর চোখ দুটো আধ-বোজা, কিন্তু সে দু কান খুলে রাখে। ঠাকুমা যেমন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে চলেন ওর দৃষ্টি ঘরের ঝাপ্‌সা মূর্তিগুলোর একটার থেকে আর একটার দিকে ঘোরা ফেরা করে। তারপর আবার বুড়ির দিকে ওর দৃষ্টি ফেরে; দেখে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির তোব্‌ড়ানো গাল একবার ফুলছে আবার চুপসে যাচ্ছে। ভারি অদ্ভুত দেখতে—লাও ইয়াওর হাসতে ইচ্ছে যায় কিন্তু কি যেন এক অনুচ্চারিত আদেশ তার মুখ বন্ধ করে রাখে। না, ঠিক আদেশ নয়, বাতাসে ভেসে বেড়ায় যেন এক সতর্কতার বাণী। যাই হোক ও হাসতে পারে না।

দুম্-দাম্! বন্দুকের আওয়াজের মতই চমক লাগানো শব্দ, কিন্তু খুব সম্ভব কেউ কোনো একটা কিছুতে ধাক্কা দিচ্ছে; অথবা হতেও পারে একটা চায়ের পেয়ালা মাটিতে পড়ে গেল। সবাই হঠাৎ চুপ করে যায়, বুকটা হিম হয়ে আসে, ঘরের মধ্যে পরিব্যপ্ত হয় একটা ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। তখন আবার ওরা বাইরে বাতাসের শন্‌শন্ শব্দ শুনতে পায়, আর শুনতে পায় ঠাকুমা নিজের মনেই বক্‌বক্ করে চলেছেন:

"কার দোষ? কে বলতে পারে? আমার স্বামী ভালো লোক, বিশ্বাসী এবং নির্ভরযোগ্য—ছেলেটিও ঠিক ওঁরই মতন। একদিনের জন্যেও দুজনের কেউ কুঁড়েমি করে বসে কাটায় নি! কিন্তু তবু দুজনেই তো মারা গেল। কেন? এ কি বিচার? স্বর্গে ভগবান কোথায়? আমার কথা ছেড়ে দাও—আমার আর ক'টা দিনই বা আছে? কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষরা, তোমাদেরও সকলেরই কপালে তো এই? তবুও তোমাদের বোধ করি আশা আছে, আমি যখন ছোট ছিলুম আমারও যেমন ছিল। পৃথিবী যাবে উল্টে, উপরে যা ছিল তা আসবে নিচে নেমে আর নিচের জিনিস উঠবে উপরে! নিরর্থক স্বপ্ন! এই বলে দিলুম, সাধুতা হচ্ছে বোকামি⋯⋯তারপর আমি মরে গেলে? তারপর কি?—পৃথিবী ঠিক আগেরই মতো চলবে—কেবল তিতো থেকে আরো তিতো!"

"রেখে দাও! তিতো থেকে আরো তিতো! যখন একেবারে নিম তিতো হয়ে যাবে তখন তো স্বাদ বদলাবেই! দেখনা—"

বাইরে একটা কুকুর চীৎকার করে ওঠে, তীক্ষ্ণ শব্দটা কুঁড়ের মধ্যে খানিক কম্পিত হয়ে মাটির দেয়ালের গায়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। কুয়াসা-ধূসর রাতের মধ্যে

থেকে ছায়ার মতো একটা মূর্তি পুকুর ধারের দালচিনি গাছের পাশ থেকে বেরিয়ে আসে। দরজার ভিতর দিয়ে তাকে এইবার পরিষ্কার দেখা যায়——একজন পুরুষ। কুকুরটার নাম ধরে একবার ডেকে পরক্ষণেই সে ঘরে ঢুকে আসে।

"ও সান্-ইয়ে বুঝি? কেমন চলেছে? বাঁধের অবস্থা কী রকম? আর-ক কেমন আছে?"

"সারা বাড়িতে একটা বাতি নেই?" সে জিগেস করে "আলো কই?"

"তোমাদের ব্যাপার কি বলতো? তোমরা কি ভাবছো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে?"

"ঘরে এক ফোঁটা তেল নেই। কেবল দুটো মোমবাতি আছে। তা দেবতাদের জন্যে আলাদা রাখতে হয়েছে।"

"তারপর, কি রকম সব? আমরা তো একটু ফিস্‌ফিস্ আওয়াজও শুনতে পাচ্ছি না। বানের জল নেমে গেলো না কি?"

"নেমে যাবে? এ জল নামবার নয়! বরং আমরাই ডুববো। কেন, তোমরা ঘণ্টা শুনতে পাওনি নাকি? তাং গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ। ওখানকার বাঁধের জোর নেই, এখন আর সেগুলোকে শক্ত করবারও সময় নেই। সেটা হবে আমাশা শুরু হবার পর পাইখানা ঘর তৈরী করতে আরম্ভ করার মতো! তাং গ্রাম আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্রদ হয়ে যাবে—দেখোই না!"

"এখানকার খবর কি?"

"হ্যাঁ, কেমন চলেছে? শূয়োরগুলোকে আমরা সঙ্গে করে আনতে ভুলে গেছি। কাল কি ওগুলোকে নিয়ে আসা যেতে পারবে?"

"তা বলা বড় মুস্কিল। বন্যাটা যদি তাং গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে যায় তাহলে এখানে আমরা বেঁচে যাবো। কিন্তু আমাদের এখানে ওদের মতো অত জমী নেই, কাজেই আমাদের এখানে যদি জল আসে আমাদের তাং গ্রামে সরে যেতে হবে। মরচি দেখলে ওরা আমাদের বাধা দিতে পারবে না, কি বলো? এই তা-ফু, আর-ফু তোরা দুজনে আমার সঙ্গে চল, আমাদের আরো লোকের দরকার। চল্ আর লক্ষ্য রাখ। বাঁধে একটু ভাঙ্গন ধরলেই বাস্ আমরা সবাই খতম।" এই বলে সে দরজার সামনে এগিয়ে যায়, ঝাপ্‌সা আকাশের গায়ে তার ছায়া-মূর্তিটা ফুটে ওঠে—শক্তিমান পুরুষ, প্রশস্ত বুক, আঁটসাঁট পেশী। সে খানিক ইতস্তত করে তারপর বলে "তোমরা উত্তেজিত

হোয়ো না, উদ্বেগের কোনোই ফল নেই, বুঝেছ—হুঁ চলো এবার যাওয়া যাক। এই তা-মাও তুই-ও আসতে পারিস আর-মাও তুই ও। বয়েস এদের যেমন কম, চোখের তেজ তেমনি বেশি। লাও-ইয়াওএর শরীর ভালো না থাকলে ওর আসবার দরকার নেই।”

ওরা সবাই যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। খুসী হয় যে বুড়িটার বকবকানির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে; আর খুসী হয় বন্যা যদি নিতান্তই আসে তাহলে ওরা সেইখান থেকেই দেখবে। এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে ওরা নিজেদের ফতুয়া খুঁজতে থাকে। গ্রীষ্মকাল যদিও, তাহলেও রাতটা বেশ ঠাণ্ডা, খালি গায়ে বাইরে বেরতে ইচ্ছে করে না।

“ব্যাপারটা কি রকম? যতক্ষণ না নিজের চোখে দেখছি স্থির হতে পারছি না।”

“নিজের চোখে দেখলে আর স্থির থাকতে হবে না। শুধু একটা সীমাহীন জলের বিস্তৃতি এদিকে আর ওদিকে গর্জন করে ফিরছে। গভীর রাত্রে সেই শব্দ শুনে যদি তোমরা ভয়ে কেঁপে না ওঠ তবে আমি যেন কচ্ছপ বনে যাই!”

নির্ভীক সান্‌-ইয়ে, শক্তিমান সান্‌-ইয়ে যে স্বর্গ আর মর্ত্যের দেবতাদেরও অবজ্ঞা করে! সেই সান্‌-ইয়ে যখন ভয়ের কথা বলে তখন ভীরু মেয়ের দলের মনের আশঙ্কা আরো বেশি বেঁড়ে যায়।

“কটা বেজেছে? আমি তোমার সঙ্গে যাবো। আজ রাত্রে আমি এখানে থাকতে পারছি না; আজ বাড়িময় ভুতের আড্ডা হয়েছে। সত্যি আমার ভয় করছে! আমি যেতে চাই।”

“দূর! তুমি কি করবে? বাড়িতে থাকো। থেকে লুং-আর আর চু-চুকে দেখো। এখানটা যদি ভুতুড়ে লাগে বাইরে আরো বেশি লাগবে।”

সান্‌-মু মেয়েটি আর কিছু বলে না, আস্তে নিজের জায়গায় ফিরে যায়। তার পাশে ছোট্ট চু-চু নড়া-চড়া করে।

তা-ফু এবং আর সকলে ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসে। সেখানে ঠাণ্ডা বাতাস ওদের অভ্যর্থনা করে। ওড়না-ঢাকা চাঁদের দিকে ওরা মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে, আর দেখে আকাশের শতচ্ছিন্ন চাদরখানা তারায় তারায় ভরা। মুহূর্তের মধ্যে ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়, সঙ্গে কুকুর দুটোকে নিয়ে। দালচিনি গাছের পিছনে রাতের মলিন আবরণ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। যারা ভিতরে থাকে তাদের মনে হয় তারা পরিত্যক্ত, সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন।

বেঞ্চির যেখানটায় তা-ফু বসেছিল সেই গরম জায়গাটায় লুং-আর হাত

বোলাতে থাকে। ভাবে বাবাকে চেঁচিয়ে ডাকবে, তারপর মনে হয় বরং দাদার পিছনে পিছনে গেলেই ভালো। কোনটা যে করবে মনস্থির করতে পারে না। সে দেখেছে ওরা বাঁধের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে আর সে জানে বাঁধে খুব মজা। দিনের বেলায় সে বাঁধের ধারে গিয়েছিল, গিয়ে দেখেছিল হলদে জলের কি সুন্দর ঘূর্ণি, আর সবচেয়ে ভালো চৌকি, বাক্স, টেবিল, খাট, সুন্দর সুন্দর গালার জিনিস, জ্যান্ত মুর্গী আর কুকুর এমন কি মানুষগুলো অবধি অদ্ভুত ভঙ্গীতে কাঠের টুকরো আঁকড়ে রয়েছে অথবা ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলেছে অসাড় দেহে! দৃশ্যটা দেখে লুং-আর এত মোহিত হয়েছিল যে ভাত খাবার কথা ওর মনে ছিল না; বসে বসে কেবল নদীর দুর্দান্ত স্রোত দেখেই সময় কাটিয়েছে। রাত্রে কিন্তু নদীর প্রলোভন অতটা নয়। বিশেষ করে এই সময়টিতে ঐ ক্ষিপ্র অন্ধকার জলস্রোতের মধ্যে অনুকূল কিছু আছে বলে মনে হয় না। আর ঐ যে জিনিসগুলি একা নিঃসঙ্গে ভেসে চলেছে ওদের সম্বন্ধে মনে যেন একটা অস্থিরতা জেগে ওঠে। বুড়ি ঠাকুমা আবার শুরু করেন:

"আমার জানা আছে, আমি বলছি এসব আমার জানা। বড়লোকেরা বন্যাকে ডরায় না। ভয় আমাদেরই গরীবদের, কেননা বন্যায় ঘায়েল হই আমরাই আর আমাদের শুয়োর আর কুকুরগুলো। চাংদের বাড়িতে আমি যখন বাঁদীর কাজ করি তখনকার এক বানের কথা আমার মনে আছে! কত ভিখিরী তখন! গুনে শেষ করা যায় না—আসলে ভিখারী নয়, বুঝছো না, বন্যায় সর্বস্বান্ত হয়েছে। কিন্তু চাংদের আর কি? ছেলেবাবুরা সব 'তারকা-মিনারে' গিয়ে উঠলেন, সেখানে মদ চললো—বল্ল, বন্যার দৃশ্য উপভোগ করতে এলুম। বলবো কি চাং কর্তা সেবারে চাল আটকে রেখে ছগুণ সাতগুণ দামে বিক্রি করে লাখোপতি হয়ে গেল। এ কি বিশ্বাস করা যায়? বড়লোকের বুকে রক্তও নেই মাংসও নেই। আর আমি এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছি স্বয়ং বুদ্ধও ওদের দলে। সারা জীবন ধরে আমি দয়া ভিক্ষা করে এসেছি, কিন্তু কোনোদিন এক ফোঁটা সাহায্যও আমার ভাগ্যে জোটেনি; অথচ বড়লোকেরা সব সময় আরো বড়লোক হয়েছে। অবশ্য এটা ঠিক যে ভগবান বুদ্ধকে নিজেদের মধ্যে ধরে রাখবার মতন যথেষ্ট টাকা ওদের আছে—ঐখানেই আমাদের সঙ্গে তফাৎ—"

একটা ইঁদুর ঘরের ভিতর দিয়ে লাফিয়ে পালাতে গিয়ে কিসে লেগে একটু আওয়াজ হয়।

"বান এখনো আসেনি, এরই মধ্যে ব্যাটারা গর্ত ছেড়ে বেরিয়েছে। এই

খুদে জন্তুগুলোর বোঝবার ক্ষমতা আশ্চর্য····· অবস্থাটা তাহলে খারাপই বলতে হবে। বিশ্বাস করো আর নাই করো কিছু একটা ঘটবেই। এক সময়ে—”

পরিবারের মধ্যে গপ্পে-মেয়ে তা-নিয়াং। এই সূত্র নিয়ে কারুর অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই সে একটা গল্প জুড়ে দেয়। গল্পের কিছুটা ও কোথা থেকে যেন শুনেছিল, তবে বেশির ভাগই বানিয়ে বলতে থাকে। ছোট মেয়েরাই কেবল ওর গল্প শোনে, বড়দের মন এখন বড় চঞ্চল—তারা কান দেয় না, যদিও অন্য সময় হলে তারা ওর গল্প গিলে খায়। একটু পরেই ওকে চুপ করতে হয়। ঘরটা আবার নিঝ্ঝুম হয়ে আসে।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া ঢোকে আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা সোঁদামাটির আর টাটকা জলের গন্ধে ভরে ওঠে, আর দূর থেকে অস্পষ্ট কাদের গলা শোনা যায়। বাইরে তাকিয়ে ওরা দেখে দূরে একসারি মশাল গোল হয়ে যেন ঘুরছে যারা বাঁধ রুখছে তাদের কাঁধের উপর। দেখে তারা একটু ভরসা পায়। ওরা হচ্ছে ওদের নিজেদের লোক, শক্ত মানুষ, ওদেরই স্নেহে মানুষ, ফেঁপে ওঠা নদীর সঙ্গে বুক ফুলিয়ে লড়ছে। সেই মশালের আলোগুলি থেকে আশার স্ফুলিঙ্গ ওদের চোখে এসে লেগে ক্ষণেকের জন্যে ওদের উদ্দীপিত করে তোলে। ছোটো ছোটো আলোর শিখাগুলি ক্রমে বাঁধের একটা মোড়কে ঘুরে চলতে চলতে শেষে মিলিয়ে যায়। ওদের হাঁক ডাক শুধু একবার হাওয়ায় ভেসে এল, তারপর তা-ও আর শোনা যায় না। চাঁদের ফ্যাকাসে আলো মেয়েদের ততোধিক ফ্যাকাসে মুখের উপর পড়ে। কিছুক্ষণ বাতাস ছাড়া আর কিছুরই শব্দ শোনা যায় না, অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, মনে হয় যেন এই অন্ধকারের মধ্যে একটা রহস্যময় জীবন রয়েছে। একটু পরেই দালচিনি গাছের কাছে কুকুরের ডাক শোনা যায়, একটা মূর্তির আবির্ভাব হয়; তারপর দ্বিতীয় মূর্তি, তৃতীয় মূর্তি, এবং চতুর্থ মূর্তি! তারা কাছে এলে চেনা যায় দুটি মেয়ে, সঙ্গে দুটি শিশু।

“আমাদের দয়া করো! নতুন মাও-তান থেকে আমরা পালিয়ে আসছি।”

“নতুন মাও-তান? মাত্র পরশু দিন সেখানে বান এসেছে, তাই না?”

“হ্যাঁ বানে ভেসে গেছে। এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ কি ষাট লি পথ।”

“জায়গাটা এখানকার চেয়েও নিচু নিশ্চয়।”

“এসো ভিতরে। কাছে এসো। কি হয়েছে খুলে বলো দেখি।”

নতুন মাও-তানের মেয়ে দুটি ঘরে এসে ঢোকে। অবসন্ন ছেলে দুটি চৌকাঠের কাছেই পড়ে যায়।

“পরশু রাত্রে,—ভীষণ অন্ধকার আর ঘন বৃষ্টির মধ্যে বান ডাকল। আমাদে সমস্ত বাড়িটা যেন গলে গেল। একটি জিনিসও সরাবার ফুরসৎ পাইনি ছোটো একখানা মাটির বাড়ি, বন্যার ছোটো একটা ঢেউএর কাছে কিছুই নয় আমাদের পড়শীদের অবস্থা আরো খারাপ। শুধু তাদের বাড়ি নয়, সেই স তারা নিজেরাও! বাড়ি ছেড়ে বেরতে একটু দেরি করে ফেলেছিল, কয়েকট জিনিস সরাতে গিয়েছিল হয়তো……কাল সকালে আধ বাটি পান্তাভাত খাবা পর আমাদের আর কিছুই জোটেনি।”

“বেচারী! দেখি ঘরে কি আছে—হয়তো একটু ভাত থাকতেও পারে।”

“তোমাদের মরদরা কোথায়? কোন্ দিকে যাচ্ছ তোমরা? নতুন মাও তান কি এখনও জলের তলায়?”

“আমাদের মরদরা রয়ে গেল।”

“কি লাভ তাতে? খাবার নেই, মাথা গোঁজবার জায়গা নেই, কাপড় নেই কাজ নেই।”

“ওরা কিছুতেই ছেড়ে আসতে চাইল না। সেখানে এখন কিছু নেই জলে সমস্ত নষ্ট করেছে। কিন্তু জলের তলায় যে মাটি সে এখনও শক্ত আছে সে ছেড়ে ওরা আসবে না।”

“আমরা চলেছিলুম উ-ইয়া-সানে, সেখানে আমার ননদের বাড়ি। কি আজ সকালে শুনলুম উ-ইয়া-সানের অবস্থা আরও খারাপ। রাস্তা সব বন্ধ ভগবানই জানেন আমরা কোথায় যাবো এখন। বাড়িতে ওদের ধারণা আমর উ-ইয়া-সানেই চলেছি।” মেয়েটির বয়স অল্প, অনভিজ্ঞ, অবস্থার বিপাকে ভীষ ভয় পেয়ে গেছে। সে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে।

”আমাদের—বোধহয় ফিরে যেতে হবে।”

“কোথায়? নতুন মাও-তানে?”

“তা ছাড়া আর কি করব? এ জায়গাটা যতক্ষণ নিরাপদ—”

“নিরাপদ মোটেই নয়। আমাদের পুরুষরা সবাই এখন বাঁধে। কাল পৃথিবী কি আকার ধারণ করবেন তা কেউ বলতে পারে না!”

“কি সর্বনাশ! আমরা যদি এখানে আটকা পড়ে যাই? আর ওখা ওরা ভাববে আমরা রয়েছি উ-ইয়া-সানে……”

মেয়েটি গেঙিয়ে ওঠে, তারপর ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। বুড়ি ঠাকুমা, কা

শুনতে পান না, তিনি মুখ তুলে ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করেন, "কিসের এত গোলমাল? অবস্থ কি সত্যিই খারাপ নাকি?"

কেউ তাঁকে উত্তর দেয় না, ওঁর দিকে আসলে ফিরেও তাকায় না কেউ। সবারই বুক যেন দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, আর সবার চোখ রাতের অন্ধকারের দিকে নিবদ্ধ···ঠিক সেই সময় বড় বড় ঘণ্টাগুলো বাজতে শুরু করে।

মাঠ পেরিয়ে ঘণ্টার শব্দ আসে ঢং ঢং, বাঁধের দিক থেকে। এই গোলমেলে বিশৃঙ্খল ধ্বনি মানুষকে ঘর থেকে ঠেলে বার করে দেয়, ঘরের পোষা জন্তুদের আর মুর্গীদের দেয় জাগিয়ে, ডালে বসা ঘুমন্ত পাখিদের চমকে তোলে। সমস্ত গ্রাম জীবন্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত জগৎটাই মনে হয় যেন একটা টান করে সুতোয় বাঁধা, এই শব্দের স্পর্শেই ছিঁড়ে পড়বে। একটি মেয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়, তারপর সবাই ঘর খালি করে আসে, চলে সবাই দালচিনি গাছটার দিকে—পড়ে থাকে কেবল ঠাকুমা। উত্তেজিত জনস্রোত, শিশুদের চীৎকার, কুকুরের ডাক আর সবার উপরে শোনা যায় সেই অবিচ্ছিন্ন ঘণ্টার শব্দ। অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে পুরুষেরা হেঁকে ওঠে:

"বাঁধে চলো! বাঁধকে বাঁচাতেই হবে। কোনো পুরুষ এখন আর ঘরে বসে থাকতে পাবে না! কেউ পালাতে পারবে না! সবাই চলে এসো! বাঁধে চলো!"

"কুড়ুল আনো! মশাল আনো!"

কুকুরগুলো ক্ষেপে গিয়ে চীৎকার আরম্ভ করে, মোরোগ ডাকতে শুরু করে, ভিড়ের ভিতর দিয়ে শন্‌শনে হাওয়া এসে একদিকে এই সব শব্দ আর অন্য দিক থেকে বাঁধের উত্তেজিত লোকগুলোর গলার স্বর আর ফেঁপে ওঠা জলের গর্জন সব শব্দ মিশিয়ে দেয়। নদীর ধারে সারে সারে মশাল—শত শত লোক পাগলের মতো খাটছে।

"স্বর্গের পিতা তুমি আমাদের রক্ষা করো! অমিতাভ! বুদ্ধ, তুমি আমাদের উপর নজর রেখো! লুং উয়াং! বৃষ্টির দেবতা, জলের দেবতা! থামাও, থামাও এই বন্যা!" কে একজন হাঁটু গেড়ে এই প্রার্থনা করছে।

গ্রামের লোকেরা ভিড় করে আসে পিঁপড়ের মতো। যত ওদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, ওদের ভয়ও বাড়তে থাকে তেমনি। বাচ্চারা চীৎকার করে, কুকুরগুলো কান-ফাটা ডাক ডেকে চলে, গোলমালের মধ্যে মেয়েদের তীক্ষ্ণ রব, আর আরো বেশি শব্দ করে আরো দ্রুত ঘণ্টা বাজতে থাকে, মশালের আলো আরো বেশি জ্বল জ্বল করে ওঠে।

"বাঁধে চলো ভাই সবাই, বাঁধে চলো।"

"বাঁধকে বাঁচাও! আমাদের মানুষদের বাঁচাও! আমাদের পরিবার বাঁচাও!"

"তাড়াতাড়ি এসো ভাই! আর সময় নেই……"

"মশালগুলো তুলে ধরো! উঁচু করে ধরো!"

মাটির দেওয়াল যেখানে ভেঙে পড়েছে সেই দিকে চল্‌লো একদল লোক—অগ্নিশিখার ফুটকি দেওয়া আঁকাবাঁকা একটা চলন্ত রেখা! শীঘ্রই আর এক দল এগিয়ে যায়, তাদের পিছনে পিছনে সাহস দিতে। চীৎকার ডাকাডাড়ি ওঠে, আরো মশাল জলে উঠে অন্ধকার রাতটাকে লাল রেখা দিয়ে চিরে চিরে দেয়।

বাতাসের দমকা থেমে গিয়ে বাতাস মন্দ হয়ে আসে। ফুরফুরে হাওয়া বইতে থাকে এই উন্মুক্ত বন্য আন্দোলনের উপর দিয়ে। চাঁদ একটু সরে গিয়ে গাছ আর ফলন্ত ফসলের উপর চেয়ে থাকে, চারিদিকে ছড়ানো সবুজের উপর একটা রুপোর প্রলেপ টেনে দিয়ে।

"না, না, সান-মু! কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

"কিচ্ছু ভেবো না! এখানে আমি আর থাকতে পারছি না। আমি যাচ্ছি ওখানে, ওদের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে!"

"আমিও আসছি তোমার সঙ্গে।"

নাবাল জমি বেয়ে ওদের সবাই লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যায়, ওদের লম্বা চুল উড়তে থাকে। একটু পরে আরো একদল সরে পড়ে, তাদের পিছনে পড়ে থাকে মেয়েদের কম্পিত স্বর আর ভয়ার্ত-চক্ষু শিশুরা। গ্রামের প্রাচীরে মেয়েদের কালো কালো ছায়া চলন্ত মশালের আলোয় নাচতে থাকে। কিন্তু খুব শীঘ্রই এই ছায়ার সংখ্যা কমে যায়। একে একে মেয়েরাও কোদাল আর ঠেলাগাড়ি নিয়ে বাঁধে পুরুষদের সঙ্গে যোগ দেয়—তবু জল বাড়তে থাকে!

মাথার উপরে আকাশ নিঃসাড়ে চেয়ে থাকে, খোড়ো চালে চাঁদের আলো উপচে পড়ে। তারাগুলো ঝক্‌ঝক্ করে, মাথার উপরে আকাশগঙ্গাতেও যেন বান ডেকেছে। মৃদু মলয় বাতাস, মাঠে মাঠে ধানের শীষের লম্বা সারির ফাঁকে ফাঁকে আনন্দে ফিস্‌ফাস্ করে।

ঠাকুমা নিজের মনেই বলেন, "গনৎকার হাত দেখে বলেছিল, এ-বছর আমার ফাঁড়া আছে।"

আ আ ও

শুন শি-চেন

(১৯০৬—)

শুন শি-চেন তাঁর নানা ছোটোগল্পে চীনের গ্রাম্য জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। লু শ্যুন-এর জন্মস্থানেই তাঁর জন্ম। শিশুকালে কথকদের কাছে চীনের পুরোনো ইতিবৃত্ত শুনে তাঁর সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক হয়! খুব ছেলেবেলা থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেন এবং কৈশোর পার হবার আগেই তাঁর অনেকগুলি বই ছাপা হয়।

শুন-এর লেখা অনেকগুলি সুবিখ্যাত উপন্যাস আছে। তা ছাড়া সমালোচনা, প্রবন্ধ, জীবনী এবং পাঠ্যপুস্তক তিনি ত্রিশ বছর বয়স হবার আগেই বহু লিখেছেন।

শুন-এর বেশির ভাগ লেখাই শ্লেষ, ব্যঙ্গ, গভীর তিক্ততা এবং কঠোর কোপনতায় ভরা।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি পেইচিংএ ছিলেন। তারপর স্বচক্ষে লড়াই দেখবার জন্যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেন। আপাততঃ তিনি যে কোথায় তার কোনো খবর পাওয়া যায় নি।

ভোর থেকে সমস্ত দিন আ-আও ঘাড় নিচু করে, অসাড় দেহে ছোট্টো অন্ধকার ঘরটিতে খাটের তলায় লুকিয়ে বসে আছে, ভালো করে নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলবার সাহস নেই……

নীলচে-লাল রং-এর পাহাড়ের নিচে সুগন্ধি পাইন ও অন্যান্য গাছ ও ঘন বনের উচ্ছ্বাস যেখানে উপচে পড়েছে সেইখান দিয়ে ছোট একটি নদী বেরিয়ে এসেছে ফাকা শস্যক্ষেতের মাঝে, আর তারই পাশে এক সারে দাঁড়িয়ে সাতখানি পুরোনো বাড়ি, অধিকাংশেরই ভগ্নদশা। এই জায়গার নাম তাওগ্রাম। গ্রামীলদের কারুরই নাম কিন্তু তাও নয়। সাতখানা বাড়ির মধ্যে চারখানায় থাকতো চেন্ পরিবারের বংশধরেরা, পশ্চিম প্রান্তের বাড়িটা গৃহদেবতার মন্দিরের জন্য সংরক্ষিত, আর মাঝখানে যে নতুন এবং সুশ্রী বাড়িটি (আন্দাজ আঠারো বছর আগে গড়া) সেটি হচ্ছে ধনী চিন্-এর বসতবাড়ি।

সপ্তম বাড়িটি সকলের চেয়ে দরিদ্র। পাঁচখানি ছোট ছোট ঘর নিয়ে ওয়াং পরিবার সেখানে থাকত। এইখানেই ছিল আ-আও লুকিয়ে। এই বাড়ির আধখানা ধনী চিন্এর কাছে বন্ধক দেওয়া আছে। দু বছর আগে বুড়ো

ওয়াং যখন মারা যায় চিন্ তখন তার অন্তেষ্টি এবং শ্রাদ্ধের ভোজের জন্যে তার বিধবা স্ত্রীকে চল্লিশ হাজার মুদ্রা ধার দিয়েছিল। সেই থেকে বিধবা তার ছেলে 'খোকাভাই' আর তার মেয়ে আ-আওএর সঙ্গে সেই ছোট্ট কুটিরের নিচের তলায় থাকে—সেঃঅংশটুকু ধনী চিন্এর হাতে পড়ে নি। রান্নাঘরের পাশের ঘরটিতে—বরঞ্চ এই বললেই ভালো হবে যে রান্নাঘরেরই এক কোণে—কারণ খাটটার সঙ্গে রান্নাঘরের মাত্র কয়েকটা পাতলা তক্তার ব্যবধান—খাটের তলায় আ-আও গোপন ভয়ে তার নিঃশ্বাস রোধ করে সারাটা দিন বসে-বসে কেঁপেছে। কয়েকটা যাঁতার গোল গোল পাথর আর খালি বাঁশের ঝুড়ি রান্নাঘরের দেয়ালে ঠেস দেওয়া, সেই ঘরে এখন খুব হল্লা হচ্ছে। সেখানে চারখানি চৌকো কাঠের টেবিল, তার চারিপাশে লম্বা লম্বা বেঞ্চি সাজানো। এইগুলি যাঁরা অধিকার করে বসেছেন তাঁদের দিয়েই ছোটো ঘরখানি একেবারে ঠেসে গেছে। সবসুদ্ধ অন্ততঃ ত্রিশজন লোক, তাঁদের মধ্যে তাওগ্রামের সমস্ত পুরুষ অধিবাসিরাই যে শুধু আছেন তা নয় কাছের গ্রাম 'য়ু' ও 'লাল-পাঁচিল' থেকেও অতিথিরা এসেছেন। তাঁরা মহা উল্লাসে ভোজনে এবং পানে ব্যস্ত। অধিকাংশই হয় নীল রংএর অথবা শাদা রংএর পিরান আর ইজের পরা, পা খালি। ধনী চিন্ আর সদাগর উ লিখতে-পড়তে জানেন আর গ্রামের মোড়ল যাঁকে সবাই তাঁর বয়সের জন্যে শ্রদ্ধা করে এই তিনজনে অবশ্য সুতি কাপড়ের লম্বা জোব্বা পরে এসেছিলেন। ক্বচিৎ কদাচিৎ এই সব লম্বা জোব্বা-পরা মানুষরা এমন নিচু জায়গায় পদধূলি দেন, এবং এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তাঁরা ভালো করেই জানেন তাঁদের উপস্থিতি এই ভোজের ব্যাপারটাকে অসাধারণভাবে সম্মানিত করেছে।

খাবার আয়োজন ছিল সাদাসিধে। চারটে টেবিলের উপর বড় বড় চারটে পাত্রে মাংস, মাছ, শালগম আর সুপ্ সাজানো। পাত্রগুলি বার বার ভরে দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেক বার ভরে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় খালি হয়ে যাচ্ছে। এরপর গ্রামের মেয়েদেরও খাওয়াতে হবে। প্রত্যেকেই গো-গ্রাসে খাচ্ছে, বড় বড় মাংসের ডাঁই আর বাটি বাটি মদ। চক্ষুলজ্জার কোনো বালাই-ই নেই। এই ভোজে এঁরা যে উপস্থিত হয়েছেন তার কারণ এই নয় যে আন্তরিকতা দেখানো, এটা হচ্ছে নির্লজ্জ কন্যার মায়ের প্রতি শাস্তির ব্যবস্থা। বিধবা ওয়াং-এর স্কন্ধে ব্যয়ের গুরুভার চাপানো, তাতে কিছু এসে যায় না! এই হচ্ছে ন্যায়বিচার।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম—বাকি অর্ধেক বাড়িটা বন্ধক দিয়ে এই দুঃখী নারীকে এই অপূর্ব ভোজের খরচের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ভাবপ্রবণ মানুষরা হয়তো বলবেন যে অভ্যাগতেরা তাঁদের চপ্‌ষ্টিকএর ফাঁকে ধরে যা মুখে পুরছিলেন তা হচ্ছে বিধবা ওয়াং-এর মাংস আর রক্ত। কারণ এই ভোজের অর্থ হচ্ছে তার পক্ষে সর্বস্বান্ত হওয়া। এই ত্যাগের বদলে সে অবশ্য পারবে তার মেয়ের প্রাণ রক্ষা করতে। তার মেয়ে যে সেই পাপই করেছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এখন, এই জাতীয় পাপ করতে যদিও দুজন মানুষ লাগে কিন্তু চীনদেশের লোকাচারগত যে অলিখিত অথচ ক্ষমতাবান আইন আছে তাতে করে মেয়েটিকেই শুধু দায়ী করা হয়েছিল ; আর গ্রামের যে-কোনো লোকের হাতে অধিকার দিয়েছিল তাকে আক্রমণ, অপমান, গালাগালি অথবা হত্যা এর মধ্যে যেটা যোগ্য মনে হয় তাই করতে। সুতরাং এই ক্রুদ্ধ গ্রামবাসিদেব সম্মানরক্ষার জন্যে এবং বিশেষ করে ধনী চিন্, সদাগর উ এবং গাঁয়ের মোড়ল এঁদের কৃপা লাভ করবার জন্যে এই মহার্ঘ্য ভোজের আয়োজন করা ছাড়া আর কীই বা উপায় আছে বালিকাটির জীবনরক্ষা করার? এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যদি এমন ব্যবস্থা থাকতো যে তার নিজের মৃত্যু দিয়ে সেই অনুষ্ঠানের শেষ হবে, তাহলেও বৃদ্ধা তাই করত।

দুদিন আগে বিকেলবেলা সে তার ছেলেকে চিন্‌এর কাছে পাঠিয়েছিল। সে কুর্নিশ করে, দয়া ভিক্ষা করে শেষে ওয়াং পরিবারের বাড়ির বাকি অংশটুকু জমা দিয়ে নগদ ত্রিশ হাজারের জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে। তারপর সেই টাকা নিয়ে ছেলেটি মায়ের অনুরোধে বাজারে গিয়ে পনের সের মাংস, দশ সেরের উপর মাছ, পুরো এক বস্তা শালগম আর ভোজের অন্যান্য উপকরণ কিনেছে। আগের দিন ভোর থেকে বুড়ি লেগেছে খাবার তৈরি করতে, ভাতের পচাই বানাতে এবং অন্যান্য কর্তব্য কর্মে ; একবার এক মুহূর্তও সে বিশ্রাম পায় নি।

অভ্যাগতদের আগমনে তার ব্যস্ততা আরো বেড়ে ওঠে। একাই সে অক্লান্তভাবে খেটে চলে, পরিবেশন করে প্রত্যেককে, খাবারের পাত্রগুলিকে অনবরত ভরতে থাকে, গরম মদ ঢালতে থাকে যেন নিজেরই দেহকে নিংড়ে দিচ্ছে, অথচ মুখে লেগে থাকে হাসিটি, দেখে মনে হয় মনের সুখে কর্তব্য করে চলেছে।

"শুভ-মুল ভায়া, লজ্জা করো না" এই বলে একজন অসভ্য গোছের মানুষ চেঁচিয়ে ওঠে "এখানে লৌকিকতা কিছু নেই, বিনি পয়সার ভোজ। খাওয়ার

বদলে তোমার কাছ থেকে কেউ কিছু চাইবে না ভায়া, কাজেই খেয়ে নাও, গলা পর্যন্ত ভরে ফেল।"

'শুভ-মূল' জবাব দেয় "ঠিক বলেছ ভাই, হাত চালিয়ে চলো। এমন সুযোগ বড় একটা আসে না। সত্যি কথা বলতে কি এই ছুঁড়ি আ-আওটা বেহায়া বটে, কিন্তু তাহলেও দেখতে ভালো। আশপাশে কটা মেয়ের চেহারা তার মতন? আসলে—"

আর একজন চেঁচিয়ে ওঠে—"আ-আও-এর মত মেয়েও যত, বিনি পয়সার ভোজও তত। আমি তো আশা করি এমনি ধারা আরো মেয়ে জুটবে আমাদের কপালে—"

"ওরে বুড়ো মিনসে! আর গরব করে না। মেয়ে মানুষের কথা শুনলে তোমার জিভ দিয়ে জল পড়ে। এ-কথা ভুলো না তোমারই এলাকার মেয়ে তোমায় পছন্দ না করে পছন্দ করলো পাশের গ্রামের একটা মানুষকে!"

"বুড়ো মিনসে—হাঃ হাঃ।"

বিধবা ওয়াং যেন এ-সব টিপ্পনীর কোনো মানেই বুঝতে পারে না, সে পরিবেশনের কাজেই তার সমস্ত মনোযোগ নিয়োগ করে, মুখের হাসিটুকু মিলতে দেয় না। একবার ভ্রুকুটিটুকুও সে করে না। কিন্তু আ-আও শোনে, শিউরে ওঠে আর গুঁড়ি মেরে আরো দেয়ালের দিকে ঘেঁসে যায়। তার মনের মধ্যে যে-ভাব হচ্ছে সেটা কি অবমাননার, না ভয়ের, না রাগের অথবা একটা গুরুভার দুঃখের, তা সে বুঝতে পারে না, কিন্তু মনে হয় একটা প্রকাণ্ড পাথর যেন তাকে নিস্পিষ্ট করে ফেলছে, তার হৃদয় যেন জ্বলে উঠছে। যেন আগুন-রাঙা লোহার শিক দিয়ে তাকে বেঁধা হচ্ছে। কিছুদিন আগে সে নির্ভয়ে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল কপালে যা থাকে তাই হোক, এই বলে। কিন্তু এখন সে চায় গুঁড়ি মেরে লুকোতে। মোড়ল মশাই অবশেষে প্রসঙ্গটা তোলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলতে থাকেন—"সংক্ষেপে বলতে গেলে, ব্যাপারটা সত্যিই এমন কিছু গুরুতর নয়। মেয়ে বড় হলে সে বিয়ে করতে চাইবে এ তো স্বাভাবিক, কেমন নয়? কিন্তু পিরিত করবে……পুরুষ মানুষের সঙ্গে……গোপনে, বুঝছেন তো, কাউকে না জানিয়ে……কোনরকম লোকাচারের ধার না ধেরেই……এ কে ক্ষমা করতে পারে?"

সদাগর উ বলে ওঠেন—"ঠিক তাই! বিধবা ওয়াং, এ-তোমার নিজেরই অতীতের কৃতকর্মের পাপের শাস্তি। এমন মেয়ে, ভেবে দেখো একবার, শুধু

যে তোমার পরিবারের কলঙ্ক তা নয়, সারা তাওগ্রামেরই কলঙ্ক। তুমি ভালোরকমই জানো সনাতন প্রথা-অনুযায়ী এই পাপের শাস্তি মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়। মনে করে দেখো 'চাও' মেয়েটির দৃষ্টান্ত। ঘটনাটা ঘটেছিল পাথুরে ফটক গ্রামে তিন চার বছর আগে। ঐ একই পাপে তাকে মারতে মারতে মেরে ফেলা হয়েছিল। মনে আছে তাকে কফিন ছাড়াই গোর দেওয়া হয়েছিল? একে নিষ্ঠুরতা বলা চলে না, এ হচ্ছে ন্যায়বিচার। কারণ সৎ পথ ছেড়ে সে গিয়েছিল অন্য পথে চলে। তাছাড়া সব চেয়ে খারাপ হচ্ছে এই যে মরবার পরেও এই সব মেয়েরা সমাজের সুনামে কালি দিয়ে চলে। জীবন শেষ হয়ে গেলেই যে তাদের পাপ শেষ হলো তা নয়·· ·· মোটেই তা নয়, সবাই জানে মৃত্যুতেও এর ক্ষতিপূরণ হয় না।"

"আপনি যা বললেন, তা অবিসম্বাদী সত্য। মৃত্যু দিয়ে পাপ ঢাকা যায় না। অপরন্তু দোষটা শুধু মেয়ের নয়···মায়েরও দোষ: খানিকটা প্রশ্রয়, শাসনের অভাব। তা ছাড়া এক্ষেত্রে মা-ই হয়ত নিজে তার পুর্বজন্মে যথেষ্ট সাধ্বী ছিল না···বিধবা ওয়াং, আমার কথা শোনো, একটু সাবধান হও। যতদিন বেঁচে আছো একটু নিষ্ঠাবান থেকো।"

উপরিউক্ত বক্তৃতাটি এলো গ্রামের মোড়লের মুখ থেকে। আশ্চর্যের বিষয়, বিধবা ওয়াং এতে রুষ্ট তো হলই না বরং মুখ ফুটে কিছু বলতে উৎসাহ পেলে। ভয়ে ভয়ে সে সামনের দিকে একটু এগিয়ে এল। তার ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত আঙুল দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে সে নিচু গলায় অতি কষ্টে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলতে লাগল—

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মাবতার ঠিকই বলেছেন। আমার মেয়ে যদি অনুচিত কিছু করে থাকে সে দোষ আমারই। জানি না পূর্বজন্মে কি অমার্জনীয় পাপ আমি করেছিলুম কিন্তু আপনি যখন বলছেন তখন তা ঠিকই। আর আমার মেয়ের এই ভয়ানক পাপকর্ম—এর শাস্তি, আপনি ঠিকই বলেছেন শুধু মৃত্যু দিয়েই হতে পারে। কিন্তু তবু—"বলতে গিয়ে তার চোখ জলে ভেসে যায়। "আমি আর কি বলব, আমার বলবার মুখ কোথায়—শুধু ভিক্ষা চাইছি—দয়া করুন! ওকে প্রাণে মারবেন না!"

এ-দাবী বড় দুঃসাহসের, এ-ভিক্ষা একেবারে সৃষ্টিছাড়া। গ্রামবাসিরা নেহাৎই তখন বিধবার অন্ন খাচ্ছিল, তা নৈলে তাকে বিদ্রূপ শুনতে হতই। গ্রামবাসী চায় ন্যায় আর নীতির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে, তারা

এ-সব অনুরোধ-উপরোধের তোয়াক্কাও করে না। অথচ মনে হল যেন, যেহেতু তারা সকলে এসেছে, পেট পুরে আহার করে আনন্দ করছে এবং কেউ কেউ বিনা নিমন্ত্রনেই এসেছে সুতরাং তারা অযথা কঠিন হবে না। কিন্তু তাদের মীমাংসা নির্ভর করবে ধনী চিন্, সদাগর উ আর গ্রামের মোড়ল যা বলবেন তার উপর। সকলেই চুপ করে থাকে, অবশেষে চিন্ রায় দেন।

"উ যে বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছেন এবং ব্যাপারটা ঠিক ধরেছেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। 'মৃত্যু দিয়ে পাপ ঢাকা যায় না।' ঠিকই বলেছেন! তাহলে হয়তো, এখন ওকে হত্যা করলে বিশেষ কিছু লাভ হবে না: আমার তো এই মনে হয়। দোষ স্বীকৃত হয়েছে। বিধবা ওয়াং দয়া ভিক্ষা করছে অর্থাৎ সে হাত জোড় করছে আমাদের কাছে তার মৃত স্বামীর মুখ রক্ষা করবার জন্যে। সে চায় যে আমরা তার মেয়েকে প্রাণে না মারি। সব দিক দেখে-শুনে তা হয়তো সম্ভব; কিন্তু তাই বলে ঐ দুশ্চরিত্রা যে আমাদের গ্রামের সুনামকে কলঙ্কিত করে চলবে এ আমরা হতে দিতে পারি না। ওকে এখনই গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে!"

মোড়লেরও ঐ একই মত। "যা হবার তা হয়ে গেছে। যদিও ওর সম্মানের আর কিছুই বাকি নেই, তা হলেও ওকে মেরে ফেলে এখন আর কিছু লাভ হবে না।……বরং আপনি যেমন বলেছেন, ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক—দূর করে দেওয়া হোক এখনই!"

এই দুজনে যখন বিচারে রায় দিলেন তখন আর সব অভ্যাগতেরা যাঁরা নিজেদের বিচারালয়ের সভাসদ হিসেবে গণ্য করেছিলেন সকলেই চুপ করে রইলেন। মীমাংসাটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। ওয়াংএর বিবর্ণ ক্লান্ত মুখে হঠাৎ সত্যিকারের হাসি ফুঠে উঠল। সে তিন পণ্ডিতকে নত হয়ে অভিবাদন করল এবং বিচারালয়ের অন্যান্য স্বনিযুক্ত সভ্যদের নম্রভাবে ধন্যবাদ জানাল। পিছনে অন্ধকারের মধ্যে আ-আও শুনলো সব অথচ আশ্চর্য, সে এই দণ্ড-রোধের সংবাদে মোটেই আনন্দিত বোধ করল না। এটা সে স্পষ্ট বুঝলো যে এক অলৌকিক উপায়ে তার প্রাণ রক্ষা হয়েছে; কিন্তু মৃত্যুর চিন্তা যদিও ভয়ানক, তাহলেও এখনো তার এতো বয়েস হয়নি যে তা তাকে গভীরভাবে ভীত করবে। অপরন্তু গ্রাম থেকে বিতাড়িত হওয়া, মাকে চিরতরে ছেড়ে চলে যাওয়া, ভাইএর কাছে বিদায় নেওয়া, অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া—এ-সব তার মনে হলো মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক। দুঃখে তার

সমস্ত দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে, মনে হয় যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে। তার মনে হয় তার দেহ আর আস্ত নেই, শুধু একটা ভাঙাচোরা স্তূপ যা কি এক রহস্যময় উপায়ে এখনও জীবনধারায় স্পন্দিত হচ্ছে।

২

ঘটনাটা ঘটেছিল দুমাস আগে বসন্তের প্রথম দিকে একদিন। সে দিনটা ছিল এমন এক অব্যক্ত কোমলতায় এক অসহনীয় জড়িমায় আর আনন্দে-ভরা যে মানুষকে করে তুলেছিল স্বপ্নালস, অর্ধজাগ্রত, যেন কোনো আশ্চর্য মদের নেশায় মাতাল।

আ-আও য়ু গ্রাম থেকে সেদিন বিকেলবেলা যখন বাড়ি ফিরছিল তার মনে হল এমন অপূর্ব দিন সে আর কখনো দেখেনি। তার দেহের মধ্যে একটা নতুন উষ্ণতা, তার মধ্যে একটা অপরিচিত সজীবতা—যেন এইমাত্র সে বেঁচে উঠতে শুরু করেছে। রাস্তার দুধারের জমির রং শুকনো হলদে থেকে সরস কচি সবুজে রূপান্তরিত হয়ে এসেছে, গাছেরা ফিরে পেয়েছে নবজীবন। তাদের পাতার কুঁড়িভরা শাখায় শাখায় পাখীরা এসে কলধ্বনি জুড়ে দিয়েছে। যতদূর পর্যন্ত তার চোখে পড়ে সারা পৃথিবী যেন নবীন, সরস, বর্দ্ধিষ্ণু, জাগ্রত, উন্মুখ। তার মনে হয় সে-ও যেন ঐ একই সুরে বাঁধা, সে-ও যেন উন্মুখ। কিসের জন্যে উন্মুখ? তা সে জানে না, কিন্তু কে জানে কেন সে দেখে সে আগের চেয়ে অনেক ধীরে চলতে শুরু করেছে। তার ভিতরের যেন কোনো বহ্নিতে তার মুখ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, হঠাৎ সে সচেতন হয়ে ওঠে তার দেহ সম্বন্ধে, যে-দেহ তার পোশাকের তলায় উদ্দীপ্ত এবং স্পন্দিত।

কোথা থেকে একটা শব্দ আসে—"আ-আও!"

অবাক হয়ে এবং একটু ভয় পেয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। চারিদিকে চেয়ে দেখে মাঠের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখে যেখানে পাইনের বন, পাথুরে রাস্তার গলির মধ্যে দেখে, কিন্তু কাউকে চোখে পড়ে না। তার মাথার উপর এক জোড়া ঈগল চক্রাকারে ঘুরছে। তার মুখ রাঙা হয়, তার উত্তপ্ত মুখে একবার হাত বুলিয়ে সে আবার হাঁটতে থাকে।

"আ-আও"—কে আবার চেঁচিয়ে ওঠে, এবারে আরো কাছ থেকে। সে আরো ধাঁধা খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার যখন সে চলতে শুরু করে আবার সেই ডাক, এবারে খুব কাছ থেকে বলে ওঠে—

"আ-আও, আমি।"

চট্ করে ঘুরে সে দেখে ঝোপ আর তরুগুল্মের মধ্যে থেকে একটা মাথা উঁকি দিচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে সুতির জোব্বা গায়ে, লাল বোতাম লাগানো সুন্দর টুপি মাথায় একটি ছেলে সশরীরে বেরিয়ে আসে। তার বয়েস হবে আন্দাজ কুড়ি বছর; দেখতে মন্দ নয়, তার মুখে ভারি একটা খুশির ভাব। আ-আও তাকে চিনতে পারে। সে হচ্ছে পাশেব গ্রামের দোকানদার লি-র ছেলে। আ-আও তার নামও জানতো আ-সিয়ান।

"আই-আ! তাই বলো তুমি। আমি তো ভয়েই মরে গিয়েছিলুম। কোথা থেকে এলে তুমি?"

যাই হোক ছেলেটির উদয়ে আ-আও যে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে তা মনে হলো না।

ছেলেটি বলে—"আমি? আমি শহর থেকে ফিরছিলুম। দূর থেকে দেখি তুমি, তাই লুকিয়ে পড়েছিলুম তোমার সঙ্গে একটু মজা করবার জন্যে।"

"দুষ্টু বেয়াদব কোথাকার!" এই বলে আ-আও চেঁচিয়ে ওঠে; চোখ তার উল্লসিত; আ-আও হাত তুলে তাকে মারতে যায়—"মানুষকে ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলবে নাকি?"

"আমার অন্তর থেকে ক্ষমা চাইছি আ-আও। আসলে হয়েছে কি তোমাকে আমার একটা খুব গুরুতর কথা বলবার আছে।"

"যেমন?"

ছেলেটি হঠাৎ কেমন ভীরু কেমন দুর্বল বনে যায়। সে বিড়বিড় করতে থাকে—"আমি—আমি" তারপর সে আ-আওর হাত চেপে ধরে।

"এ কি?" বলে আ-আও চমকে পিছু ফেরে, কিন্তু কি কারণে যেন তার পা সরতে চায় না। তার দেহ যেন কিসের ঘা খেয়ে শিউরে ওঠে, তার আবার মনে হয় তার সুতির পোশাকের তলায় তার দেহপৃষ্ঠ শিরশির করে উঠছে। সমস্ত শক্তি যেন তার নিঃশেষিত হয়ে গেছে। ছেলেটি তার বাহু দিয়ে তাকে ঘিরে তাকে আকর্ষণ করে, তারপর তাকে বনের মধ্যে নিয়ে যায়। বাধা দেবার সে কোনোরকম চেষ্টাই করে উঠতে পারে না, তার মন যেন অক্রিয় হয়ে পড়ে, তারা যে এগিয়ে যাচ্ছে কোনো একটা দিকে এ-সম্বন্ধেই যেন তার কোনো চৈতন্য নেই। একটি শব্দও সে করে না। শুধু সে অনুভব করে যে প্রাণের ভিতরটা তার যেন অসহনীয়রূপে হালকা এবং বিস্তারিত হয়ে উঠেছে।

তারা দুজনে একটা পাতায় ভরা গাছের তলায় বসে ; আ-আওর মাথা ছেলেটির কাঁধে। আ-আওর চোখ মুদে আসে, নিঃশ্বাস পড়তে থাকে ঘন ঘন। সে অনুভব করে ওর হাত কোমলভাবে তার বুকের উপর, তার স্পন্দিত হৃদয়ের উপর এসে পড়েছে। ওর ওষ্ঠ আ-আওর ঠোঁট স্পর্শ করে এবং হঠাৎ তার মনে হয় তার দেহ এক অজ্ঞাতপূর্ব দীপ্তিতে ছেয়ে গেছে।

"ক্ক অ অ"

মাথার উপর একটা হাঁড়িচাচা গোল হয়ে ঘুরছিল তারই ডাক তাকে চমকে দেয় এবং মনে করিয়ে দেয় পৃথিবী এখনও বর্তমান। সে কেঁপে ওঠে।

"আ-সিয়ান! না না! অমন করো না দোহাই! মা আমাকে মেরে ফেলবে!"

"বাধা দিও না! তোমার কোনো ভাবনা নেই। বিশ্বাস করো, আমার উপর আস্থা রাখো। ঠিক এই আজকের মতোই চিরদিন সব কিছুই এমনি আশ্চর্য এমনি সুন্দর থাকবে……"

ছেলেটির গলাও কেঁপে যায়, সেই কণ্ঠের অভিনব অনুরণন, এক অজানা আহ্বান যা কোনোদিন সে শোনে নি এবং যাকে কোনোমতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না এই সব মিলে তাকে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দেয়। তার আর কোনো অস্তিত্বই থাকে না।

৩

আ-আও সেদিন বিকেল কাটিয়ে উত্তেজিত অবস্থায় যখন বাড়ি ফিরল, বিধবা ওয়াং তাকে জিজ্ঞেস করেন—"কি হয়েছে তোমার আ-আও? জ্বর নাকি?" তিনি মেয়ের কপালে হাত দেন। "ঠাণ্ডা লাগে নি তো?"

আ-আও অস্ফুটভাবে যেন নিজের মনেই বলে—"কিছুই হয়নি। আমার—আমার শরীরটা তেমন ভালো নেই বোধ হয়।" বলে সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে, অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। সে বেশ জানে এর কি ঝুঁকি, কি বিপদ, সামনের পথে কি অদৃষ্ট দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সব জেনেও সে জানে যে আ-সিয়ান যখনই ডাকবে সে তার কাছে ছুটে যাবে। কাল ডাকলে কালই!

আ-আও আশা করে একটা ভয়ানক কিছু ঘটবে ; তার জন্যে নিজেকে তৈরি করে। এর পর প্রত্যেক বারই সে তার প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের পর বিরসভাবে অপেক্ষা করেছে এই বার বুঝি তাদের দুষ্ক্রিয়ার কথা জানাজানি হয়ে

গেল এবং প্রতিবারেই সে আশ্চর্য হয়ে গেছে যখন কেউই তাকে ভৎসনা করতে আসে নি। তা হলেও একদিন না একদিন সে যে ধরা পড়বেই এটা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সান্ত্বনা পেতো এই কথা ভেবে যে তার প্রেমিক তাকে রক্ষা করবে, শাস্তি যা হবে তা সে ঘাড় পেতে নেবে। সে মনে মনে ঠিক করেছিল তার প্রেমিক যখন লাঞ্ছিত হবে আ-আও সগর্বে ওর পক্ষ নিয়ে দাঁড়াবে, ওর ভাগ্যে যা থাকুক তার ভাগ সে নেবে। তারপর, অনবরত যার ভয় সে করে এসেছে অবশেষে একদিন তা ঘটল কিন্তু পরিণামের যে ছবি সে কল্পনার রঙে রঙিন করে এঁকেছিল বাস্তব ক্ষেত্রে তার সঙ্গে কিছুই মিলল না। বিধবা ওয়াং যেদিন গ্রামবাসিদের সেই জমকালো ভোজে আপ্যায়িত করছিল, ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক তার তিন দিন আগে।

নীলচে-লাল পর্বতশ্রেণীর পিছনে ছিল একটি ছোটো পাহাড় তার নাম বহুকাল হল লোকে ভুলে গেছে। এরই গা বেয়ে অর্ধেক পথ উঠলে পর্বত দেবতার একটা মন্দির পড়ে, গাছ পাতায় তা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে; কেউই প্রায় সে মন্দিরে আসে না , ক্বচিৎ কখনো যদি কেউ পাথুরে ফটক গ্রামে খাটো রাস্তা দিয়ে যেতে চায় তখন এই পথে আসতে পারে ; তা ছাড়া আর কেউই এ-পাহাড় দিয়ে হাঁটে না। আশ-পাশের বনগুলি এক মস্ত জমিদারের সম্পত্তি, এবং সেই সব জঙ্গলে রাস্তা দিয়ে অনধিকার প্রবেশ করবে এমন লোক খুব কমই আছে। জায়গাটা একটা ছমছমে ভাবে ছাওয়া, কিন্তু তরুণ প্রেমিক প্রেমিকাদের পক্ষে ভারি সুকোমল আশ্রয়।

সেদিন কাঠুরে লাও-ত লুকিয়ে লুকিয়ে বনের মধ্যে ঢুকেছিল কাঠ চুরি করতে। এক বোঝা কাঠ সংগ্রহ করে সে যখন ফিরতে যাবে ঠিক সেই সময় অস্তগামী সূর্যের আভায় সেই পার্বত্য মন্দিরের দেয়ালের গা রক্ত-রাঙা হয়ে উঠল। দৃশ্যটা তার লাগল ভাল। কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে সে একটা চৌকাঠে বসে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে তার পাইপটা ধরিয়ে আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

একি, একটা শব্দ পাওয়া গেল না? পাইপটা কোমর-বন্ধে রেখে সে কুঠারটা হাতে তুলে নেয়। তৈরি হয়ে দাঁড়ায় যদি কোনো বন্য জন্তু লাফিয়ে এসে পড়ে তার সঙ্গে লড়তে। দাঁতে দাঁত চেপে, উত্তেজিত হয়ে সে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে। ভাবে ছুটে পালাবে কিনা, তারপর ভেবে দেখে। মনে পড়ে আক্রমনই হচ্ছে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। হাঁসের ডিমের মতো একটা

পাথর তুলে নিয়ে সে যতো জোরে পারে জঙ্গলের নিবিড়তম অংশের দিকে ছুঁড়ে মারে।

গাছপালার মধ্যে থেকে বন্য জন্তু না বার হয়ে যখন একটা মানুষ বার হয় তখন সে অত্যন্ত অবাক হয়ে যায়। যে বার হয় সে আর দাঁড়ায় না এমন কি লাও-ত-র দিকে তাকায় না পর্যন্ত, চকিতের মধ্যে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। লাও-ত কিন্তু ঐটুকুর মধ্যেই চিনতে পারে আ-সিয়ানকে। খানিকটা ধাঁধিয়ে পড়ে সে আ-সিয়ান যেখান থেকে বেরিয়েছিল সেই দিকে অগ্রসর-হয়।

তার পর-মুহূর্তেই সে আ-আও-র কাছে এসে পড়ে। সে শুয়ে আছে অলসাঙ্গ, বিস্রস্ত বসন, কালো চুলের এখানে ওখানে সবুজ পাতার টুকরো, সমস্তটা নিয়ে তাব ভাব যেন সে স্রোতের মুখে ভেসে গেছে। এই দৃশ্যে কেন জানি না লাও-ত রাগে আগুন হয়ে ওঠে, বিষম ক্রোধে সে কাঁপতে থাকে। খানিকটা তাকিয়ে থাকে চোখ বড় বড় কবে তার পর ঝুঁকে পডে তাকে বেদম প্রহার করে।

"ওরে! আ-আও! শয়তান! বেশ কাজ করেছিস!" আ-আও কথা বলে না, শুধু মিনতিভরা চোখ তুলে তাকায়, করুণা ভিক্ষা করে। "কলঙ্কিনী! বেহায়া! এইখানে এসেছিস লুকিয়ে ওর সঙ্গে শুয়ে থাকবার জন্যে!" এই বলে সে আবার তাকে চড় মারে।

পরে, এই ঘটনাটা এবং ক্রুদ্ধ লাও-ত-র গালিগালাজ, আ-আওর মনের মধ্যে কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে যায়। কেমন করে যে লাও-ত তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, কেমন করে সে অসম্মানে বাড়ি ফিরেছিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে কেমন করে তার প্রণয়-কাহিনী সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল এ-সব তার আর মনে নেই। শুধু তারপরে যতগুলি চক্ষুর দিকে সে তাকিয়েছে তারা সবাই রোষে ভরা : ঘৃণায় ভরা হিমদীপ্তি দৃষ্টি। এমন কি তার মা-ও তার দিকে তাকালেন রাগ আর তিক্ততা নিয়ে, তবু তাঁর চোখের গভীর গভীরতম অিস্তস্তলে এক তীব্র বিষাদময় দৃষ্টি, যে-বিষাদে তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠেছে। কস্তু বাঁশের লাঠির ঘা, দ্রুত বর্ষিত প্রহারের পর প্রহার, অভিসম্পাত এর কোনোটাই তাকে ব্যথাও দেয়নি, লজ্জাও দেয়নি, এমন কি অনুতপ্তও করেনি।

এ-সমস্তই সে আশা করেছিল, এতদিনে তা এলো। দৈবাৎ কিছু হয়নি, অদৃষ্টের নির্দ্ধারিত পথ ধরে সমস্তই এসেছে এবং যা হয়েছে এই সব কিছুর জন্যেই সে প্রস্তুত ছিল। শুধু একটি মাত্র অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা যা তার মনোভঙ্গ করেছে, তাকে সন্ত্রস্ত করেছে—তা হচ্ছে তার- প্রেমিক এই সমস্ত প্রতিফলন বিন্দুমাত্র

ভোগ করছে না, এবং আ-আও সম্বন্ধে তার যে কোনো আগ্রহ বা ঔৎসুক্য আছে তাও মনে হচ্ছে না।

যেন স্বপ্নের কোনো ঘটনার মতো তিনটে দিন কেটে যায়, অবশেষে বিজ্ঞদের বিচারাজ্ঞা উচ্চারিত হয়। মৃত্যু নয়। এটা সত্যি যে এই মীমাংসায় সে খানিকটা স্বস্তি পায়, কিন্তু তবু তার পরম দুঃখ যায় না। তার দেহ মনে হয় যেন বহুদিনের পুরোনো যেন কত গুরুভার, অসীম ক্লান্তিতে ভরা, তার প্রাণ সম্পূর্ণভাবে নিষ্পেষিত। লোকে তাকে যা বলেছে, তার প্রতি যা ব্যবহার করেছে এমন কি তার মায়ের চোখের তিক্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি, এতে যে সে নিষ্পেষিত হয়েছে তা নয়, হয়েছে তার প্রেমিকের এই অপূর্ব দায়িত্বহীন এবং কাপুরুষের মত আচরণে।

পুরুষ অভ্যাগতেরা তাদের মদের পাত্রে শেষ চুমুক দেবার আগেই মেয়েরা তাদের অংশ গ্রহণ করবার জন্যে আসতে শুরু করে। সমস্তক্ষণ ধরে আ-আও তার লুকোনো জায়গায় গুঁড়ি মেরে ক্ষুধার্ত এবং কম্পিত দেহে ক্রমেই দেয়ালের কোণে ঘেঁসতে থাকে। শীতে সে কাঁপছে তা নয়, মরবার ভয়ও যে তার আর ছিল তাও নয়, অথচ এক নাম-না-জানা অসুখ তার অন্তরাত্মাকে আক্রমণ করেছিল। মেয়েরা তাদের পুরুষদের চেয়ে যে কিছু কম খেল তা নয়। তাদের সকলের খাওয়া যখন শেষ হল তখন গভীর রাত্রি। একে একে তারা তখন বাড়ি ফিরতে শুরু করে। তাদের সামনে স্থাপিত স্তূপাকার খাবার গলধঃকরণ করতে করতে তারাও পুরুষদেরই মতো মা আর মেয়েকে নিষ্ঠুরভাবে বিদ্ধ করবার জন্যে বাঁকা বাঁকা ক্রূর মন্তব্য প্রকাশ করতে দ্বিধা করল না।

আ-সিয়ানের মা শ্রীমতী লি যখন আচম্বিতে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হলেন তখন নাটক যেন জমে উঠল। একটু পরেই বোঝা গেল, তাঁর ছেলে এই ব্যাপারে যে অংশ গ্রহণ করেছে তার জন্যে তিনি ক্ষমা চাইতে আসেন নি। তিনি বরং এসেছেন বিধবা ওয়াংকে শাপান্ত করতে, কেন সে তার মেয়েকে দিয়ে তাঁর ছেলেকে ব্যভিচার করাবার সুযোগ দিল। বাড়িতে পা দেবার আগে থেকেই তিনি গালি বর্ষণ করতে শুরু করেন। দূর থেকে তাঁর স্থূল দেহের হংসগতি চোখে পড়ায় বিধবা নিরুৎসাহ হৃদয়ে এগিয়ে যায় তাঁকে খাতির করে আনতে। শ্রীমতী লি ঝরনার উপরের সাঁকোটা হন্তদন্ত হয়ে পার হয়ে ওয়াং-এর দরজার দিকে

দ্রুত অগ্রসর হন। তারপর, হতভাগ্য মাকে দেখে কয়েক পা পিছু হটে যান; এবং তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে অপভাষণ শুরু করেন:

"হতভাগি! যে-বাড়িতে এমন মেয়ে আছে সে-বাড়ির মা-ও তেমনি! ঐ পোড়া মুখ নিয়ে তুই কি না আবার বেরিয়ে এলি আমার সামনে? আমার ছেলে এমন খাঁটি, এমন নিষ্পাপ, এতো ভালো; কন্‌ফুসিয়াসের মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সে প্রণাম করেছে; সেই মহাপুরুষের উপদেশ সে সব ভালো করে বুঝেছে। আর তুই বেহায়া মা আর তোর ভ্রষ্টা মেয়ে কি না তাকে পাপের পথে লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে তার সর্বনাশের চেষ্টা করিস! তোর সঙ্গে আজ আমি একসঙ্গে মরব বলে এসেছি।"

এই বলে তিনি সত্যিই বিধবা ওয়াংএর দিকে ছুটে যান, মনে হয় যেন ওর মাথার সঙ্গে নিজের মাথা ঠুকে মাথা ফাটিয়ে ফেলবার জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর। অন্যান্য অভ্যাগত মহিলারা তাদের চারিদিকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ান (এই রঙ্গ দেখে মনে মনে কেউ যে খুশি হন না তা নয়) এবং অপমানিতা শ্রীমতী লির ক্রোধ উপশম করতে এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা পান। বাস্তবিকপক্ষে স্থূলকায়া মহিলা তাঁর মূল অভিপ্রায় এমনই ভুলে যান যে অন্যান্য মহিলারা অবশেষে যখন তাঁকে ওয়াংএর বাড়ির মধ্যে নিয়ে যান তিনি আপত্তি করেন না। এমনকি পেট ভরে ভোজ্যও গ্রহণ করেন এবং শেষে শুধু বিড়বিড় করে এইটুকু বলেই তুষ্ট থাকেন "ওরা আমার ছেলেকে কলঙ্কিত করেছে, তাকে প্রলুব্ধ করেছে …এখন থেকে সে আর অন্য লোকের উপরে তার মাথা তুলতে পারবে না।"

শেষ অতিথি যখন চলে যায় তখন বৃদ্ধা বিধবা ধীরে সেই অন্ধকার কোণের ঘরে একটা তেলের বাতি হাতে প্রবেশ করে। আ-আওকে সে বেরিয়ে আসতে বলে, খেতে বলে। আ-আও ক্রমে ক্রমে নিজেকে টেনে বার করে আনে; কিন্তু সারা দিনের সংগোপন সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে সারাদিন গুটিয়ে পড়ে-থাকা এইতে সে এত অবসন্ন হয়ে পড়ে যে এখন আর তার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা থাকে না। একটু আগে সে মনে করছিল তার পেটে আগুন জ্বলছে, এখন তার গলা দিয়ে এক গ্রাস খাবারও নামতে চায় না।

মধ্যরাত্রি। বিধবা ওয়াং এখনও ঘুমতে যায় নি। ছোট্ট ঘরটির মধ্যে ঘুরে ঘুরে সে এটা ওটা কুড়িয়ে পৌটলার মধ্যে সাজায়। আজ ভোর রাতে যখন আ-আও চলে যাবে এই পোঁটলা নিয়ে তাকে যেতে হবে। শেষে সে পোঁটলাটা শক্ত করে বেঁধে ফেলে; তখনই আবার তা খুলে তার মধ্যে আরো

দু জোড়া লম্বা মোজা ভরে দেয়। এক মুহূর্ত সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবে; তারপর একটা পুরোনো ভাঙা তাক থেকে একটা সুতির ঘাঘরা বার করে। এইবার মনে হয় যাত্রীর পেঁটরা গোছানো সম্পূর্ণ হল।

বসন্তকালের রাত ছোট—একটু পরেই মোরগ ডাকতে আরম্ভ করে। বিধবা তার ছেলে আর মেয়েকে জাগিয়ে একটা লণ্ঠন জ্বালে; তাদের কিছু খাবার দেয়, তারপর দরজার পাশে ঠেলাগাড়িটার কাছে আ-আওর সঙ্গে যায়।

"বুঝছিস্ তো মেয়ে, আমি যে তোকে ত্যাগ করতে চাই তা নয়—তুই নিজেকে নষ্ট করেছিস—"

কিন্তু সেই ঝুঁকে-পড়া মূর্তিটি হঠাৎ কান্নার ধমকে থর থর করে কেঁপে ওঠে। সে যেন এই মর্মাবেগের বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। তারপর কোনরকমে মৃদুভাবে একটু হেসে বলতে থাকে "শুধু সাবধানে থেকো আ-আও। এখন থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াও শক্ত হয়ে, তা হলে আর আমার ভাবনা করবার কিছু থাকবে না। আর আমার কথা ভেবে নিস্ যে আমি মরে গেছি, এ-পৃথিবীতে আর নেই। এখানে যদি আমাদের আর দেখা না হয়, তা হলে হয়তো পরপারে……যাই হোক, এই আশাই আমরা করব……"

আ-আওর পাশে ঠেলা গাড়ির উপরে মা বসে, তাঁর ছেলে ঠেলতে থাকে। বাড়ি ছেড়ে আধ মাইল দূরে বড় রাস্তার উপর 'বড় ওক্' গাছের কাছে এসে তারা পৌঁছয়। এইখানে নেমে সে মেয়ের কাছে শেষ বিদায় নেয়। সেইখানে দাঁড়িয়ে অপস্রিয়মান লণ্ঠনের আলোর দিকে সে তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না লণ্ঠনের অস্ফুট আলো পূর্ণ অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, মৃত্যুর বিরাট শূন্যতার মধ্যে জীবনের শেষ স্ফুলিঙ্গের মতো।

সরাইখানা

লি কোয়াং-থিয়েন

(১৯০৭—)

লি কোয়াং-থিয়েন আধুনিক চীনা সাহিত্যে একজন বিশিষ্ট কবি, নিবন্ধ রচয়িতা, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্য-সমালোচক। শানতুং প্রদেশের ছি-তুং গ্রামে চাষীর পরিবারে তাঁর জন্ম। গ্রাম্য পরিবেশে তাঁর বাল্যজীবন ও কৈশোর কেটেছে। তিনি বন্ধু ও সহাধ্যায়ী কবি হো ছি-ফাং ও পিয়েন্-লিন এর সঙ্গে এক যোগে 'হান-ইউয়ান' নামে একটি কবিতার বই ছাপান। ক্রমে তাঁর নিবন্ধ বচনার খ্যাতি কবি-খ্যাতি ছাপিয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় খুন্ মিং-এ থাকাকালীন তিনি উপন্যাস ও সাহিত্য-সমালোচনায় হাত পাকান। যুদ্ধের পর তিনি বহুদিন নান-খাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ছিং-হুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

সূর্য নামল পাহাড়ের নিচে। ফুরোলো আর একটা দিনের রাস্তা। পথচারী মানুষেরা ক্লান্তি বোধ করতে থাকে।

একটি ছোট্ট গ্রাম—তারই মধ্যে এসে তুমি ঢুকলে। তুমি এ-গ্রামের কিছুই জানো না কিন্তু গ্রামটিকে দেখে মনে হয় যেন অতিপরিচিত। কারণ এই ধরনের বহু গ্রাম তুমি পেরিয়ে এসেছ। দেখা যায় কোনো কোনো বাড়ির সামনের ফটক এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে, কোনো কোনোটা বা আধ-ভেজানো। কয়েকজন লোক ভারি ভারি পা ফেলে বাড়ি ফিরে চলেছে, পিছনে চলেছে কুকুর, গরু কিংবা ভেড়া। মেয়েরা কেউ কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে তাই দেখছে, কিংবা নিচু গলায় কাউকে ডেকে বলছে সন্ধের খাওয়া সেরে নিতে। হয়তো শুনলে হঠাৎ দরজা বন্ধ করার শব্দ। দূরের একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে তুমি হয়তো ভাবছো ঐ বাড়িটার দরজা অবধি পৌছতে পারলেই একটু জিরিয়ে নেব ; কিন্তু কিছুদূর না যেতেই চোখে পড়বে রাস্তার ধারে কিংবা চৌমাথার উপর একটি ছোট্ট সরাই। কাল অবশ্য আবার পথ ভাঙতে হবে, কিন্তু আজকের রাতের মত তো মিঠে স্বপন দেখার একটা ঠাঁই মিলে গেল।

"নির্জন গ্রামে বৃষ্টি শিশির, ঘুমোও তাড়াতাড়ি। সরাইখানার পাশে কুহেলিকা ভাসে, উঠতে করো দেরি।" এই ধরনের দু লাইন পদ্য হয়তো

দেখবে সরাই-এর প্রকাণ্ড ভাঙা দরজার গায়ে খোদাই করা রয়েছে। যাই হোক, এটায় চোখ পড়লেই যেন পথচারীদের প্রাণে একটু উত্তাপ এসে লাগে। এখানে তুমি পাবে আদর ও যত্ন। হয়তো দেখবে সরাইখানার কর্ত্রী ভারি অমার্জিত কিন্তু ভারি দয়ালু। তার গায়ের রঙ কথা বলার ধরন শুনে হয়তো তোমার নিজের গ্রামের কথা মনে পড়ে যাবে। কোনো একটা সময়ে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যাবে অতি ধূর্ত এক গ্রামের ছোকরার। সে হয়তো তোমায় জানিয়ে দেবে, সামনের বড় গ্রামটা এখান থেকে কতদূর। সে যতদূর বলবে আসলে কিন্তু মোটেই অতটা দূর নয়। তা ছাড়া সেই গ্রাম পর্যন্ত যেতে খচ্চরের ভাড়া কত লাগবে তাও তোমায় শুনিয়ে দেবে। ভাড়াটাও আসলে মোটেই অত নয়। অথচ তার এই মিথ্যে বুক্‌নি আর তার ধূর্ততার আড়ালে আসলে যে বোকা মানুষটি আছে, সেও হয়তো তোমার কাছে মোটেই অসহ্য বলে ঠেকবে না।

সরাইখানার মধ্যে কোন জিনিসটাই বা নতুন, কোনটাই বা ভালো? পেটাই লোহার একটা মুখ ধোবার গামলা—দেখতে হাঁড়ির মত। ক শ' বছর ধরে যে ওটা ব্যবহার হয়ে আসছে তার ঠিক নেই। ই সিং-এর তৈরি কালো মাটির একটা চা-দানি—একটা মানুষের পুরো একবেলা খাবার মতো চা তাতে ধরে। হযতো কেউ এটা দেখে মন্তব্য করবে যে এটি অতি পুরাতন সামগ্রী।

খাওয়ার মূল্য পানীয়ের মূল্য সমস্ত ওজন হিসেবে—"পেট পুরে খেতে দিতে হবে বৈকি! হাজার মাইল হাঁটা তো বড় কম কথা নয়। আমার বিবেককে যেমন করেই হোক সব সময় আমি নিষ্কলুষ রাখবো।" সরাইখানার মালিক প্রায় প্রত্যেক অতিথিকেই এই ধরনের কথা শোনাবে।

এই ধরনের জায়গায় নিজেকে একলা পাওয়া শক্ত। মন আর শরীর দুই-ই পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম একটু না করলেই নয় তবু যাত্রাসঙ্গীদের সঙ্গে গল্প জমে যায়।

"চার সমুদ্রের মধ্যে সবাই তো ভাই-ভাই।" এই ধরনের হাস্যমুখর কথা তুমি হয়তো শুনতে পাবে। "তুমি তো উত্তর পাহাড়তলি থেকে আসছ, নয়? তা তুমি একরকম প্রতিবেশীই হলে বই কি।" এই ধরনের কথাবার্তা প্রায়ই শোনা যাবে। পাহাড় থেকে পাহাড়ি এসেছে ফল বিক্রি করতে; নদী পার হয়ে জেলে এসেছে জাল ঘাড়ে; ঠেলাগাড়িওয়ালা, বাঁকওয়ালা, চামড়ার জুতোওয়ালা, মাটিওয়ালা আর এসেছে "দড়ির বদলে দেশ্‌লাই দেনেওয়ালা" এ-ছাড়া হয়তো একজন বুড়ো পণ্ডিতেরও দেখা মিলবে। যে-মুহূর্তে এরা সবাই ঐ বাড়িতে

ঢুকলো সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল সব এক পরিবারের লোক। এরা দরাজ প্রাণে আলাপ করে; পরকে করে নেয় নিজের ঘরের মানুষের মতো। এই যে এতগুলি মানুষের মেলামেশার অবকাশ এসেছে, এটাতে এরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে, ভেবে নেয়, এর মধ্যে নিশ্চয় ভাগ্য-দেবতার ইঙ্গিত রয়েছে। বলা যায় না তো, ভবিষ্যতে ভালো কি মন্দ কার ভাগ্যে কি রকম সময় পড়বে—তাই হয়তো আজ এসেছে এই ধরনের একটা রাত সকলের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ নিয়ে। সময়টা যদি শীতকাল হয় তাহলে দরাজ-প্রাণ সরাইয়ের মালিক ঝাউয়ের ডাল শুকনো কাঠ দিয়ে একটা গন্‌গনে আগুন করে দেবে—এই হচ্ছে মালিকের খাতিরের প্রথা। আগুনের জন্য সে আলাদা দাম ধরবে না। এই শান্ত আর উষ্ণ পরিবেশের মধ্যে একদল অপরিচিত লোক একসঙ্গে বসে যখন আগুন পোহায় তখন কথা আপনা থেকেই বেড়ে চলে।

এখন অবশ্য যাতায়াতের একটু সুবিধেই হয়েছে, তবু এই ধরনের প্রায় বুনো জায়গায় খবরের কাগজের মতো কোন জিনিস খুব কমই এসে পৌছয়। তাই বলে খবর যে কিছু আসে না তা বলা চলে না। এই সব বাঁকওয়ালা আর ঠেলাগাড়িওয়ালার দল মুখে মুখে সব রকম খবর ছড়ায়। এরা তো আর কম দেশ ঘোরে নি—নানা অদ্ভুত অপরিচিত লোকও এরা দেখেছে। তাই এই ধরনের কোনো জায়গায় একসঙ্গে এসে পৌছলেই কে কি দেখেছে এবং শুনেছে তাই বলতে এদের মধ্যে একটা রেষারেষি লেগে যায়। অমুক গ্রামে খুনখারাপি হয়েছে, অমুক শহরে এখন কি গুজব রটছে এই সব খবর মুখে মুখে ছড়ায়। তাছাড়া নানা স্থানের নানা জিনিসের দর-দস্তুর আলোচনা হয়। সব বিষয়ের সব রকম খুঁটিনাটিই ওদের জানা থাকে। এই ধরনের খবরের আদান-প্রদান এই ছোট্ট সরাইখানায় ভোর পর্যন্ত চলে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে-সব খবর ছড়িয়ে যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোকে এইসব সংবাদ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে, রকমারি মতামত উপস্থিত করে। খবরগুলো কি রকমের যদি বিবেচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে এগুলো যে বিশেষ করে কিছু নতুন খবর তাও নয়। হয়তো বা কয়েক বছরের পুরোনো সব গল্প, কতবার কত লোকের মুখে ফিরেছে; লোকে ভুলে গেছে আবার তাদের মনে পড়েছে—গলায় দড়ি দিয়ে কোন মেয়েছেলে মরে পেত্নী হয়েছিল, কোন ঘোড়াওয়ালার কেমন সুন্দরী সঙ্গী ছিল, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের নিয়মভঙ্গ ইত্যাদি······এ সবই এখানে আলোচিত হয়। কেউ-বা একটা পাহাড়ি গান ধরে। গায়কের গলা যেমনি বেয়াড়া সুরও তেমনি

বে-পর্দায়। মাঝে মাঝে আবার দেশের-দশের কথাও হয়, যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি। এ-সব অবশ্য শোনায় গল্পের মত—যেমন রামায়নের গল্প, রাক্ষস আর বাঁদরের যুদ্ধের কাহিনী অনেকটা সেইরকম।

ক্রমে আগুন নিভে আসে। সরাইখানার মালিক অনেক আগেই শুতে চলে যায়। কোনো কোনো যাত্রীর দল একসঙ্গে বিছানা করে ঘেঁসাঘেঁসি করে শুয়ে পড়ে। হয়তো দুজন লোক এখনও গভীর কথায় মগ্ন। অল্পবয়সী দুজন ছেলে তার মধ্যে একজন হয়তো বলে উঠলো, গ্রামে কি এক মহা অপরাধ করার জন্যে তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে—ক শ' ক হাজার মাইল যে সে এসেছে তার কোনো হিসেব নেই। তার উপর পালিয়েছে সে আজ কত বছর হয়ে গেল!

"আমি……" এই বলে আর একজন শুরু করে "আমি বেরিয়েছি আমার ঘর-পালানো বৌ-এর খোঁজে, তার জন্যে কিছু টাকাও জমিয়েছি।" দুজনে হয়তো অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে। গল্পে-গল্পে সারাটা রাতই কেটে যায়, আর দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বও জমে ওঠে।

"মুর্গি ডাকে ভাঙা সরাইএর ছাদের উপর। চাঁদ ঢলে পড়ে, মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে সাঁকোর পাটাতনে বরফের উপর।" জানালার উপরটা ক্রমে শাদা হয়ে আসে, রাস্তায় এরই মধ্যে লোক চলতে আরম্ভ করেছে। জলের শব্দ, গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ কানে আসে—মনে হয় যেন অনেক দূরে, বহু দূরে! রাস্তা হাঁটার সময় আবার এসে গেল।

ডাকের আওয়াজ, হাই তোলার শব্দ, মাটির উপর ঘোড়ার খুর ঠোকা…… এই সময়ে সরাইখানার মালিক আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক অতিথিকে খাতির করে—জিজ্ঞেস করে সঙ্গে পাথেয় যথেষ্ট আছে কি না। কোনো জিনিস পড়ে নেই তো? যদি খুব তাড়াতাড়ি না থাকে তাহলে সকালের চা-টা খেয়ে গেলেই তো হয়, ইত্যাদি! :হয়তো একদল একসঙ্গে এসেছিল, এবার দল ভেঙ্গে যে যার নিজের রাস্তায় যাবে। ভাঙবে নতুন রাস্তা, নতুন জলকাদা।

"আবার দেখা হবে এখন।" "কে জানে, কোনো কিছুরই তো ঠিক নেই।" —কেউ কেউ এই ধরনের কথা বলে। কেউ কেউ হয়তো আরো দুটো কথা বেশি বলে। হয়তো বা দুটো বেশি দীর্ঘনিঃশ্বাসও শোনা যায়। কেউ হয়তো বা বলে "আমরা এইসব পচাধসা লোক, একরাতের দেখার পরই সব শেষ করে ফেলি। আবার দেখা হবে একথা বলার কোনোই প্রয়োজন নেই।" কথা কয় বুড় আপন করে।

এই ধরনের এক দলের মধ্যে যদি এক পাকা ভবঘুরেও থাকে তাহলে তারও বিদায়ের সময় মনের মধ্যে একটু টান যে লাগবে না তা নয়। আরো মজা এই যে এই সব ধরনের সরাইএর দেয়ালে তুমি দেখবে ছুরি দিয়ে কেটে কিংবা খোয়া ঘষে কিছু না কিছু লেখা আছে। হয়তো কোন গ্রামের কোন লোক কবে এই সরাইয়ে ছিল—তার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি। কিংবা দু-এক লাইন পদ্যের মত কিছু—তার মধ্যে ছন্দ বা মিলের বালাই নেই। সরাইখানার এই সব লোকের দেখাশোনাও হয়েছে যেমন হঠাৎ, চেনাশোনাও তেমনি আকস্মিক। একটু ক্ষণের জন্যেই আনন্দ, একটু ক্ষণের জন্যেই ভোলা, কিংবা সব কিছু মনে পড়ে যাওয়া। তারপর মনে কোন উদ্দেশ্য না রেখেই খোলা মনের আবেগ এরা ঢেলে দেয়—তাতে করে মানুষে মানুষে ঘনিষ্ঠতার ভাবটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

আগেকার দিনে লোকে যেমন গাইত—

আপনি এসেছেন গাড়িতে,
    আমার মাথায় ঘাসের টুপি।
আবার একদিন আসবে যেদিন
    গাড়ি থেকে নেমে আমি নমস্কার জানাবো।
আপনি নেবেন আমার পেঁট্‌রা
    আর আমি চড়বো ঘোড়ায়
      আপনি সেদিন আবার নামবেন নীচে।

এই ধরনের গান হয়তো এই রকমেরই এক পরিবেশের মধ্যে লেখা হয়েছিল।

ধর্মান্তর

শিয়াও ছিয়েন

(১৯১২—)

শিয়াও ছিয়েন-এর জন্মস্থান হোপেই প্রদেশ। পেইচিং-এর রাস্তা থেকে কুড়িয়ে মিশনরিরা তাঁকে অনাথ আশ্রমে মানুষ করেন। মিশমরি স্কুলেই তাঁর শিক্ষা লাভ হয। আমেরিকান মিশনরিদের যে ইয়েন-চিং শিশ্ববিদ্যালয় পেইচিং-এ ছিল সেইখানে তিনি জার্নালিজম-এর ডিগ্রি নেন। তাঁর প্রায় প্রত্যেক লেখাতেই তিনি বিদেশি মিশনরিদের প্রবলভাবে আক্রমণ করেছেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দ থেকে তাং-কুং-পাও খবরের কাগজের সংবাদদাতা হিসেবে তিনি লণ্ডনে ছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্য নিয়েও গবেষণা করেছেন। তাঁব বচনা থেকে তাঁব রাজনৈতিক প্রবণতার কোন ইঙ্গিতই পাওয়া যায় না। শিয়াও ছিয়েন-এর রচনা যদিও খুবই কবিত্বপূর্ণ এবং অলঙ্কারময় কিন্তু তিনি রম্যবচনা এবং গল্প ছাড়া আব বিশেম কিছু লেখেন না। শাংহাই-এর ফু-তান বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যুদ্ধের পর অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি এঁর লেখা বড় একটা ছাপা হয়নি।

“পোড়া চোখ আমার! এক সময় এই চোখ-জোড়া দিয়ে কাপড়ের গায়ে ছুঁচের ফোঁড়ে ফুটিয়ে তুলতুম ড্রাগনের খেলা আর এখন এরা একটা ছুঁচের ছেঁদাও চিনতে পারে না। বয়স বেড়েছে, সত্যিই বুড়ো হাবড়া হয়ে পড়েছি!”

বুড়ি বসেছে খাং-এর একধারে। হাতে একটা বাদামি রঙ-এর লম্বা জোব্বা, পুরু কোরিয়ান কাগজ-আঁটা জানলার ভিতর দিয়ে যেটুকু ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে তারই দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে। এক মনে সে চেষ্টা করছে একটা নরম সুতোর আগাকে এক টুকরো শক্ত লোহার ভিতর ঢোকাতে। সুতোটাকে ভিজিয়ে পাকিয়ে সরু করে তাকে যত উৎসাহই দিক সুতোটার মুখ একেবারেই অকর্মণ্য। ছুঁচও বাধা দেয়। অনেক বারই মনে হয়েছে ঢুকেছে বুঝি, কিন্তু যে-কাঁপা-হাতে সে ছুঁচ ধরে আছে সেটা ছেড়ে দিলেই সুতোটা ছুঁচ ছাড়া একাই ঝুলে পড়ে যেন শীতের পাতা-ঝরা একখানা ডাল।

“ওরে পাজি শয়তান ছুঁচ! তুইও এই হতভাগীকে ঠকাবি?” এই বলে সে গলা চড়িয়ে বিজয়ের সুরে বলে ওঠে—“আচ্ছা এবার শঠে শাঠ্যং করছি।”

সে চেঁচিয়ে ডাকে "নিউ-নিউ, নিউ-নিউ! মাকে একটু সাহায্য করসে। এই পাজি সুতোটাকে একটু শিক্ষা দাও তো।"

কিন্তু উত্তরে আসে আট-পরী টেবিলের উপর বসানো একটা ঘোড়ার খুরের আকারের ঘড়ির ভারি ঠক্ ঠক্ শব্দ। এটা তার ছেলে 'স্বর্গ-সেতুর' একটা পুরোনো-জিনিসের দোকান থেকে কিনে এনেছিল।

"নিউ-নিউ, কালা মেয়ে, উত্তর দিচ্ছিস না কেন ?"

একটু আগেই ওরা দুজনে সেলাই নিয়ে মুখোমুখি বসেছিল। বুড়ি মেয়েকে খুঁজতে ওঠে। পাশের ঘরে টেবিলে দেখে এখনও খাবারের ঠাঁই হয়নি; এক টুকরো শুয়োরের চবি, ছোট একটা বাঁধা কপি, জন্মানো শালগমের এক টুকরো, কাঁচা আদার সরু সরু কুচি এই সব পড়ে আছে। একটা আধ-ছাড়ানো পেঁয়াজ টেবিলের এক কোণে উল্টে পড়ে আছে—দেখলেই বোঝা যায় ফাঁকিবাজ রাঁধুনি কিরকম তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে। মাথার উপরে ঘরের চালে কয়েকটা নেংটি ইঁদুর দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ খট্ করে একটা শব্দ হয়। ওদের মধ্যে একটা নিশ্চয় মাটিতে পড়েছে। অনেক দিনের জমা ধুলো যেন বরফের মত ঝরতে থাকে। রেগে সে একবার কড়িকাঠের দিকে আর একবার টেবিলের দিকে তাকায়।

"নিষ্কর্মা ছুঁড়ি! গেল কোথায় ?"

দরজার কাছে গিয়ে বুড়ি তার থুরথুরে দেহের সব শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকে। দক্ষিণ দিকের যে-বাড়িতে নিউ-নিউ প্রায়ই লান-সিয়াং বলে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় সেই বাড়ির উদ্দেশে। লান-সিয়াং আর নিউ-নিউ দুজনেই একদিন অন্তর 'ছাই'-এর দোকানে যায় মোজা সেলাই-এর কাজ সংগ্রহ করে আনতে। কে আগে সেলাই করতে পারে এই নিয়ে রেষারেষি হয়; কে কত পয়সা রোজগার করছে তারও তুলনা চলে। নিউ-নিউ ওখানে থাকলে লান-সিয়াং-এর সঙ্গে হয়তো নিজের উঁচু দরের সেলাই নিয়ে কিংবা সম্প্রতি কাজের যা চাপ পড়েছে এই নিয়ে গল্প গুজব চলতো, কাজেই মার ডাক শুনে তক্ষুনি জবাব দিতো—"এই যে আসি মা!"

আজ বুড়ি দু-দুবার চেঁচিয়ে ডাকলো কিন্তু মাটির ভাঙা দেয়ালের তলায় কয়েকটা হাড্ডিসার মুরগির শব্দ ছাড়া আর কোনো জবাব এল না। মুরগি কটা খাবারের আশায় কচাকচি লাগিয়ে দেয়। খোলা খাটা-পায়খানার পাশে যে হলদে কুকুরটা শুয়ে ছিল বুড়ির গলা শুনে সেটাও উঠে পড়ে। একবার মাথাটা

তোলে ; তারপর যখন দেখে তার করবার মত কিছু নেই তখন হাই তুলে আবার চোখ বোজে।

প্রথম শীতের পাংশু বর্ণ আকাশে কয়েকটা ঘুড়ি উড়ছে ; যেন, স্বপ্নালু হয়ে ছেড়ে দিয়েছে নিজেদের বাতাসের মর্জিতে। বুড়ি সেগুলোর দিকে তাকায়, তারপর বাতাসের দিকে চেয়ে গালাগালি দিয়ে ওঠে যেন ওরই মধ্যে একটা ঘুড়ি হচ্ছে তার পলাতকা মেয়ে।

"গাছ-চড়ানি মেয়ে! তোর বয়েস কম, দেখতে ভালো বলেই কি তুই এই হতভাগি বুড়িটাকে একলা ফেলে যাবি ?" রেগে মাটিতে থুথু ফেলে সে বাড়ির মধ্যে ফিরে আসে বিড়বিড় করতে করতে।

"রোসো বদমায়েস ছুঁড়ি, তোমার মজাটা টের পাওয়াচ্ছি! আমার ছেলেকে একবার বাড়িতে আসতে দাও, সব বলে দেবো!"

আধ-ছাড়ানো পেঁয়াজগুলোকে টেবিলের উপর ছড়ানো দেখে সে আরো খেপে ওঠে।

"ছেলে এলে তাকে এমনি করে বলবো—'নিউ-নিউ ভাল মেয়ে নয়। পাগলের মত ছুটে বেড়ায়। কে জানে কী করে ? ফের যদি কেউ ওকে অপমান করে তাহলে খবরদার তুমি ওর হয়ে মোরগের মত লড়তে যেতে পাবে না।' নচ্ছার মেয়ে, এই বুড়ি তোর কি করে একবার দেখ।"

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ছেলে ফিরে এসেই খেতে চাইবে এই ভেবে সে তার অর্ধ-সমাপ্ত জোব্বাটাকে রাগতঃ ভাবে ঠেলে সরিয়ে দেয়। তারপর দরজার ধারে বসে পেঁয়াজ ছাড়াতে শুরু করে। চোখ দিয়ে যত জল পড়ে, একঘেয়ে স্বরে মেয়েকেও তত গালাগালি দিয়ে চলে।

চৌকিদার যখন মই লাগিয়ে রাস্তার লণ্ঠনগুলো জ্বালছে নিউ-নিউ তখন ফেরে। বাড়িতে ঢোকে সে ভারি প্রফুল্ল মনে। ভুলেই গেছে যে বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছে তখন সূর্য ছিল 'শাদা-ঘোড়া-মন্দির'-এর নিশেন-কাঠির অনেক উপরে। তার বগলে একটা পুস্তিকা আর গুন্‌গুন্ করছে একটা অপরিচিত সুর।

তেলের খরচ কমাবার জন্যে বাতিটা কমানো। সেটা যেন ভাঙা গলায় ইটের উনুনের আগুনটার সঙ্গে আলাপ করছে। বুড়ি একটা ভোঁতা ছুরি দিয়ে জরানো শালগমটা কুচোচ্ছে। দরজায় তার তরুণী হাসিখুসি মেয়ে এসে উপস্থিত হতেই সে নতুন করে শাপাস্ত করতে থাকে।

"পাজি মেয়ে, তোর বদমাইস ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলি, বুড়ি মাকে একলা ফেলে বাড়িতে ?"

"মা বকোনা আমাকে।"

নিউ-নিউ যেন একটা পাখির মতন মায়ের পাশে ছুটে যায়; গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে।

"মা আজ আমি আশ্চর্য চমৎকার সব জিনিস দেখেছি—"

নিউ-নিউ বুঝতে পাবে এরকম ভাবে বল্লে চলবে না, কথার ধরনটা বদলাতে হবে। সে ব্যাখ্যা করতে বসে—

"মা, আজ বিকেলে যখন আমি পেঁয়াজ ছাড়াচ্ছিলুম হঠাৎ শুনি আমাদের ফটকের সামনে একটা বিদেশি দামামার শব্দ; সেই যেটা আমরা সারা হপ্তা ধরে দূর থেকে শুনেছি। শুনতে পাওনি কি—তুম্-তুম্, তুম্-তুম্? ওঃ তোমাকে বলে যে যাবো তারও সময় পেলুম না। দৌড়ে আমি বাইরে চলে গেলুম। ওঃ! যা দেখলুম—"

বুড়ি কিন্তু কান বুজে নিজের মনে শালগম ছাড়াতে থাকে। নিউ-নিউ মায়ের কাপড় ধরে টানে।

"শোনো না মা! দেখলুম প্রকাণ্ড একটা নিশেনের পিছনে অনেক লোক কুচ-কাওয়াজ করে চলেছে। নিশেনের কাছেই একটা মস্ত বিদেশি দামামা; তাই থেকে চমৎকার আওয়াজ বেরোচ্ছে। আর পিছনে পিছনে আরো অনেক ছোটো ছোটো দামামা, ধারে ধারে তাদের ঘণ্টা বাঁধা

দামামাটা যে কত বড় তাই দেখাতে গিয়ে সে জরানো শালগমের শিশি প্রায় উল্টে ফেলে আর কি।

"ওরে জংলী ছুঁড়ি! যত বড়ই হোক তোর দামামা, তাবলে আমার এই ভালো শালগমটা তুই নষ্ট করবি না কি?"

"তোমাকে কিন্তু মা শুনতেই হবে। ছাই রঙ-এর য়ুনিফর্ম-পরা অনেকগুলি লোক। কাঁধে তাদের লাল ফিতে আঁটা। তারা ভদ্র এবং পরিচ্ছন্ন, আমাদের ঐ সেপাই দাদার মত মোটেই নয়। তাদের মধ্যে অনেকগুলি মেয়েও ছিল, তাদেরও ছাই রঙ-এর য়ুনিফর্ম আর লাল ফিতে। সমস্ত এমন পরিষ্কার, সুসঙ্গত, এমন চমৎকার যে কি বলবো। আর মা, কি চমৎকার তারা গান গাইছিল। গাইতে গাইতে বাজাচ্ছিল তাদের ছোট ছোট বাজনাগুলো।

মিছিলের নানারকম শব্দের অনুকরণ করতে গিয়ে নিউ-নিউ তার মাথা

আর কোমর দোলায়। তার এই স্ফূর্তির অভিব্যক্তিতে তার মা আরো চটে ওঠে।

"আর তাই, গাছ-চড়ানি মেয়ে তুমি তাদের পিছু-পিছু খ্যাপার মত ধাওয়া করলে বুড়ো মাকে একলা ফেলে? এই তো?"

"না মা, আমি তো জানতুম যে আমি তাদের সঙ্গে যেতে পারি না। তোমাকে যে একলা ছেড়ে যেতে পারবো না এ আর আমি কি করে ভুলি বলো? 'নিউ-নিউ একটু অ্যারারুট সিদ্ধ করে দাও তো' 'নিউ-নিউ, এই দেখ ডাবর ভর্তি হয়ে রয়েছে' 'নিউ-নিউ এই দেখ,—"

মেয়েটি মায়ের অনুযোগ-ভরা হুকুমগুলোর এমন চমৎকার নকল করে যে বুড়ি অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে ওঠে।

"ওরে নকলনবিশ বক্তিয়ার! কবে আবার আমি সারাক্ষণ তোর সঙ্গে ওরকম করি? এই দেখ না, আমার আজকের কাজ এই শালগমটা ছাড়িয়েছি, তারপর ঐ—"

ছোট ইটের উনুনের উপর ফুটন্ত কড়াটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ছেলেমানুষদের মত বুড়ি বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করে।

"যাই হোক, আমি তো আর যেতুম না, কিন্তু ওরা যে মা আমায় ডাকলে। ছাই রঙ-এর কাপড়-পরা একজন মেয়ে আমাকে অনেকবার ডাকলো।"

"ও! ডাকলো বুঝি?" বুড়ি আর তার কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না। "কে সে?"

"কি জানি, আমি ঠিক চিনতে পারলুম না, তার মাথায় একটা ছাই রঙ-এর 'পদ্ম-পাতা' টুপি ছিল কি না। আমি যখন তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলুম সে দলের মধ্যে থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে আমার জামার হাতা ধরে টানলো—"

"সত্যি নাকি? এমন করলো?"

"সে বল্লে 'নিউ-নিউ চলে এসো'। আমি খুব ভালো করে তার দিকে চেয়ে দেখলুম—"

বুড়ি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে—"মেয়েটা তাহলে কে শুনি?"

"দেখলুম সে চু-চে—সেই যে মেয়েটি আমার সঙ্গে মোজা সেলাই করতো।"

"ঐ যে মেয়েটি বিনুনীতে সবুজ ফিতে বাঁধতে ভালোবাসে সেই তো?"

"হ্যাঁ সেই। কিন্তু এখন আর তার সবুজ ফিতে পছন্দ হয় না। তার এখন সুন্দর পোষাক, এমন কি জুতোটা অবধি বিদেশি চামড়ার তৈরি।"

"ওর বাপ তো জুয়োড়ি।" বুড়ি পাকাচুল-ভরা মাথা চুলকে বলে ওঠে। নিজের স্মৃতিশক্তির দৌড় কত তাই দেখিয়ে বলে—"বৌকেও তো প্রায় মারধোর করত না?"

নিউ-নিউ এক নিঃশ্বাসে বলে চলে—"শোনো মা, আমি তো তাদের মিছিলে তাই ঢুকে পড়লুম। সেই বড় দামামাটা ছিল আমার থেকে ঠিক তিন পা আগে। আমি একেবারে সামনের দিকে ছিলুম!" দুজনের মুখই গর্বে লাল হয়ে ওঠে। ইটের ছোটো উনুনটায় আগুনের লাল জিভ লক্‌লক্ করে ওঠে।

"আমি জিজ্ঞেস করলুম 'চু-ছে, আমাকে কোথায় নিয়ে চলছ?' ঘণ্টা-ওয়ালা বাজনাটা বাজাতে বাজাতে ও খুব গম্ভীর হয়ে আমার কানে কানে বল্লে—'আমাকে আর চু-ছে বলে ডেকো না। এখন আমার নাম রেবেকা। আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি হল্-এ।' আমার তোমার জন্যে মা ভাবনা হচ্ছিল। আমি বাড়ি ফিরে আসতে চেয়েছিলুম সত্যি। কিন্তু ও আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে চল্লো। আর কি সুন্দর গানই ওরা গাইছিল। শোনো মা 'যিশু আমার ভালবাসেন···স্বর্গের ভগবান।' আমি যখন বিদায় নিলুম তখন এই দেখ ওরা আমায় কি দিল।"

মেয়েটি আট-পরী টেলিবের কাছে গিয়ে আলোটা উস্কে দেয়। আলোর জিভটা খুশি হয়ে লম্বা হয়ে ওঠে। ছোট্ট ঘরটির মধ্যে ধোঁয়া আগুন আর বাতির আলোয় মেয়েটির মুখ গোলাপের মত রাঙা হয়ে ওঠে। মা আর মেয়ে গর্বের সঙ্গে কাগজটা দেখে। মলাটের উপর একটা রঙীন ছবি। ভিতরে কি লেখা আছে দুজনের কেউই পড়তে পারে না। বুড়ি কাগজের উপর প্রায় নাক ঠেকিয়ে ছবির উপর তার নিষ্প্রভ চোখ বোলায়। ঝাপসা ভাবে দেখতে পায় একটা দাড়িওয়ালা ন্যাংটা মানুষ এড়োএড়ি দুটো কাঠের উপর দাঁড়িয়ে।

বুড়ি বলে—"এ বোধহয় বর্বর জাতির কেউ হবে······কি রকম কাটা-কাটা শক্ত কপাল দেখছো না?"

"না বর্বর জাতের কেউ নয়। উনি হচ্ছেন যীশুখৃষ্ট।"

বুড়ির হঠাৎ মনে পড়ে যায় বক্সার বিদ্রোহে খৃষ্টানদের হত্যার ছবি। সে নিজের চোখে দেখেছে সদ্য সদ্য কাটা কয়েকটা মানুষের গোল গোল মাথা রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

নিউ-নিউ ঝোঁকের মাথায় বক্ বক্ করে চলে : "ওরা বলে আমাদের সবার মধ্যে পাপ আছে, আর যীশু নাকি আমাদেরই জন্যে মরেছিলেন, তাই আজও আমরা বেঁচে আছি। একবার চেয়ে দেখো না মা, কি সুন্দর ছবিটা! এই ক্রুশের উপর তিনি তোমার আমার জন্যেই প্রাণ দিয়েছিলেন। ওরা বলে আমাদের সবাইকে এই ধর্মে বিশ্বাস করতে হবে……"

মেয়েটি সেদিন যেসব যাদুময় নতুন ভাব নতুন আদর্শের কথা শুনেছে তাই আওড়াতে থাকে ; বুঝতেই পারে না মায়ের মনে সেগুলো কি ত্রাসেরই না সঞ্চার করছে।

"এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না। পাপ, বই কি! শেষে ঐ বর্বরগুলোকে বিশ্বাস করে সেবারকার মত বক্সারদের হাতে মারা পড়ি, আর তারপর অসভ্য সেপাইগুলো শহরে ঢুকে আমাদের যা কিছু মূল্যবান সব ধ্বংস করুক আর কি? আমি তো আমার এক পা কবরের দিকেই বাড়িয়ে আছি তবু আমার এই চিরকেলে জীবন অত সস্তায় বিকোতে পারবো না। নিউ-নিউ, আজ থেকে আমি তোমাকে ও জায়গার ধারও মাড়াতে বারণ করে দিলুম। শুনতে পেয়েছ ভালো করে? ওখানে যদি যাও তোমার বর জোটানো দুর্ঘট হবে।" বুড়ি হাত বাড়িয়ে সেই কাগজটা ধরতে যায়।

নিউ-নিউ যা দেখেছে যা শুনেছে তার এমন হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায় নিজেই এমন মোহাবিষ্ট হয়ে থাকে যে মায়ের হঠাৎ এই রকম বেয়াড়া ধরন-ধারন তাকে ভীষণ রকমের আঘাত করে। মনে মনে তার বড় অভিমান হয়। ছাই রঙের কাপড়-পরা সেই লোকগুলি তার সঙ্গে কি নম্র কি ভদ্র ব্যবহার করেছিল। এই কথা ভেবে মায়ের এই অপমানকর ভাষাকে সে ঘৃণা করতে শুরু করে। সে কাগজটাকে নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে ঠোঁট কাঁপাতে কাঁপাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মেয়েকে চলে যেতে দেখে বুড়ি মাথা নাড়তে থাকে ; মনে হয় যেন বলছে—"ওরে মেয়ে! কতটুকুই বা তুই দেখেছিস? এ বুড়ি তোর চেয়ে অনেক অনেক বেশি নুন খেয়েছে, হুঁ।"

তারপর পিঠ নুইয়ে শোনে ফুটন্ত হাঁড়ির শোঁ শোঁ শব্দ, যেন শরবনের মধ্যে দিয়ে সন্ধ্যার হাওয়া আসছে। পিঠেগুলো ভালো করে সিদ্ধ হবার আগেই ধোঁয়াটা যাতে বেরিয়ে না যায় সেই জন্যে কঁড়ার ঢাকনিটা পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে চেপে আঁটা। সেই ঢাকনিটার ধারে ধারে বুড়ি খানিকটা শোঁকে

পিঠে গুলো কতখানি তৈরি হল তাই অনুমান করবার জন্যে। তারপর আঙুল দিয়ে গুনতে থাকে। কেট্‌লিটা দিয়ে যখন ধোঁয়া বার হতে আরম্ভ হল তখন সবেমাত্র কাঠকয়লাওয়ালা দরজার সামনে দিয়ে চলে গেছে। আকাশে এখন অনেক তারা। অনেকটা সময় সিদ্ধ হল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণত এইসব গুরু বিষয়ে মা আর মেয়ে কেউই নিজের একলার মতের উপর নির্ভর করতে সাহস করে না। যতক্ষণ না দ্বিতীয় জন মাথা নেড়ে বলে—"খুলে ফেলো হাঁড়িটা ; এতক্ষণে আর কাঁচা নেই" ততক্ষণ হাঁড়ির ঢাকা খোলা হয় না। দুজনে মিলে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেই সাত আটটা সিদ্ধ পিঠে ঢেলে বার করা হয়, আর ঘরটা গরম কুয়াশায় ভর্তি হয়ে ওঠে। এমন যদি হয় যে ঢাকাটা একটু তাড়াতাড়ি খোলা হয়ে গেছে, পিঠেগুলো কাঁচা রয়ে গেছে, তাহলেও কেউ কাউকে দোষ দেয় না। তারপর ইস্কুলের দরোয়ানি সেরে ছেলে বাড়ি এসে খেতে বসে যখন দেখে পিঠেগুলো দাঁতে লাগছে, সে চটে বকাবকি শুরু করে। মা আর মেয়ে দুজনেই তখন মাথা হেঁট করে দম বন্ধ করে সহিষ্ণু হয়ে তার বকুনি শুনে যায়। সুতরাং এইবার বুড়ি আস্তে আস্তে নরম স্বরে ডাকে—"নিউ-নিউ পিঠেটা শুঁকে যা তো। দেখ্ তো ঠিক হয়েছে কি না।"

ভিতরের ঘর থেকে শুধু একটা চাপা ফোঁপানির শব্দ আসে।

'পুব-শহর'-এর সন্ধ্যার ঘণ্টা যখন বাজছে ঠিক তখন একটা বিরাট কালো ছায়া-মূর্তি বাড়িতে ঢোকে। সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর লোকটির সামনে এক বাটি তরকারি দেওয়া হয়। এক একটা করে তিনটে নীল রং-এর কাঁচের বাটিতে বুড়ি ডালের স্যুপ ঢালে ; বাটিগুলি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। নিউ-নিউ বাটি কটা ছোট টেবিলটার উপর সযত্নে রাখে। তারপর লোকটির ইস্কুলের খবর শুরু হয়। থিয়েন-আন-মেনের কোনো বিরাট জনসভায় তার ইস্কুলের দল সম্প্রতি গিয়েছিল। নানান্ বুলি-লেখা ছোট ছোট ইস্তাহার তৈরি করতে সে ছেলেদের কি রকম সাহায্য করেছিল ; তারপর ইস্কুলের কর্মকর্তা ঝাঁটা খরিদ করতে গিয়ে কত টাকা সরিয়েছে ; কিংবা মোটা হেড-মাস্টার মশায় ছেলেদের যুনিফর্মের কাপড় থেকে কেমন করে নিজের একটা ওভারকোট বানিয়েছে, এই সব খবর শেষ করে সে মাকে প্রশ্ন করে :

"আচ্ছা মা, তিন দিন আগে লি সাহেবের লম্বা গাউনটা যে আনলুম তোমাকে দিয়ে সেলাই করাবার জন্যে সেটার কি হল? তিনি খোঁজ করছিলেন।"

নিজেদের সামান্য আয় কিছুটা বাড়াবার জন্য চিংলুং প্রায়ই মায়ের জন্যে সেলাই-এর কাজ জোগাড় করে আনে।

বাটি রেখে বুড়ি জবাব দেয়—"আমি বিশেষ, কিছু করতে পারি নি। সারা বিকেল নিউ-নিউ বাইরে কাটিয়েছে। ছুঁচে যদি সুতো পরাতে না পারি তাহলে আমার চোখ-জোড়াকে ছুটি দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি ?"

চিংলুং বোনের দিকে তাকিয়ে তার অদ্ভুত ভাবটা লক্ষ্য করে। সাধারণত খাবার সময় সে উজ্জ্বল কালো চোখে দাদার দিকে উৎসাহে তাকিয়ে থাকে আর ছেলেদের কাছ থেকে শেখা কিছু কিছু 'বিদ্রোহ সংগীত' শোনাবার জন্যে পেড়াপিড়ি করে। আজ সে মুখ বুজে বসে বাটিতে চুমুক দিয়ে টক ডালের স্যুপটা কোনক্রমে গলাধঃকরণ করছে। পিঠের আধখানাও খেতে পারে না। কোনো প্রশ্ন নেই। হাসি নেই। কপালের উপর তার কোঁকড়ানো চুল, আর তারই মাঝে একজোড়া কেঁদে-কেঁদে ফুলে-ওঠা লাল চোখ !

চিংলুং তার বোনকে ভালবাসে। কেউ যে বোনকে অসম্মান করবে এ সে কখনও সইতে পারে না। প্রায়ই সে বোনকে বলে—"নিউ-নিউ, জীবনে আমি যখন উন্নতি করবো তখন আমার প্রথম কাজ হবে তোমাকে ইস্কুলে পাঠানো। আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে ঐ মোজাগুলো সেলাই করো তারপর একদিন আমি তোমারই পায়ে সিল্কের মোজা পরাতে পারব। নিজের শিরদাঁড়া সিধে করে রাখো, গরীবদেরও একদিন আসবে। ছাত্রেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে-সব স্বদেশ-প্রেমের বক্তৃতা করে তাতে তো তারা প্রায়ই বলে—'ভবিষ্যৎ হচ্ছে আমাদের মতো গরীবদের জন্য'।" একবার পাড়ায় কে একজন তার বোনকে অপমান করেছিল। চিংলুং যখন খবরটা পায় তখন সে ইস্কুলে ব্ল্যাকবোর্ড সাফ করছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে চলে এসে লোকটার সঙ্গে লড়াই লাগায় যেন দুটো রাস্তার কুকুরের মতো। আজ সন্ধ্যায় তাই তার ভয় হয়, আজও বোধহয় কেউ নিউ-নিউকে অপমান করেছে।

"কি হয়েছে নিউ-নিউ ?"

মেয়েটি মাথা হেঁট করে কোনো কথা বলে না। তার চোখের পাতায় অশ্রুর ফোঁটা দুটি যেন বৃক্ষশাখায় ভীরু পাখীর মতো ; আর একটু কিছু বল্লেই উড়ে পড়বে নিচের দিকে !

"বলো আমায়, নিউ-নিউ ?" তার অন্তর্জ্ঞান তাকে যেন বলে এ-ক্ষেত্রে

পুরুষশক্তির দরকার। কাজেই চপষ্টিক দুটো রেখে দিয়ে সে ভীষণভাবে হাতা গুটোতে থাকে।

"আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু তা বলে অবিচার সইবো না। কে বল তা, আমি সেটার হাড় গুঁড়িয়ে—"

বুড়ি বাধা দেয়। ছেলেকে এমন অন্ধভাবে বোনের পক্ষ নিতে দেখে সে রাগ করে।

"দাঁড়া গোঁয়ার গোবিন্দ! শোন্ আগে ব্যাপারটা। আমি তো ওর সঙ্গে মোটেই খারাপ ব্যবহার করি নি। বুনো হাঁসের মতো ও রোদ থাকতে বাইরে বেরিয়ে যায় আর ফেরে অন্ধকার হলে। এদিকে বুড়ো হাড় ক'খানা নিয়ে আমি একলা পড়ে থাকি বাড়িতে। এই নিয়ে দুটো কথা বলেছি মাত্র, তাইতেই এত!"

চিংলুং বুঝতে পারে ব্যাপারটা যা ঘটেছে তা পরিবারের মধ্যেই ঘটেছে। সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে, আবার চপ ষ্টিক দুটো তুলে নেয়। তারপর কঠোর দৃষ্টিতে অনুযোগের স্বরে জিজ্ঞেস করে:

"সারা বিকেল কোথায় ছিলে?"

কথাটার গাম্ভীর্যে বুড়ি আরাম পায়, সে বেশ খুশি হয়ে ওঠে।

নিউ-নিউ মাথা হেঁট করে থেমে থেমে জবাব দেয়—"আমি—আমি 'স্যাল্‌ভেশন আর্মি'তে গিয়েছিলুম।"

"সেখানে কি করতে গিয়েছিলে? যত সব মাথা খারাপ 'বর্বরের' দল, পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় দামামা পেটায়, আর নিজেদের বাঁদরামির খেলার জন্যে গরীব চীনে-বেচারাদের ভাড়া করে নিয়ে যায়। ঐ 'বর্বর' সেপাইগুলো সম্প্রতি শাংহাই-এ গণ্ডায় গণ্ডায় চীনেকে খুন করেছে। স্যাল্‌ভেশান না ঘোড়ার ডিম!" হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় যেদিন সে ইস্কুলের প্রকাণ্ড নিশেন ঘাড়ে করে মিছিলের আগে আগে গিয়েছিল সেদিন থিয়েন-আন্-মেন্-এ ছাত্রদের তরফ থেকে কি বক্তৃতা সে শুনেছিল। "ওরা সব সাম্রাজ্যবাদী, সব সাম্রাজ্যবাদী!" কথাটা চমৎকার শোনায়। বরং তুমি সারা জীবন মোজা সেলাই করবে সে-ও ভালো তবু ঐ 'বর্বরদের' হাতে তোমাকে কিছুতেই পড়তে দেবো না। শোনো —আর কখনও ওখানে যাবে না, এর উপরে আর কথা নেই।"

ছেলের কথায় বুড়ি মা ভারি খুশি হয়ে ওঠে। এই সুযোগে তার বহুকালের পেটে-জমা যত ঐতিহাসিক তথ্য তা বার করতে থাকে। বক্সারেরা যখন পশ্চিম সহরে ফরাসী গির্জে পুড়িয়েছিল সে যে কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল তার গল্প

করে। তারপর বলে, বিদেশীদের আটটা জাতি কেমন করে পেইচিং-এর ন'টা পল্লী একেবারে লুটে সাফ করে নিল।

"তখন আমার বয়েস আঠারো বছর……"

তারপর যখন বুড়ি তার সেই একশোবার-বলা গল্প, তার পরিবারের সেই তখনকার কালের পলাতকা জীবনের ইতিহাস, বলতে শুরু করে, তখন সারা দিন ধরে ইস্কুলের চৌকি ডেস্ক বয়ে বেড়িয়ে ক্লান্ত তার ছেলে, বেচারা ক্লান্তির হাই তুলতে শুরু করে। শীঘ্রই আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। তিনজনে একটা 'খাং'-এর উপর যে যার জায়গায় শুয়ে পড়ে।

পাতলা কম্বলে-ঢাকা নিউ-নিউ কিন্তু সব কথা বিশ্বাস করে না। আজকের দিনের অপূর্ব অভিজ্ঞতায় তার মন যে সমুজ্জ্বল স্বপ্নে বিভোর, ইতিহাসের ঘটনাগুলো তাকে হটিয়ে দিতে পারে না। তার মনে হয় দেয়ালের ধারে তার দাদার কর্কশ নাসিকা গর্জন, সে যেন রঙিন নিশেনের পিছনে বিদেশী দামামার শব্দ। মায়ের হাঁপের কাশি যেন সেই ঘণ্টা-ঝোলানো ছোট ছোট বাজনাগুলোর বাদ্যি। নিউ-নিউ কল্পনা করে নেয় মিছিলের আগে আগে সে চলেছে সবার দৃষ্টির সামনে দিয়ে।

তার মনে হয় বিদেশীদের উপর তার মা আর দাদা অন্যায় বিচার করেছে। সেই শিক্ষয়িত্রীটি, তাঁর কি সুন্দর সাদা নরম হাত আর এমন মিষ্টি করে চীনা কথাগুলি বলেন যে মনে হয় যেন তিনি আমাদেরই একজন।……মিছিলের সঙ্গে নিউ-নিউ যখন হল-এ ঢুকেছিল তখন সে ছিল প্রায় নববিবাহিতা বধূর মতই ভীরু অথচ গর্বিত। সুন্দর হল্‌ঘরটি। লাল, সবুজ, কাঁচ-লাগানো জানলা; সমস্ত রংই সত্যি এমন চোখ ঝলসানো যে মনে হয় পরীরাজ্যে প্রবেশ করলুম। মাথার উপরে সব দেশের ছোট ছোট সুন্দর সব নিশেন টাঙানো। আর সেই খয়েরি রং-এর য়ুনিফর্ম-পরা বিদেশী লোকটির কি না চমৎকার গলার স্বর! তিনিই যে গানের নেতা হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

বিনিদ্র নিউ-নিউ কেবল এ-পাশ আর ও-পাশ করে। রাত তৃতীয় প্রহরের ঘণ্টা বেজে যায়। মাংসের পিঠেওয়ালার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি রাতের জুয়াড়ীদের খানিকটা বিশ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়। অন্ধকারে নিউ-নিউ নিজের ঠোঁট কামড়াতে থাকে। যদি আর সে সেই শিক্ষয়িত্রীটির কাছে ফিরে না যায়, যাঁর কাছে সে এত ঋণী……? তিনিই ঐ সুন্দর কাগজটা নিউ-নিউ-র পকেটে দিয়ে তাঁর কোমল সাদা আঙুল দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন—"কাল আবার

এসো, কাল এর চেয়েও ভালো একটা দেবো।” বিদেশী মেয়েটির ভারি মন-ভোলানো হাসি। চলে আসবার সময় তিনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে নিউ-নিউকে একেবারে অবাক করে দিয়ে কানে কানে বল্লেন :

“মনে থাকে যেন তুমি ঈশ্বরের।”

ঈশ্বর……যীশুর কাছে এসো……তুমি ঈশ্বরের……কোমল হাত দুটি…… খয়েরি পোষাক-পরা লোকটির চমৎকার কণ্ঠস্বর……

* * *

এমনিতে নিউ-নিউ খুব ভোরে উঠে ইঁটের ছোট উনুনটা ধরিয়ে, দাদার মুখ ধোবার গরম জল তৈরি করে রাখে। তারপর রাস্তা থেকে দাদার জলখাবারের জন্যে গমের কেক কিনে আনে। তারপর সারা সকাল মায়ের সামনে মুখোমুখি বসে নিপুণভাবে মোজা সেলাই করে চলে। যে সব সেলাই বুড়ির চোখের পক্ষে একটু বেশি সূক্ষ্ম সেগুলোকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে নিউ-নিউ। প্রায়ই নিউ-নিউ নিচু ভরাট গলায় কতরকম পল্লী গান গায়। মাঝে মাঝে ক্ষীণ-দৃষ্টি মার সঙ্গে পরিহাস করতেও ছাড়ে না :

“এসো মা আমাদের কাজ দুটো অদল বদল করি। তুমি আমার মোজাটা সেলাই করো, আমি তোমার বোতামগুলো টেঁকে দি।”

বুড়ি তাড়াতাড়ি নিজের সেলাইটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে—“ভারি তো তোমাদের কলের সেলাই, আমার এই পুরোনো হাতের সেলাই অনেক ভালো।”

অন্ধ গনৎকারটা যখন পিতলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ফটকের সামনে দিয়ে যায় তখন নিউ-নিউ বুঝে নেয় এগারোটা বেজেছে। মোজাগুলো সরিয়ে রেখে মাকে বলে :

“মা, আমার জিনিসগুলো ঘেঁটো না যেন। একটি সুতো যদি এদিক ওদিক হয় তো তোমাকে দাম দিতে হবে।” এই বলে সে বাইরের ঘরে গিয়ে দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করে।

আজ কিন্তু এই নিত্যকর্মের কিছুই নিউ-নিউ করে না। আগুন জ্বালাতেও তার আজ আলসেমি। তার দাদা শক্ত শুকনো কেকগুলো কোনোরকমে গিলে খায়, এক পেয়ালা গরম জলও পায় না। মোজাগুলো জড় করে যখন সে সেলাই করতে বসে তার মন ভারি খারাপ হয়ে যায়। তার মনে পড়ে চু-ছে তাকে কি বলেছিল :

"হুঁ, এক ডজন মোজা রিফু করে তুমি পাও বাইশটা পয়সা। কাজ করে করে হাতে চড়া পড়ে গেলেও মাসে তিন ডলারের বেশি তুমি উপায় করতে পারো না। আর দেখো, আমরা এইরকম য়ুনিফর্ম বছরে দুটো করে পাই, আর আর মাসে মাসে পাই ছ' ডলার। তাছাড়া হল্-এ কাজ করবার সময় কথায় ভুলিয়ে যদি আমরা নতুন সভ্য জোটাতে পারি তাহলে আরো উন্নতি হবার আশা! আর প্রত্যেকটা দিনই কিরকম রোমাঞ্চকর—মাইনে এখানে যা-ই পাই না কেন। আমি জীবনে আর কখনও নোংরা মোজা সেলাই করছি না। আমার হাত ভগবানের কাজের জন্যে—দামামা বাজিয়ে তাঁর কথা প্রচারের জন্যে।"

নিউ-নিউ-র যে আঙুল ক'টা অমন উৎসাহভরে সারাদিনের কাজ করে চলতো এই সব কথার স্মৃতি আজ তাদের কেমন যেন দুর্বল নির্জীব করে তোলে। খাং-এর উপর বসে সে মাঝে মাঝে বাইরে উঁকি মারে। কালকের সেই জমকালো দৃশ্যটা থেকে থেকে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সে মনে মনে দাদাকে ঘৃণা করতে শুরু করে—আর যে মা সামনে বসে, তাঁকে আরো বেশি করে।

বিকেলে আবার সেই দামামার শব্দ দূর থেকে শোনা যায়। যেন কানাচি থেকে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে নিউ-নিউ-র অস্থির হৃদয়ের একেবারে মধ্যিখানে। নিউ-নিউ-র মুখ জ্বলতে থাকে, হাতের কাঁপুনি অসংযত হয়ে ওঠে। ঐ প্রকাণ্ড বিদেশী দামামা……দুম্ দুম্……সুসংবদ্ধ মিছিল……দুম্ দুম্……সুন্দর স্তোত্র গান, কোমল শুভ্র আঙুল, মিষ্টি আদরের কথা……দুম্ দুম্……ক্রমশই এগিয়ে আসে। নিউ-নিউ-র মনে হয় সে "স্বর্গীয়" কথাটা যেন শুনতে পেল। ঐ চড়া মেয়েলি গলাটা বোধ হচ্ছে যেন চু-ছের। একটা আগুনের শিখা যেন ওর বুকের মধ্যে একবার ঢুকছে আর বেরচ্ছে।

সুতোতে একটা গিঁট পড়েছে। ওর মাথার মধ্যেটা এমন গোলমাল হয়ে যায় যে সেটা কিছুতেই খুলতে পারে না। দাঁত দিয়ে সে সুতোটা কেটে ফেলে। মাথা তুলে দেখে বুড়ি তার দিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করছে। দেখে ভারি বিরক্ত লাগে; চিঁড়িয়াখানার জন্তুগুলো খাঁচার গরাদ দেখে যেমন বিরক্ত ক্রুদ্ধ হয় সেইরকম। এদিকে দামামার শব্দটা যত কাছে এগিয়ে আসে, তার মনও এক অব্যক্ত আনন্দে ভরে ওঠে। তার ছুঁচটা হিংসে করে তার আঙুলের মধ্যে ফুটে যায়। মুখ দিয়ে সে রক্তটা চুষে নেয়। দুম্ দুম্, দুম্ দুম্……দামামাটা

আরো কাছে, আরো জোরে, যেন অহঙ্কারে ফেটে পড়ছে। এত জোরে বাজে যে উঠোনের কুকুরটা ডাকতে থাকে।

নিউ-নিউ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। খাং-এর মাদুরের তলা থেকে সেই সুন্দর রং-করা কাগজটা টেনে বার করে আর বিড়বিড় করে বলতে থাকে :

“আমাকে যেতেই হবে মা!”

সে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়। বুড়ি তার কাপড় টেনে ধরে।

“কোন্ সাহসে তুই এমন করছিস্ নিউ-নিউ। তোর দাদা আমায় বলে গেছে ওখানে আমি যেন তোকে যেতে না দিই। তোর পূর্ব-পুরুষরা নিষ্পাপ ছিলেন, আর তুই কিনা আমাদের বংশে কালি দিতে চাস?” বুড়ি কান্নার সুরে এই কথা বলে।

দামামার শব্দ আর গান ছোট বাড়িটাকে সব দিক থেকে ঘিরে ফেলে। কাপড়ের খস্‌খসানি শুনে বোঝা যায় মিছিলের সঙ্গে অনেক লোক চলেছে। নিউ-নিউ-র কানের ভিতরটা দপ্ দপ্ করতে থাকে……“মাসে ছ ডলার” আর সেই শিক্ষয়িত্রীর গূঢ়ার্থকর অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর, গোপন বাণী “মনে থাকে যেন তুমি ঈশ্বরের।”

নিউ-নিউ তার কাঁধ থেকে বুড়ির সামর্থ্যহীন হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেয়। তারপর পাগলের মতো, উদ্দীপিতের মতো রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

“নিউ-নিউ, পাগলা মেয়ে, জংলি মেয়ে, তোর দয়া-মায়া নেই!”

* * *

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিরাট কালো ছায়াটি যখন একটা চলতি বিদ্রোহীদের গান গুন্‌গুন্ করতে করতে ফটকের কাছে এসে দাঁড়ায় তখন সে তার মা-কে ফটকের উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যায়।

“মা, এই ঠাণ্ডায় বাইরে দাঁড়িয়ে কি করছ?” ভয়বিহ্বল হয়ে সে তার বুড়ি মায়ের থরথর করে কাঁপা দেহের দিকে তাকিয়ে তাঁকে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

“ঠাণ্ডা! ঠাণ্ডায় জমে আমি মরে গেলে তবেই তো ও মেয়ে খুশি হয়।” বুড়ি কিছুতেই সেখান থেকে নড়তে চায় না।

“আবার নিউ-নিউ-র সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি? তোমার নিজের কিন্তু সাবধানে থাকা উচিত। বুড়োবুড়িদের পক্ষে এই শীতকালটাই হল কঠিন সময়।”

"ঐ জংলি মেয়েটার ডানা দুটো বেশ বড় হয়েছে। তা নইলে উড়ে গিয়ে সে ঐ বর্বরগুলোর দলে যোগ দেয় আমাকে এইখানে এতক্ষণ একলা ফেলে রেখে!"

"কি! সে আবার সেখানে গেছে? মা, তুমি ভিতরে যাও আমি এক্ষুনি ওকে নিয়ে আসছি।"

বুড়ি দেখতে পায় সেই কালো ছায়াটা রাতের অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত মিলিয়ে যায়। বাড়ির ভিতর ঢুকতে ঢুকতে সে বিড়বিড় করে "ও-ও চলে গেল, এই হতভাগী সারাক্ষণ একলাই থাকবে।"

ইস্কুলের দরোয়ান তার ক্ষুধার্ত অন্বেষণী চোখ নিয়ে সাজানো গোছানো গির্জের ভিতর অশিষ্টের মতো ঢুকে পড়ে। সন্ধের উপাসনা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। একজন ভৃত্য দেয়াল থেকে একটা রঙিন ছবি খুলে নামাচ্ছে। ধর্মোপদেশের সময় সেটার প্রয়োজন হয়েছিল। ছবিটা হচ্ছে একটা মানুষের, তাকে একটা ভয়ানক সাপ আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে রয়েছে। ইস্কুলের মতোই এখানেও দেয়ালের গায়ে নানারকম ছবি আর বচন ঝোলানো। কিন্তু সে সবের দিকে দেখবার চিংলুং-এর বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। ভজনগৃহের সামনে দাঁড়িয়ে যে চাকরটা ছবি গুটোচ্ছিল তাকে সে চীৎকার করে প্রশ্ন করে:

"এই বুড়ো! আমার বোন কোথায়?"

প্রশ্নের ধরনটা বোধহয় একটু বেশী ঘনিষ্ঠ রকমের হয়ে পড়েছিল। গির্জের চাকরটা ওর দিকে ফিরেও তাকায় না, শুধু উত্তর করে:

"এখান থেকে সরে পড়। পাশের ঘরে লোকেরা পাপ স্বীকার করছে।"

"মাপ করো।"

দরোয়ান বুঝতে পারে একটু নরম হওয়া দরকার।

"আমি এসেছিলুম আমার বোনের খোঁজে।"

"কিন্তু তোমার বোন এখানে নেই। এটা হচ্ছে পবিত্র ধর্মের স্থান, বুঝেছ? তুমি এখান থেকে ভাগো। কে একজন পাপ স্বীকার করছে, কাজেই এখন একেবারে নিস্তব্ধ থাকা দরকার।"

"কি করে তুমি জানলে আমার বোন আছে কি নেই? আমি খুঁজে দেখবো।"

দরোয়ান সশব্দে হলে ঢুকে পড়ে। গির্জের চাকর এতে বেজায় রুষ্ট হয়। কিন্তু দরোয়ান তার তোয়াক্কাই করে না। সে বুকটা ফুলিয়ে রণবেশে বেদীর একপাশে একটা সবুজ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। চাকরটির ক্রোধ তখন ভয়ে

পরিণত হয়েছে। আগন্তুকের এই গোঁয়ার গোবিন্দের মতো ব্যবহারের ফলে যে তার "ভাতের বাটি" সামলানো দায় হয়ে উঠবে! চাকরটা শিকারী কুকুরের মতো এক লাফে সবুজ দরজাটার সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

"ভাগো এখান থেকে বদমাইস কোথাকার! এটা ধর্মের জায়গা। ভিতরে আজকের ধর্ম প্রচারের 'ফল'-রা তাদের পাপ স্বীকার করছে।"

"ধর্মের জায়গাই বটে? আমার বোনকে এরা ভুলিয়েছে। এখন সে বাড়িতেই থাকতে চায় না।"

গির্জের চাকরটাকে দরজা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর দেখে চিংলুং-এর তখনই নিশ্চিত মনে হয় যে ওরই পিছনে তবে ওর বোন বন্দী আছে। সে দরজায় মারে এক লাথি। খয়েরী পোষাক-পরা একজন বিদেশী বেরিয়ে আসেন, তার হাতে চকচকে সোনার জলে বাঁধানো একটা মোটা বই। তিনি কলহমান এই দুজনের মাঝখানে শক্ত হয়ে দাঁড়ান, তারপর তাঁর সোনার চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বকুনির স্বরে অথচ ভদ্রভাবে গির্জের চাকরকে বলেন:

"ব্যাপারটা কি সু বুড়ো?"

বুড়ো সু ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। চিংলুং-এর দিকে সে আঙুল দেখায়।

"জেনারেল জেম্স্—রাস্তার থেকে এই খুনে বদমাইসটা—"

এই কথা শুনে চিংলুং ভীষণ চটে ওঠে। মারমুখো হয়ে সে চাকরের গলাবন্ধটা চেপে ধরে।

"পাজি কোথাকার, বল্ কে বদ্মাইস? জবাব দে!"

"মেরো না দাদা, মেরো না!" একটা চেনা কণ্ঠস্বরে দরোয়ানের কর্কশ হাতের মুঠো আলগা হয়ে যায়।

তিনজনেই অবাক চোখে সবুজ দরজার পিছনের ঘরটার দিকে তাকায়। চিংলুং দেখে সেদিনের ধর্ম প্রচারের আরো কয়েকটি 'ফল'এর সঙ্গে তার বোনও একটা বেদীর সামনে ভক্তিভরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

জেনারেল জেম্স্ ওদের সম্বন্ধটা বুঝে আলগাভাবে দরোয়ানের কাঁধে একটা লোমশ হাত রেখে বলেন:

"ভাই, এই সুন্দর মেয়েটি যখন তোমার বোন তখন তুমিও তো আমাদের বন্ধু। সুস্বাগতম্।"

কাঁধের উপর হাতটাকে অনুভব করে দরোয়ান তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বোনের দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে জেনারেলের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

“কে চায় তোমাদের বন্ধু হতে ? তোমরা যারা গরীব চীনেদের লোভ দেখিয়ে নিজের মাকে অবধি ভুলিয়ে দিয়ে নিজেদের সতুপায়ের রোজকার-পাতি ছাড়িয়ে পাগলের মতো তোমাদের এই ভাঁড়ামির কারবারে যোগ দেওয়াবার জন্যে নিয়ে আসো।” ধৈর্যবান জেনারেলের অভিজাত নাসিকার দিকে ও আঙুল দেখিয়ে দেয়।

ঝড়ের মতো সে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে বোনের ক্ষীণ কম্পিত হাত ধরে টানে।

“নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে, চলো! আমাদেব মা এখনও পর্যন্ত ফটকে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।”

“দাঁড়াও ভাই, ও যে এখন আমাদের!”

জেনারেল জেম্‌স্‌ মেয়েটির দিকে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে ভাই-এর দিকে উন্নত মস্তকে সুগম্ভীর মর্যাদার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন। “ওর যখন পাপ-স্বীকার শেষ হয়ে যাবে তখন ও তোমার সঙ্গে যেতে পারে। দয়া করে দরজার ধারে একটু অপেক্ষা করো।”

চিংলুং থেমে যায়। শাদামুখো এই বিদেশী শয়তানটা!

অন্তরের মধ্যে সে অনুভব করে যে অবস্থাটা একটু অসাধারণ। ছাত্রদের সভায় প্রত্যহ শোনা কথাগুলো তার কানে বাজতে থাকে, “সাম্রাজ্যবাদীরা উচ্ছন্নে যাক! বিদেশীরা দূর হোক!” ওর চোখে একটা আগুন জ্বলে ওঠে। এই তো প্রতিশোধের সময়। ঐ যে দুটো লোমশ হাত ওর বোনের কাঁধের উপর, ঐ হচ্ছে সেই জঘন্য শক্তির প্রতীক যে তার জাতির টুঁটি চেপে ধরেছে। সে সবেগে সেই হাত দুটো তার বোনের কাঁধ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পিছু হটে গিয়ে ঘুষি পাকিয়ে দাঁড়ায় ঐ খয়েরি য়ুনিফর্মটার বুকে মারবে বলে।

জেনারেল জেম্‌স্‌ নিঃসহায় ভাবে বেদীর একপাশে পড়ে যান। এই ছ-বছর এই অনুন্নত অসভ্য মহাদেশে ধর্মপ্রচারকালে এরকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তাঁর আগে কখনো হয় নি। উস্‌খো-খুস্‌কো চুলে ভরা মাথা তুলে নিতান্ত অবাক হয়ে তিনি পিট্‌পিট্‌ করে তাকান।

তিনি কম্পিত স্বরে বলেন—“চীনেরা তো এমন ধারা হয় না!”

দাদা যখন টানতে টানতে নিয়ে যায় নিউ-নিউ সহানুভূতির চোখে জেনারেলের দিকে তাকায়, যিনি খানিক আগেই কেমন সুন্দর হৃদয়গ্রাহী স্বরে উপাসনা করছিলেন।

লাল মাছ

শ্যু মাও-ইউং

শ্যু মাও-ইউং-এর আসল নাম হচ্ছে য্যু ইয়াং-লিং। নিবন্ধ-রচয়িতা ও সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে। বিশ বছর বয়সে তিনি শাংহাই-এর লাও তুং স্কুলে ভর্তি হন। সেই সময় থেকেই তিনি খবরের কাগজের পাতায় লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম নিবন্ধের বই ‘তা ৎসা-চি’র ভূমিকা লু শ্যুন লিখে দেন। যুদ্ধের সময় শ্যু মাও-ইউং তৎকালীন চীনা কমিউনিষ্ট রাজধানী ইয়েনান-এ গিয়ে লু শ্যুন অকাদেমীতে অধ্যাপনা করেন। সম্প্রতি দক্ষিণপন্থী এই অপবাদে তিনি চীনা সাহিত্যিক মহলে অস্পৃশ্য হয়ে আছেন।

যারা একটু শৌখিন আর পয়সাওয়ালা তারা প্রায়ই বাড়িতে একটা কিছু জীব পোষে। জীব পোষে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে আনন্দ পাবার জন্যে। যেই তারা এদের পুষতে শুরু করে অমনি ঐ সমস্ত জীবদের ভোল বদল হতে শুরু হয়ে যায়। যেমন ধরা যাক প্লাম ফুল। কি রকম হওয়া চাই, না—

“ট্যারা-বাঁকাতেই সৌন্দর্য, সিধের মধ্যে বাহার কোনো নেই। যা নড়ে চড়ে তাই হলো সুন্দর, আড়ষ্ট জিনিস মোটেই সুন্দর নয়। যেটা একটু ফাঁকা তারই আছে সৌন্দর্য, ঘন জিনিসের মধ্যে কিছুই নেই।”

অতএব “সিধে জিনিস কাটো, ঘনিষ্ঠ জিনিস বাদ দাও, আড়ষ্ট যা কিছু সরিয়ে ফেল।”

কুং তিং আন[1] এর নিন্দে করে বলেছিলেন যে এরা যা তৈরি করেছে তা হচ্ছে ‘জরাগ্রস্ত প্লাম ফুলের গাছ’।

এই পোষা জীবদের মধ্যে এক রকম জীব হচ্ছে লাল মাছ। কই মাছের বদলে এই লাল মাছ এ-ও হয়েছে মানুষের তাকিয়ে আনন্দ পাবার জন্যে।

আমি কোনোদিনই এই সব লোক-দেখানো জীবদের পছন্দ করি না; বিশেষ করে ঐ চোখ-বার-করা লাল মাছগুলোকে আমি একেবারেই সইতে পারি না। যতবারই ওদের দেখি কাঁচের খর্পরের মধ্যে এঁকে বেঁকে চলেছে, ততবারই

---

[1] পুরাকালের চীনের এক নামকরা শিল্পরসিক।

মনে হয় যে ওরা যেন জীবজন্তুর দলে পড়ে না। ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি একেবারেই নেই, চলাফেরা দেখে বোঝাই যায় না যে ওটা একটা সত্যিকারের জীব! কিন্তু এই যে লাল মাছ, যাকে জীবজন্তুর শ্রেণীতে গণ্য করা যায় না সেও সম্প্রতি আমায় ভারি অবাক করে দিয়েছে।

আমাদের প্রতিবেশী এক তরুণী এই ধরনের লাল মাছ পুষেছিলেন, তবে সংখ্যায় মাত্র একটি। মাছটি বাড়ছিল মুখ-ধোবার একটা ছোট্ট গামলায়। তরুণীটি দেশে যাবার সময় গামলা-সহ সেই লাল মাছটি আমাদের উপহার দিয়ে গেলেন। বললেন, সুবিধেমতো প্রতিদিন একবার করে জলটা বদলে দিলেই চলবে। জিনিসটা আমাদের গ্রহণ করতে হল, কিন্তু মনে মনে হাসি পেল। কারণ আমার হাতে এ তো একদিন যেতে না যেতেই অক্কা পাবে। যাই হোক তবু একটা জানলার ধারে তাকে রেখে দেওয়া গেল। তারপর ওকে নিয়ে আর একেবারেই মাথা ঘামাই নি।

আস্তে আস্তে শীত এসে গেল; এত ঠাণ্ডা পড়লো যে ঘরের ভিতরকার জলও জমে বরফ হয়ে যায়। একদিন হঠাৎ কেন জানি না জানলার ধারে গেলুম, গিয়ে দেখি ঐ গামলার জলও জমে একখণ্ড বরফে পরিণত হয়েছে। ভাবলুম তবে তো মাছটাও অক্কা পেয়ে গেছে। ভাল করে চেয়ে দেখি—না, মরে নি, বরফের উপর একধারে শুয়ে আছে, এখনও নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে সেটা। আমি তো অবাক, আবার একটু মায়াও হলো—বরফটা ফেলে দিয়ে জলটা বদলে দিলুম। কিন্তু পরের দিন জল আবার জমে বরফ। তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন··· ······পরপর বহুদিন ধরে এই ব্যাপার চলতে লাগল, কিন্তু ঐ লাল মাছের শরীর খারাপের কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। আজ অবধি এই ব্যাপার একটানা চলে আসছে, এখনও মাছটা নড়ে চড়ে বেড়ায় যেন কিছুই হয় নি।

এ-রকম অদ্ভুত ব্যাপার আমি জীবনে কখনও দেখি নি। এই নিয়ে চিন্তাও অনেক করলুম। মনে পড়ে গেল নীট্‌শে তাঁর অতিমানব দর্শনের এক জায়গায় বলেছেন: “ভাগ্যের কৃপা প্রায়ই হয় অতি নির্মম·········কিন্তু মধ্যম বা নিচু স্তরের জীবজগতের প্রতি সে হয় অনেক বেশি দরদী, যত্নবান আর ক্ষমাশীল। সেই জন্যে এই নিম্নস্তরে যারা থাকে তাদের জন্ম দেবার ক্ষমতাও বেশি, আবার বেঁচে থাকবার জোরও কিছু কম নয়। যারা উচ্চস্তরে থাকে তারা একটুতেই ভেঙে পড়ে, বেশি দিন বাঁচতেও পারে না।” মনে হল এটা একটা মস্ত বড় সত্য।

এই সঙ্গে আরো মনে হয়, যে চীনেরা এই দুর্দিনের গণ্ডির মধ্যে, নোংরা পরিবেশের মধ্যে এখনও জন্ম দিচ্ছে, বেঁচেও রয়েছে, যেন ভগবানের একটা বিশেষ মহিমা আছে এদের উপরে, অনেকটা ঐ লাল মাছের মতন। তারপর এই কাটাকাটি হানাহানির পর যে-সব সক্ষমরা টিকে থাকবে সেই সব চীনেরা ভবিষ্যতে কি ঐ লাল মাছের মতই একরকম উপভোগের সামগ্রী হয়ে দাঁড়াবে? এই যদি হয়, তাহলে ভয় হয় যে এরা ভোল বদলে শেষে বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতায় পরিণত না হয়। ব্যাঙের ছাতা হচ্ছে জীবজগতের অতি নিম্নস্তরের প্রাণী, আর জন্ম দেবার ও বাঁচবার, এই দুটো ক্ষমতাই ওদের অত্যধিক রকম বেশি।

বাঘা

তুয়ান-মু হুং-লিয়াং

উত্তর-পুব চীনের নবীন লেখক তুয়ান-মু হুং-লিয়াং। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান যখন উত্তর-পুব চীন আক্রমণ করলো সেই সময় চীনা সাহিত্যের মধ্যে এক নতুন সুরের ছোঁওয়া লেগেছিল। উত্তর-পুব চীনের অনেক লেখকের লেখার মধ্যেই সেই সময় একটা লড়ায়ে-ভাব দেখা দেয়। তুয়ান-মু হুং-লিয়াং এঁদের অন্যতম। জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের তিনি একজন নেতা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী সিয়াও হুং ছিলেন প্রতিভাশালী লেখিকা—হং কং-এ জাপানীদের হাতে তিনি নিহত হন।

হেমন্ত কাল। গাছের পাতায় পাক ধরেছে—পাতার মধ্যে এমন রং নেই যা ফুটে ওঠে নি। কোনটা যেন দিনের আলোর মতো ঝকমকে, কোনটা আবার জীবনের সন্ধ্যার মতো মলিন—লাল, হলদে, খয়েরি আরো কত রকম রঙ্। কিন্তু বুড়ো চু চুয়ানের এ-সব রঙ্ চঙ্-এর দিকে কোনো মন নেই; সে একটা লম্বা আঁকশি হাতে ঝরা পাতার উপর ঝুঁকে পড়ে মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে জ্বালানির জন্যে শুকনো পাতা কুড়োচ্ছে—পিছনে তার কুকুর বাঘা।

বাঘাও খেলা করছে ফুঁ দিয়ে পাতা উড়িয়ে উড়িয়ে, আর মাঝে মাঝে তার থ্যাবড়া মাংসল মুখের মধ্যে থেকে বার করছে একটা অদ্ভুত আওয়াজ। বুড়ো চু চুয়ান কুকুরটাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতো; কুকুরটার গা-ভরা নরম সোনালি রোঁয়া মনে হতো যেন সোনার গুঁড়ো লেগে চক্‌চক্ করছে।

বাতাস ঘুরতে থাকে। যত সব কোনাচে লম্বাটে গোলগোল শির-বার-করা পাতা বুড়োর আঁকশিতে গেঁথে যায় আর ছোটো একটি টুকরির মধ্যে জমা হয়। টুকরির ভিতর এরই মধ্যেই মেলা পাতা জমা হয়ে গেছে। বনের মধ্যেকার বাতাস বড় চঞ্চল—হয়তো এই চুপ হয়ে আছে, এখনই আবার সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

বুড়ো মুখ বুজে পাতা কুড়িয়ে চলে; কিন্তু বুড়োর এই নীরবতা কুকুরটার ভালো লাগে না। সে পাতার মধ্যে খেলার ছলে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে

বুড়োকে যেন হাসাতে চায়। বুড়োর এদিকে মন পড়ে থাকে কোথায় একটু শুকনো ডাল ভেঙে পড়ে রয়েছে তাই সংগ্রহ করতে ; অথবা যখন দেখে কেউ কোনো দিকে নেই, চট্ করে তার ছুরিটা চালিয়ে দেয় মোটা গোছের একটা চারা গাছের ডালের উপর। তারপর তার শাখাপত্রগুলো চেঁছে ছুলে সেটাকে টুকরো করে কেটে তাড়াতাড়ি তার ঝুড়ির ভিতর শুকনো পাতার মধ্যে গুঁজে দেয়। তার পরের মুহূর্তেই এমনভাবে স্ফূর্তিভরে একটা গলা-খাঁকারি দিয়ে ওঠে যে মনে হয় পৃথিবীর কোথাও কিছু ঘটে নি। এই সব সময়ে কুকুরটা ঠিক বুঝতে পারে যে কী ঘটছে ; কানটি খাড়া করে সজাগ হয়ে সে দেখতে থাকে তার প্রভুর এই নির্দোষ ব্যবসায়ের বিঘ্ন ঘটাতে কেউ আসছে কিনা ; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিন্ত হয় যে বনের বাতাসের শোঁ শোঁ আর ঝরা পাতার খস্‌খস্ শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনো সাড়া নেই ততক্ষণ পর্যন্ত সজাগ হয়ে থাকে।

বুড়ো চু চুয়ান একটা শুকনো ডাল দেখতে পায়, নেহাৎ সরু নয়—কিন্তু পোকায় খাওয়া। সে তার পাকা গোঁফ দাড়ির মধ্যে দিয়ে হাতের চেটোয় একটু থুথু ফেলে হাত দুটো রগড়ে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত দেহের শক্তি যেন ঐ ডালটাকে কেটে ফেলবার জন্যে তার দুই কাঁধে এসে জমা হয়। গাছের শাদা রঙ্‌-এর শাখাটা সহজে কাটা পড়ে না—শাদা শাদা ছালের টুকরোগুলো ভেঙে ভেঙে মাটিতে পড়তে থাকে, তারপর অবশেষে গাছের গা থেকে সেটা খসে আসে—বাঘা খুশি হয়ে গোঁ গোঁ করতে থাকে। তখন বুড়ো চু চুয়ান তার হাত দিয়ে মুখটা মুছে ফেলে বাঘার মাথা থাবড়ে আবার নিঃশব্দে কাজ করে চলে।

এইবার দূরে পায়ের শব্দ শোনা যায় ; বুড়ো একটু ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু বাঘা নীরব থাকে ; তাতে বোঝা যায়, যে আসছে সে অচেনা কেউ নয়। বুড়ো মনে মনে ভাবে, যাক্ তাহলে বাঁচোয়া। কিন্তু তবু সে আরো কিছু শুকনো পাতা দিয়ে তার চুরি-করা ডালগুলি বেশ করে ঢেকে দেয় তারপর দূরের দিকে তাকিয়ে দেখে।

"আরে এ যে সেই পুরোনো পাপী ! ঘাগী চোর ! আবার কাঠ চুরি হচ্ছে ! এই তো দেখছি এখানে একটা গুঁড়ি লুকোনো রয়েছে ; এঃ মোটা যেন ভাতের সরাটা। এ তো সবই বুড়ো জমিদারের জিনিস।"

কথাটা বলে ইউয়ান ৎস। সে তিন মাস জেল খেটে সবে ফিরেছে। পিঠে তার এক বোঝা ঘুঁটে। বুড়ো চুয়ানের হাত সাফাই দেখে সে মহা খুশিতে

চেঁচামেচি করে ওঠে। তারপর সাবধানে চারিদিকে তাকিয়ে একবার দেখে।

অত জোরে চেঁচানোটা উচিত হয় নি। ভয় হয় বুড়োর জন্যে—কে জানে হয়তো কোনো অজানা বিপদ এনে ফেললো সে বুড়োর মাথার উপর। বুড়ো তখন মনে মনে ভাবছে ইউয়ান ৎস'র দুরদৃষ্টের কথা। গেল-বছর বর্ষার সময় ইউয়ান ৎস'র বাড়ির পশ্চিম দেয়ালটা পড়ে গিয়েছিল। বেচারা দুটি ছোট ছোট পপলার গাছ কেটেছিল খুঁটির জন্যে। কোনোরকমে দেয়ালটা আবার ঠেলে খাড়া করতে হবে তো? একে চুরি বলা চলে না। অথচ জমিদারের প্রধান পেয়াদা মা-সোয়ান-প্নে তার কাছ থেকে কাঠ কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইউয়ান ৎস'র কপালে এ সবই ঘটেছে; উপরন্তু কয়েকদিন পরে তাকে হাকিমের কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে তিন মাসের জন্যে জেলেও ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

বুড়ো নিজের মনেই বলে ওঠে—"যাক্ গে এ নিয়ে আর ভেবে কী হবে?" ইউয়ান ৎস যে বনের মাঝে তার এই নিঃসঙ্গতার বখরা নিতে এসেছে এতেই সে খুশি। হাত দুলিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে সে তার ঝুড়ির কাছে গিয়ে পাতাগুলি তুলে তার গোপন ঐশ্বর্য ইউয়ান ৎস'কে দেখায়। আহ্লাদের স্বরে বলে ওঠে—"দেখ শুধু একটুখানি! সামান্য এইটুকু না নিয়ে কি আমি যেতে পারি?"

ইউয়ান ৎস' তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দেয়,—"এ তো অতি সামান্য—দাঁড়াও।" বলে সে তার ধারালো বাঁকটা দিয়ে আর একটা ডাল ভেঙে ফেলে। তারপর হাঁটু দিয়ে মুচড়ে ডালটাকে তিন টুকরোয় ভেঙে ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দেয়। ইউয়ান ৎস' বলতে থাকে—"এ আর কি? সারা বনটাকেই এমনি করে কেটে ফেল্লে হয়। চেয়ে দেখ একবার—এই কাঠটা হলো হাজার বছরের। যেমন পুরুষ্টু তেমনি কালো, অথচ কারো হাত দেবার অধিকার নেই।" চওড়া চওড়া কালো কালো গাছগুলিকে সে আঙুল দিয়ে দেখাতে থাকে। সেগুলি হচ্ছে বনের মধ্যেকার সবচেয়ে নাম-করা গাছ।

বুড়ো চু চুয়ান বলে—"আবার ওদিকে নজর কেন? সবই তো জমিদারের। ফের তোমার তিনমাস জেল খাটবার শখ হয়েছে নাকি?"

ইউয়ান ৎস' বুড়োর কথায় কান দেয় না। সে কুকুরটার সঙ্গে আদরের স্বরে কথা কইতে থাকে। কুকুরটা লাফিয়ে তার বুকে ওঠে।

"বলো তো বুড়ো এই কি সেই কুকুরটা?……এর কথা শহরে শুনেছি।

লোকে বলে জমিদার নাকি মু-কুয়ানের বৌ-এর পিছু নিয়েছিল, সেই সময় তোমার কুকুর বাঘা এসে তার পায়ে কামড় দেয়। এ কি সত্যি? সাবাস! আমার ধারণাই ছিল না কুকুর এমন বুদ্ধিমান হতে পারে। ঐ গল্পটা শুনে এমনই আমার ফুর্তি হল যে সঙ্গে সঙ্গে আরো দু-পাত্র মদ খেয়ে ফেল্লুম।”

বুড়ো খুব একটা গর্বের হাসি না হেসে থাকতে পারে না।

“হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি বই কি। হতভাগা জমিদারটাও যেমন, আর মেয়েমানুষটাও তার চেয়ে কিছু ভালো নয়। জমিদারটার এত উপপত্নী যে আটখানা গাড়ি বোঝাই হয়ে যাবে। যত হয় ততই চায়—রোগাই হোক আর মোটাই হোক। ঐ মেয়েটার চোখ আছে জমিদারের টাকার উপর। বাঘাব এটা ভালো লাগে নি—একটুও পছন্দ হয় নি—কাজেই সে দিলে জমিদারকে উল্টে ফেলে। আঃ সে কি দৃশ্য! প্রাণটা যেন খুস্ হয়ে ওঠে।” বুড়ো গভীর আনন্দে মাথা নাড়তে থাকে; নিচু হয়ে বাঘারে সোনারবরণ মসৃণ মাথায় হাত চাপড়াতে থাকে—“বাঘা রে! কেউ সাহসই পায় নি তোর গায়ে হাত দিতে। বাঘাও ভয় পায় নি।”

ইউয়ান ৎস বলে—“বাঘার উচিত ছিল শুয়োরটাকে কাম্‌ড়ে মেরে ফেলা।”

“তা বটে, কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একটা প্রাণীর প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে।”

“ঠাট্টা করছো নাকি হে বুড়ো?”

“ঠাট্টা হলে তো ভালোই হত। অত্যাচারীর পা কামড়ে কি কেউ রেহাই পেতে পারে? জমিদার বলে পাঠালেন বাঘাকে মেরে ফেলতে হবে। বল্লেন, শোধবোধ চাই। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, শোধবোধ কি রকম? কুকুরটা তো তাঁকে খুন করে নি। আর যদিও বা করত, একটা কুকুরের জীবন আর তাঁর জীবন কি এক হল? এই কথা পেয়াদামশাই যখন শুনলেন তিনি আমায় তাঁর ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মারলেন আর হুকুম দিলেন আমি যেন সেই হতভাগা জমিদারের পায়ে গিয়ে দণ্ডবৎ হই। ওর চোদ্দপুরুষ নরকে যাক। একদিন আমি ঐ শুয়োরের বাচ্ছা জমিদারের সঙ্গে লড়বোই লড়বো—যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার দম বেরিয়ে যায়।”

“যাক্, ওরা তাহলে বাঘাকে মারতে পারে নি—” ইউয়ান ৎস খুশি হয়ে বাঘার সোনালি লোম চাপড়াতে থাকে—“ওরা তাহলে এটাকে বলি দিতে পারে নি—অ্যাঁ?”

বুড়ো বাঘার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকায় ; তাকিয়ে বলে—

"তুই আর শহীদ হতে পারলি না রে।' তোর জন্যে বরং আর একজনকে প্রাণ দিতে হল। কিন্তু তোর আর দোষ কি?" বুড়ো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার মনে হয় সেই মরা কুকুরটার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। কাজেই নিজেকে সমর্থন করবার জন্যে বলতে থাকে—"বাঘাকে তো আর খুন করতে দেওয়া চলত না। জানাশোনা সকলেরই পরামর্শ নিলুম। সকলেই বল্লে, বাঘার মতো দেখতে আর একটি কুকুরকে আমার কাছে বদলে রাখা হবে। তোমার সেজকাকার কাছে দক্ষিণ-পাহাড়ে বাঘাকে চালান করে দেওয়া হল। তার পরদিন, ঠিক যেমনটি ভাবা গিয়েছিল, পেয়াদা হতচ্ছাড়া এল, এসে অন্য কুকুরটাকে মেরে গেল। অমন একটা জোয়ান কুকুরকে বিনা কারণে ওদের জন্যে খুন করতে হল।..."

"পেয়াদা মা-সোয়ান-পেন এই কাজ করলে?"

"হ্যাঁ, আর বলে গেল, আমার আরো যে শাস্তি হল না সে শুধু আমি গরীব বলে আমার উপর কৃপা করে।"

"ওর আট পুরুষ নরকে যাক!" বলে ইউয়ান ৎস চেঁচিয়ে ওঠে, তারপর তার ঘৃণা প্রকাশের আর কোনো পথ না পেয়ে সে তার খুঁটের বাঁকটা একটা উইলো গাছের ডালে গভীরভাবে সেঁধিয়ে দেয়। খুব তিক্তভাবে ইউয়ান ৎস বলে ওঠে—"ওর পেটের মধ্যে এই বাঁকটা একদিন সেঁধিয়ে দেবো, এ ওকে দেখে যেতে হবে।"

গাছের টুক্‌রোটা ভেঙে তার পায়ের কাছে এসে পড়ায় বুড়ো চেঁচিয়ে ওঠে—"আরে আরে গাছের গায়ে কি অত দাগ করতে আছে?" কিন্তু সে রাগ করে না। অনেকদিন ধরে সে ঐ ডালটা আকাঙ্ক্ষা করেছে—হঠাৎ সেটাকে পেয়ে তার নিজেকে মনে হয় একটি ছোট্ট ইস্কুলের ছেলের মতো; তার হাতে কে যেন একটা মিষ্টি দিয়ে গেছে, যে রকম মিষ্টি বেচারার কোনো দিন নিজে কিনে খাবার উপায় ছিল না।

বুড়ো বলে,—"বন্ধু হে, তুমি গাছের ডালে এত দাগ করলে, বনের রক্ষক দেখলে বলবে এ আমারই কাজ।" তবু বুড়ো খুশিই হয় ; একটা নালা থেকে কিছু কাদা তুলে এনে গাছের ক্ষতটার গায়ে যেখান থেকে সবুজ আঠা বার হচ্ছিল সেই জায়গাটায় লেপে দেয়। দেখে মনে হয় সেটা একটা পুরোনো ক্ষত।

ইউয়ান ৎস রেগে বলে ওঠে—"দূর অত কষ্ট করছ কেন?"

বুড়ো অনেকক্ষণ কোনো জবাব না দিয়ে ধীরভাবে সযত্নে পাতাগুলি ঝাঁটাতে থাকে।

শেষে বুড়ো বলে ওঠে—"ভবিষ্যতের কথাটা তো ভেবে দেখা উচিত। চুরির দায়ে শেষে কি দেশ ছেড়ে পালাবো? সে বড়ো কষ্ট।"

"বাঘা এদিকে আয়।"

বাঘা তার মুখে একটা লাল রঙ্-এর পালকওয়ালা কি নিয়ে চক্কর মেরে ঘুরছিল।

"বন-মুরগি একটা।" বলে ইউয়ান ৎস আনন্দে চীৎকার করে ওঠে। তার গলার স্বর থেকে মোটা-সোটা নরম বন-মুরগির অতুলনীয় একটা গন্ধ যেন উছলে ওঠে।

বাঘা কর্কশভাবে ডেকে ওঠে। শব্দটা শোনায়—হোয়াং হোয়াং।

"ওটাকে তুই নিজেই ধরলি নাকি?"

—"হোয়াং হোয়াং!"

—"আমায় দিবি তো?"

—"হোয়াং হোয়াং!"

—"সাবাস কুত্তা, ওটা আমরা সবাই মিলে খাবো।"

—"হোয়াং হোয়াং!"

বুড়ো চু চুয়ান উত্তেজিত হয়ে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় বলতে থাকে—"তুই বড় ভালো কুকুর। আশ্চর্য কুকুর, উড়ন্ত পাখিটা পর্যন্ত তুই ধরতে পারিস।" বলে সে সেই পালকে-ঢাকা বন-মুরগিটাকে মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—"এ যে বেশ চর্বিওয়ালা দেখছি।" তখনও বাঘাকে সে চেপে জড়িয়ে ধরে আছে; বুড়ো আবার বলে—"তাই তো, তুই অনায়াসে উড়ন্ত পাখিও ধরতে পারিস!"

ইউয়ান ৎস বাধা দিয়ে বলে উঠে—"কেন বাজে বকছ? বন-মুরগি হচ্ছে অত্যন্ত অসাবধানী পাখি। অন্য পাখিতে ওদের তাড়া করলে ওরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে খড়ের গাদার উপর ধুপ করে পড়ে যায়—সেই সময় পিছন থেকে এসে ওদের অনায়াসে ধরা যায়, এ তো সবাই জানে।"

"রাখো না! বাঘা আমার উড়ন্ত পাখিকেই ধরেছে। কেন, কাল যে আমায় একটা খরগোস ধরে দিল তার কি?"

ইউয়ান ৎস স্নেহভরে একটু হাসে, অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে না।

তারপর সে বলে—"চল, একসঙ্গে ফিরি। তোমার বোঝাটা আমার হাতে দাও।"

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। বুড়ো ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। দুজনে তখন কাঠ-পাতাগুলিকে ঝুড়িতে সাজিয়ে রেখে ধরাধরি করে নিয়ে চলে।

বুড়োর বাড়িটা আসলে একটা খামার—জ্বালানি কাঠ জমা করে রাখবার জন্যে। দুটি ঘর, খড়ের চাল, বেতের বোনা একটা দরজা, চারিদিকে শুধু জ্বালানি কাঠ। জমিদারের খামারের চেয়ে এটা অনেক নিকৃষ্ট। জমিদারের খামারে তো পাইনের কড়ি আর সেলেটের টালি আছে। এই ঘরের কাদার ইঁটটি থেকে চালের খড়টি পর্যন্ত সব বুড়োর নিজের হাতে সাজানো এবং গড়া। এইখানেই ইউয়ান ৎস আর বুড়ো তাদের বুনো মুরগিটা মদের সঙ্গে খেতে আসে।

মুরগিটা ছিল চর্বিওয়ালা আর মদটা ছিল অসাধারণ সুগন্ধি। তারা যখন খায় বাঘা চুল্লীর ধারে বসে বসে সামনের দুপায়ে মুরগির হাড় চেপে ধরে সেগুলোকে চিবোয়, ঘড় ঘড় করে গলা থেকে একটা আওয়াজ বার করে আর লুব্ধ হয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছোট্ট কুটিরটির মধ্যে তিনটি প্রাণীর সুসম্পূর্ণ সন্তুষ্টির একটি ছবি।

ইউয়ান ৎস বুড়ো চু চুয়ানকে মুরগির একটা ঠ্যাং দিয়ে নিজে একটা ডানা নেয়।

"মুরগিগুলো ঠিক আগেরই মতো মোটা-সোটা আছে, কিন্তু মানুষরা আমরা রোগা হয়ে গেছি।"

"আর আমাদের জন্যে বাকি আছে শুধু মৃত্যু।"

ইউয়ান ৎস ইতিমধ্যে মাতাল হয়ে যায়; চোখ তার টকটকে লাল। কি যেন একটা বলতে যায়, কিন্তু কিছু না বলে তার বদলে কাঠের পেয়ালাটা তুলে সরাবটা গলার মধ্যে ঢেলে দেয়। হঠাৎ দরজায় একটা ধাক্কা শুনে দুজনেই অত্যন্ত অবাক হয়ে যায়।

বুড়ো নিজের মনে বলে ওঠে—"দুত্তোরি" এবং তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বাঘার কাছে যায়। বাঘা পাছে হঠাৎ ডেকে ওঠে এই ভয়ে সে বাঘাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে কাঠের স্তূপের মধ্যে বেঁধে রাখে; তার উপরে কতকগুলো ডালপালা ছড়িয়ে তাকে পুরোপুরি ঢেকে দেয়। তারপর সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দরজার কাছে যায়।

"ওঃ মা চেন—তাই বলো" বিরক্ত হয়ে এই বলে বুড়ো যাকে অভিনন্দিত করে সে হচ্ছে জমিদারের কু-নজরের এক চাকর।—"তুমি এসেছো জানলে কি আর আমি অত কষ্ট করে বাঘাকে লুকিয়ে রাখি? দেখ একবার বন-মুরগিটার দিকে—বাঘা আমায় ধরে দিয়েছে। উড়ন্ত অবস্থায় ধরেছে। বল, এমন দেখেছ কখনো?" বলে বুড়ো মা চেনকে এক পাত্র সরাব এগিয়ে দেয়, আর বলে—"আমি গিয়ে কুকুরটাকে খুলে দিচ্ছি, দেখছি উদ্বেগের কিছু নেই।"

"না খোলাই ভালো। পেয়াদামশাই মা সোয়ান-পন আসছেন···"

বুড়ো চু চুয়ানের মুখ ভয়ে শাদা হয়ে যায়। বন-মুরগির মাংস আর মদটার দিকে অতিব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।

"এখানে মরতে আসছে কেন?"

"কি আর বলব—এখানে আসছে ঐ মো-কুয়ানের বৌটাকে নিয়ে ফুর্তি করতে। এখানে একটা গরম খাং আছে কিনা, সেটায় বিছানা পাতবে। সারাটা রাত এখানে কাটাতে চায়। বৌটাকে যদি ওর পছন্দ হয় তাহলে এমন কি এই বাড়িটাই ও নিয়ে নেবে। এখনই এসে পড়বে ব্যাটা। তুমি একটু তাড়াতাড়ি কর।"

মুরগির যে ঠ্যাংটা তখনও অভুক্ত অবস্থায় পড়ে বুড়ো তার দিকে তাকিয়ে সেটা মুখে গুঁজে মরিয়া হয়ে বলে ওঠে—"নাও নাও, খেয়ে ফেল সব। সরাবটাও শেষ করো।" মা চেন খেতে শুরু করে।

ইউয়ান ৎস শূন্যের দিকে চেয়ে থাকে। চোখের সামনে সে যেন দেখতে পায় একটা পুরুষ আর একটা মেয়েমানুষ পরস্পরকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে আছে ঘুমের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায়। রেগে সে মাটিতে থুথু ফেলে বাড়ি-ভরা জ্বালানি কাঠের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে।—"এই দারুণ শীতের রাতে দূর করে দেবে আমাদের বাইরে, আর ভিতরে একটা পুরুষ আর স্ত্রীলোক মনের সাধ মিটিয়ে আনন্দ করবে!"

"উপরন্তু"—মা চেন মাংসের হাড় মুখে বলতে থাকে—"উপরন্তু হুকুম হয়েছে বুড়োর উপর এখনই খাংটাকে গরম করে রাখবার।"

"কি দিয়ে? আমারই জ্বালানি কাঠ দিয়ে বুঝি? গায়ের রক্ত জল করে এ-সব আমি সংগ্রহ করেছি। কিসের জন্যে? ঐ ব্যাটার বিছানা তাতাবার জন্যে? করুক গে না ওরা যা খুশি, তাতে আমার তো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমার বাড়িতে কেন বাবা?"

ইউয়ান ৎস মুষড়ে না গিয়ে হঠাৎ যেন অসীম স্ফূর্তিতে উপচে ওঠে। নিজের রচা একটা নাচই সে নেচে ফেলে।

সে বলে—"আচ্ছা বেশ! এসো তবে আমরা ওর বিছানাটা গরম করে দি। ওর জন্যে সত্যি সত্যিই গরম করে দি এসো।"

কেমন একটা রহস্যভরে সে হেসে আর সকলের হতবুদ্ধি মুখের দিকে তাকায়। আর দুজনে যখন খাবার পাত্রগুলি সরাতে থাকে ইউয়ান ৎস তখন এক বোঝা কাঠ নিয়ে চুল্লির দরজার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে একটুখানি আগুন ধরায়। তার মনে তখন গভীর চিন্তা—তার মনে পড়ে তার বাবা জমিদারেরই অধীনে কাজ করতেন। গাড়োয়ানের কাজ। তাঁকে দিয়ে বড় বেশি ভারি বোঝা বহান হত। তার ফলে তিনি 'মুখ-দিয়ে-রক্ত-ওঠা অসুখ'এ মারা যান। তার মা দুঃখ ক্লেশ সহ্য করতে না পেরে এক বেদের সঙ্গে পালিয়ে যান। সে নিজেও একাধিকবার জমিদারের অত্যাচার সহ্য করেছে। একবার সে একটা লাল কলাই-করা বাটি ভেঙে ফেলে। ফলে জমিদার তাকে এমন মার মারান যে সে মরতে মরতে বেঁচে যায়; এখনও তার কপালে একটা বিশ্রী ক্ষতের দাগ আছে।—"আর আজ যদি শুয়োরের বাচ্চা জমিদারের পেয়াদা এখানে একটা কুলটাকে নিয়ে মজা লুটতে না আসে তো আমার দিব্যি। আর আমার তিন মাস জেলে যাওয়া যদি মিথ্যে হয় তো আমার দিব্যি…"

লাল আগুনের শিখাগুলো চুল্লির দরজাকে লেহন করছে এই দৃশ্য একমনে দেখতে দেখতে তার মনে হয় যেন তার জমা-হওয়া ঘৃণার রাশি ঐ সঙ্গে জ্বলে উঠেছে। তার সেই বলিষ্ঠ চাষীর মুখাবয়বে কি যেন অজ্ঞাত ভাব ফুটে ওঠে, এবং সে এমন একটা উদ্দীপনা পায় যা এর আগে কোনো দিন অনুভব করে নি। তার গায়ে আগুনের আভা এসে পড়ে আর সোনালি আলোর ঢেউ এসে তার সুদৃঢ় দেহকে আলো করে তোলে।

"ঐ পেয়াদাটা আমার এক ধামা লাল চাল ঠকিয়ে নিয়েছে।" এই বলে মা চেন দুঃখের স্বরে গুমরে ওঠে।

বুড়ো চু চুয়ান অনুযোগ করে জানায়,—"আমরা তো ওর পায়ের তলার কাদা।"

বাইরে থেকে একটা শব্দ আসে—"কেউ আছ ওখানে?"

বুড়ো চু চুয়ান তার গলায় একটা হাত রেখে ইউয়ান ৎসর দিকে একবার চোখ ঠারে। ফিস্‌ফিস্ করে বলে—"বেটা এসেছে।"

মা চেন বাকি মুরগি আর মদটা মাটির নিচে লুকিয়ে ফেলে আর কাঠের স্তূপ থেকে একটা ঝাঁটা কুড়িয়ে নিয়ে খাংটা ঝাঁট দিতে থাকে।

"বেরোও এখান থেকে সকলে।" বলতে বলতে ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢোকে প্রধান পেয়াদা মা সোয়ান-পন। ঘরটা যেন তার মতো রাজযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে নিতান্তই ক্ষুদ্র এই ভাব দেখিয়ে কেবল সে ঘুরপাক খেতে থাকে—একটা লাট্টুর মতো। তার পিছনে পিছনে ঢোকে একটা লোক তার হাতে একজোড়া লাল মোটা বালাপোষ, একটা বুটিদার তুলোর গদি আর একটা পশমের কম্বল। এইগুলি সে খাং-এর উপর সযত্নে গুছিয়ে দেয়।

"বেরো এখান থেকে—সব্বাই। খাংটা গরম করেছিস। দেখি, আরো কিছু কাঠ দে। উঁহু যথেষ্ট গরম হয় নি। নে, নে, দে আরো কাঠ।"

ইউয়ান ৎস পুরো এক বাণ্ডিল কাঠ চুল্লির মধ্যে পুরে দেয়।

"তোরা কি ভাবছিস আস্ত আস্ত বাণ্ডিল দিয়ে খাংটাকে গরম করবি নাকি রে?" এই বলে পেয়াদামশাই যেন ইঁদুর খেদাচ্ছে এমনি করে বুড়ো চু চুয়ান আর মা চেনকে দরজার বাইরে ঠাণ্ডার মধ্যে বার করে দিয়ে দরজার হুড়কো দিয়ে দেয়। একটা ছোট্ট টুলের উপর আগুনের ধারে বসে ইউয়ান ৎসর আগুন জ্বালানো দেখতে দেখতে সে বলে—"নাও খাংটা গরম করো।"

গরম ঘরটা ছেড়ে বেরিয়েই বুড়ো চু চুয়ানের বাঘা কুকুরের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে—কুকুরটাকে বাঁচাবার জন্যে তখন আর করবার কিছু নেই।

একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে। মা চেন-এর কাঁপন ধরে।

"চল এবার যাই।"

"বাঘার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।"

"ভেবো না, ইউয়ান ৎস ওকে বার করে নিয়ে আসবে।"

"না, না, ইউয়ান ৎসর উপর অতটা নির্ভর করা যায় না।"

"দেখ, হাওয়া উঠল।"

বুড়ো চু চুয়ান হাঁচে, তারপর নাক ঝাড়ে। বাঘার কথা ভেবে সে উদ্বিগ্ন হয়। কোনোরকমে যদি তাকে বাঁচানো যায়—এ-ছাড়া সে আর কিছুই চায় না।

মা চেন ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে আর অপেক্ষা করতে না পেরে চলে যায়।

আস্তিনের মধ্যে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে সে বুড়োকে বলে,—"আমার বাড়িতে এসে বরং বসে থাকো। তবু গরম থাকবে।"

ঠাণ্ডা যদিও বাড়তে থাকে কিন্তু বুড়ো যে কি করবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না। জানলার নিচেটিতে সে দাঁড়িয়ে থাকে, আর তার সারাদিনের বহু কষ্টে আহরণ-করা জ্বালানি কাঠগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ইউয়ান ৎসর জন্যে অপেক্ষা করে। উইলো গাছের যে-শাখাটা ইউয়ান ৎস তার জন্যে ভেঙেছিল সেটাকে শুকনো পাতার মধ্যে দেখতে পেয়ে তার হঠাৎ ভয় হয় যে পেয়াদা মশাই হয়তো সেটা দেখতে পাবেন। তাই সে শাখাটাকে পাতাগুলোর মধ্যে ভালো করে গুঁজে দেয়। তারপর সে বাঘাকে বাঁচাবার সবচেয়ে কি ভালো উপায় হতে পারে তাই ঠাওরাতে বসে। রাতের বাতাস তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। সে নিজের মনে বলে—"কুকুরটা যাই হোক বুদ্ধিমান। কোনো আওয়াজ দেবে না। জানে যে শত্রু কাছেই আছে।" এইটা ভেবে তার মনের অস্থিরতা খানিকটা কমে।

তখন অন্ধকারের মধ্যে সে মা চেন-এর বাড়ির দিকে চলতে থাকে। শন্ শন্ হাওয়া তাকে যেন কাঁচির মতো কাটতে থাকে।

"দে আরো কাঠ দে। বেশ করে গরম কর। গরম চাই—বিছানা হবে যেন টোষ্ট-করা পাউরুটি।" এই বলে মা সোয়ান-পন চেঁচাতে থাকে। বিছানা ততক্ষণে বেশ গরম হয়ে উঠেছে।

"দেখ্ ইউয়ান ৎস এই বৃহৎ সংসারে তোর স্থান ঠিক কোনখানটিতে এইটি তোর জেনে রাখা উচিত। চোখ খুলে রাখ্ আর দেখ্ কোথা থেকে তোর ভাত আসে। নে, ভালো করে আগুন কর্। তুই কোনো কম্মের নোস্।"

চাকরটার দিকে ফিরে মা সোয়ান-পন বলে—"ওরে ব্যাটা দেখতে পাচ্ছিস্ না, ঐখানে একটা পায়ের বালিশ দিতে হবে! মেয়েটার হল কি? এখনও আসে নি নাকি?"

অবশেষে চাকর যখন একপাত্র জ্বলন্ত কয়লা এনে খাং-এর মাঝখানটিতে রেখে দেয় তখন মা সোয়ান-পনের শীত কমে, এবং তার শেয়ালের লোমের ঝোলা কোর্তাটা খুলে শুধু ভেড়ার চামড়ার কোটটা পরে বসে থাকে। তার মনে খালি ভয় পাছে ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে তার সারা রাতের আমোদটা নষ্ট হয়ে যায়।

“যা এবার আমার মদ নিয়ে আয়” বলে মা সোয়ান-পন চেঁচিয়ে ওঠে—“ধোঁয়ায় ঝলসানো মাছটা কোথায়? এই ব্যাটা তুই করছিস কিরে ইউয়ান ৎস? খাংটাকে গরম কর ভালো করে যাতে মাংস ঝলসে যায়!···হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!” ভগবান জানেন কি ভেবে সে উচ্চস্বরে হেসে ওঠে এবং বারে বারে বলতে থাকে—“হাঃ হাঃ মাংস যাবে ঝলসে, অ্যাঁ?”

একটা চোখ বুজে ইউয়ান ৎস চুপিচুপি পেয়াদামশাইকে দেখে এবং মনে মনে তার চওড়া মুখ আর ভেড়ার চামড়ার কোটটাকে বিষম ঘৃণা করতে থাকে। মুখে বিশ্রী লাল ব্রণের দাগ—যার থেকে তার ঐ রকম নাম হয়েছে—মা সোয়ান-পন। ঠোঁটের একপাশে একটা ছোটো গোল মাংসের ঢিপি তার থেকে ইঞ্চিখানেক করে লম্বা তিনটি কোঁকড়ানো কালো চুল বেরিয়েছে। দেহ-লক্ষণ-দেখা গনৎকারের মতে ঐ চুল আর মাংসের ঢিপির লক্ষণ হচ্ছে প্রচুর খাদ্য এবং মূল্যবান পোষাকের। লোকটার বাকি মুখটা পরিষ্কার এবং মসৃণ করে কামানো। শুধু চোখের উপরের পাতাদুটো মাংসল এবং ফোলা ফোলা। যখনই কোনো কিছুর দিকে তাকাত চোখের পাতাদুটো কুঁকড়ে গিয়ে ঢাকা পড়ত। লোকটার চোখের দৃষ্টিটা কেমন বিষণ্ণ। ইউয়ান ৎস অনুভব করছিল সেটা যেন একটা ভীষণ যাদুমন্ত্রের মতো, তার আত্মাকে চুরি করে নেবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ মা সোয়ান-পন তার দিকে ঘুরে বলে—

“বেরোও এখান থেকে। বেরোও বলছি, অমন করে আমার দিকে তাকাবি নে।”

“আজ্ঞে, আমি তো শুধু খাং গরম করছি।”

“বাপ্ রে বাপ্! তোর সাহস তো কম নয়—আমার মুখের উপর কথা কোস্।” বলে সে ইউয়ান ৎসর পিছনে এক লাথি মারে—“বেরো বলছি, শুনতে পাচ্ছিস্ না?”

ইউয়ান ৎস চুল্লির দরজার সামনে ঝুঁকে বসে ছিল, সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, তারপর হাত দুটো শুকনো পাতায় মুছে ঠাণ্ডার মধ্যে বেরিয়ে যায়।

বাইরে জানলার নিচে যে জ্বালানি কাঠের স্তুপ ছিল তার মধ্যে গিয়ে সে লুকোয়। সেখানে শুয়ে পড়ায় মুখে আর তার ঠাণ্ডা হাওয়াটা লাগে না। একটা দেশলাই জ্বেলে সে বিড়ি ধরায়। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে নীরবে ভাবতে থাকে

বুড়ো চু চুয়ান কঠিন হেমন্তের ঠাণ্ডায় যে-সব জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেছে তার পরিণামের কথা। ভাবতে থাকে বুড়োর স্ত্রী-পুত্রের কথা। বুড়োর সারা জীবনের প্রয়াস আর আশা যা এই দুটি ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে ; নিজের হাতে-গড়া এই দুটি ঘর যা তাকে রোদ জল বাতাসের হাত থেকে বাঁচায়। সেই ঘরদুটির কথা ভেবে তার প্রাণটা কেমন করে ওঠে। এইখানটিতে নিরালায় একা বুড়ো এবারের শীতটা কাটাবে বলে আশা করেছিল, গরমে, আরামে, আর বাইরে যদি বরফ পড়ে অথবা শিলাবৃষ্টি হয় তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে। যে-সব জ্বালানি কাঠ সযত্নে সাজানো আছে তার কথা ইউয়ান ৎস চিন্তা করে। তারপর মনে মনে বলে ওঠে—যাক্ গে, এ সবেতে কী এসে যায়? বনের উৎপত্তি হচ্ছে মাটি আর পাহাড় থেকে। যাই হোক না কেন, বুড়ো চু চুয়ান কোনো রকমে বেঁচে-বর্তে থাকবে।

ইউয়ান ৎস এইবার একটু প্রফুল্ল হয়। তার চোখের পাতায় কি একটা ঝুলছিল। লঘুভাবে চোখের উপর হাতটা বুলিয়ে দেখে—কি আশ্চর্য ; বরফের মতো ঠাণ্ডা দু ফোঁটা চোখের জল যে! কখন যে ফোঁটাদুটো তার চোখে এসে জমে ছিল তার মনেই পড়ে না। সে মৃদুভাবে হেসে ঠাণ্ডা ফোঁটাদুটিকে মাটিতে পড়ে যেতে দেয়।

খামারের মধ্যে থেকে একটা শব্দ তার কানে আসে, হুড়কোটা খুলে যায় আর মা সোয়ান-পনের গলা শোনা যায়—"যা শিগগির সেই হতচ্ছাড়ি ছুঁড়িটাকে খুঁজে নিয়ে আয়, নইলে পরে···" চাকরটা খামার থেকে যেন ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে আসে ; হুড়কোটা তখনই বন্ধ হয়ে যায়।

ইউয়ান ৎস নিজেকে শুধোয়, আচ্ছা মেয়েটাকে শুদ্ধু কি আগুনে পোড়ানো হবে?

নিজের মনেই আবার সে বলে—"কেন হবে না? কার সঙ্গে রাতটা কাটাচ্ছো ভেবে দেখ একবার, বেহায়া!······"

এইবার সে অধৈর্য হয়ে ওঠে। সে চায় মেয়েটা এইবার তাড়াতাড়ি আসুক। ঠিক সেই সময় দূরে মেয়েটার ফিস্‌ফিস্ কথা আর হাসি শোনা যায়।

"আমার হুজুর বলেছেন আপনাকে তাড়াতাড়ি আসতে।"

"ঐ ছট্‌ফটে বাঁদরটার কথা ছাড়। নাঃ, সত্যি ওকে আরো একটুখানি বসিয়ে রাখতে হবে।"

"আমার হুজুরের দোহাই দিদিমণি—আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। আপনিও

বুঝুন, যত তাড়াতাড়ি যাবেন তত তাড়াতাড়ি আধ পোয়া চিনি-দেওয়া কপির সুরুয়া খেতে পাবেন।”

“দূর বেহায়া শুয়োর।”

“এটা কি খুব মিষ্টি কথা হল দিদিমণি—আমার উপর একটু সদয় হোন …”

ইউয়ান ২স ততক্ষণে চাও মো-কুয়ানের বৌকে দেখতে পেয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সে এগিয়ে আসছে। ফ্যাকাশে তার মুখে সস্তা জাপানী পাউডার মাখানো। ছোটো-খাটো দেহটি ছন্দে দুলছে।

“তোমায় পুড়িয়ে একটি ছোটো কালো ডিম বানিয়ে দেবো।” এই বলে সে কাঠগুলির মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে আরো গভীরভাবে ঢুকে পড়ে। মেয়েটা এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে সে বলে ওঠে,—“আমি এসেছি গো।”

খামারের মধ্যে থেকে একটা ক্ষীণ শব্দ শোনা যায়।

“মাইবি। তুমি কি ভাবো তুমি স্বয়ং কৃপা-দেবী, যে তোমার খুশি মতো আমায় অপেক্ষা করিয়ে রাখবে?”

দরজাটা খুলে যায় এবং মেয়েটা ভিতরে ঢুকে পড়ে। ঘরের মধ্যে থেকে যা শব্দ আসে কান খাড়া করে ইউয়ান ২স তা সমস্ত শোনে। যখন সে নিশ্চিত হয় যে খাং-এর উপরে তারা শুয়ে পড়েছে তখন সে জানলার নিচের শুকনো কাঠে আগুন দিতে আরম্ভ করে। অতি সাবধানে দরজার সামনে আর খড়ের চালের উপর কাঠের পর কাঠ জমা করতে থাকে।

আগুনের শিখা গর্জন করে ওঠে; বাড়ির চারিদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে; এবং সেই সঙ্গে তার অন্তরের জলন্ত ঘৃণা, যে-ঘৃণা তার মধ্যে এতদিন ফসিলের মতো নিহিত ছিল তা যেন ফুটন্ত ফুলের মতো ফুটে ওঠে। লকলকে অগ্নিশিখার দিকে চেয়ে সে হেসে ওঠে—একটা প্রাণ-খোলা তেজালো হাসি তার অন্তরের মধ্যে থেকে আপনি বেরিয়ে আসে।

মা সোয়ান-পনের কথা মনে করে সে বার বার বলতে থাকে “জ্বল্, জ্বল্, বেশ ভালো করে জ্বল্।” সে বোঝে যে আর তাদের পালাবার কোনো উপায় নেই। সুতরাং সে বাড়ির চারিদিক ঘিরে নাচতে থাকে, এবং শেষে একটা নালার মধ্যে নেমে পরম সন্তোষে হাসিমুখে অগ্নিকাণ্ড দেখতে থাকে।

আগুনের জিহ্বা আকাশের চূড়োয় গিয়ে ওঠে এবং দূরের গ্রাম কাছের গ্রামের বাসিন্দারা তাদের কাঠের বালতি জলের পাম্প্ লাঠি সড়কি, কাঁথা কম্বল

নিয়ে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসে। বাতাস যত বেড়ে ওঠে আগুনের চুম্বন আকাশের দিকে তত উঠতে থাকে ; দূরের গ্রামে গ্রামে দমকলের ঘণ্টা শোনা যায়।

"এ তো বুড়ো চু চুয়ানের বাড়ি। ওকে বাঁচাতে হবে। ওকে বাঁচাতে হবে।"

চারিদিকে শুধু এই কথাই ইউয়ান ৎস শুনতে থাকে। নালার মধ্যে থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ইউয়ান ৎস হাত নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে আসে, আর বলতে থাকে—"বুড়ো চু চুয়ান তো নয়। ওখানে মা সোয়ান-পন আর চাও'র বৌ খানা খাচ্ছে। বুড়ো চু চুয়ানকে তো ঠাণ্ডার মধ্যে বার করে দিয়েছে।"

একটা তুমুল হাসির রোল ওঠে এবং ক্রমে সেই হাসির গতি মনে হয় যেন আগুনের চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠছে।

ইউয়ান ৎস বলতে থাকে—"আমার কি মনে হয় জানো ? খাংটা ওরা খুব বেশি গরম করেছিল, তাতেই পুড়েছে।"

যারা আগুন নেভাতে এসেছিল তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে অগ্নিশিখার আনন্দে মশগুল হয়ে। কেউ কেউ বলে,—এতগুলি জ্বালানি কাঠ এমন দুটো অপদার্থের জন্যে নষ্ট হল, এ বড় দুঃখের কথা। যে-বুড়ো এত কষ্ট করে কাঠগুলি সংগ্রহ করেছে তার জন্যেও দুঃখ করে সকলে। তা হলেও এমন পরিতৃপ্তি তারা সারা জীবনে কখনও পায় নি।

সকলেই স্বীকার করে খাসা আগুন হয়েছে। কিন্তু তবু হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটে যার ফলে দেখা যায় সমস্ত জিনিসটার মধ্যে মস্ত একটা খুঁৎ রয়ে গেছে। দেখা যায় বুড়ো চু চুয়ান তার তুলো-ভরা কোর্তার বোতাম খুলে প্রজাপতির ডানার মতো হাত দুটো লট্‌পট্ করতে করতে পাগলের মতো আগুনের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

"বাঘা! বাঘা!" বলে সে চীৎকার করতে থাকে।

ইউয়ান ৎস হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে যায়।

"বাঘা কি ভিতরে নাকি ? বাঘা ?" সে বুড়োর কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকে। বুড়ো যেন শুধু একটিবার বলে 'না'—এ-ছাড়া সে আর কিছুই শুনতে চায় না বুড়োর কাছ থেকে। কিন্তু এখন তারও মনে পড়ে যায় যে সে দেখেছে বাঘাকে ভিতরের ঘরে জ্বালানি কাঠের নিচে বেঁধে রাখা হয়েছে। বুড়ো কেবল নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। লোকে তাকে জোর করে ধরে না রাখলে সে নিশ্চয়ই কুকুরটার জন্যে আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

আগুনের শিখা রুষিয়ে ওঠে। পাতাগুলো আধখানা করে লাল হয়ে উপর দিকে আকাশে উঠতে থাকে। একটা গলন্ত লাভার স্রোত কোন এক দুর্জ্ঞেয় উপায়ে কালচে-বেগুনি আকাশের পটে ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। চারিদিকে জলন্ত ছাই ছড়িয়ে দিয়ে খামারের পশ্চিম দেয়ালটা গন্‌গনে লাল হয়ে ধ্বসে পড়তে আরম্ভ করে। পোড়া চুলের গন্ধ পাওয়া যায় যেন। বুড়ো চু চুয়ানের মনে হয় বাঘা হয়তো ইতিমধ্যেই পুড়ে মরেছে। সে পাগলের মতো হয়ে যায়।

"বাঘাকে আমি বাঁচাবোই!" বলে সে রেগে চেঁচিয়ে ওঠে। লোকেরা তাকে আর একবার আগুনের পাশ থেকে টেনে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

মনের যন্ত্রণায় বুড়ো কচি ছেলের মতো কাঁদতে থাকে।

"মা চেন্, জল ঢেলে দাও আমার গায়ে চট্ করে।" কেউ কেউ এতে আপত্তি তোলে এই ভেবে যে লোকটা মারাই যেতে পারে। কিন্তু যখন তাদের বাঘার কথা মনে হয় এবং যখন ভাবে বুড়োর মনে বাঘা কত সুখ দেবে, কত উষ্ণতা আনবে, যখন কুকুরটার সুন্দর চওড়া মুখ আর কাঁধভরা চকচকে সোনার বরণ রোঁয়ার কথা ভাবে তখন সবাই সহানুভূতির নিঃশ্বাস ফেলে।

তারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে থাকে—"না না, কুকুরটাকে বাঁচাতেই হবে।"

সুতরাং মা চেন ও কয়েকজন যুবক ইউয়ান ৎসর কাপড়-চোপড় জলে ভিজিয়ে দেয়, তার কোমরে একটা মোটা ভিজে দড়ি বেঁধে দেয়। বাঘা কাঠের কুঁদোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে মনে পড়ায় তার হাতে একটা ধারালো ছুরিও দিয়ে দেয়। তারপর তারা ইউয়ান ৎসর প্রবেশের পথে চাপা-কল দিয়ে ঠাণ্ডা জল ছড়াতে থাকে। ইউয়ান ৎস আগুন আর ধোঁয়ার আঁধির মধ্যে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করে।

জল নিমেষের মধ্যে বাষ্প হয়ে উপে যায়, আগুন আরো ভীষণ হয়ে ওঠে। যারা দড়ির প্রান্ত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে তারা ইউয়ান ৎসর প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দড়িটা নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে। তারপর আগুনের মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট অদ্ভুত প্রাণী সর্বাঙ্গে আগুনের ফিন্‌কি মেখে ছুটে বেরিয়ে আসে এবং সকলেই বুঝতে পারে যে বাঘা বেঁচেছে। একটা প্রচণ্ড উল্লাসের ধ্বনি ওঠে। কুকুরটাকে একটা কম্বলে মুড়ে সযত্নে বুড়ো চু চুয়ানের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু তখনও ইউয়ান ৎসর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

অবশেষে ইউয়ান ৎস হোঁচট খেতে খেতে আধকানা অবস্থায়, পুড়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে এবং নানা জায়গায় ফোস্কা আর ক্ষত নিয়ে আবির্ভূত হয়। তাকেও কম্বল চাপা দেওয়া হয়। বাঘা তখন এক হাত থেকে আর এক হাতে চালান হতে থাকে—ঠিক যেন একদল স্নেহ-ভরা মেয়ের কোলে ফুটফুটে সুন্দর খোকাটি। তার অল্প একটুখানি রোঁয়া পুড়ে গেছে কিন্তু কোথাও কোনো ক্ষত হয় নি।

ইউয়ান ৎস তার কালসিটে-পড়া চোখ খুলে বলে—"বাঘা কোথায়? সে কি বেঁচেছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বেঁচেছে। সগৌরবে ফিরে এসেছে।" এই বলে বুড়ো জবাব দেয়।

ইউয়ান ৎস অল্প হাসে—একটা সন্তোষ-ভরা হাসি—অদ্ভুত রকমের। তার ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। ইউয়ান ৎসর কাঁপুনি ধরে। বুড়ো চু চুয়ানের চোখ থেকে জল ঝরতে থাকে। দুঃখের অশ্রু নয়, গভীর সহানুভূতি এবং দয়ার অশ্রু। সে নিজের মনে বলতে থাকে—"আমরা অনেক কষ্ট পেয়েছি। অনেক হয়েছে!"

ইতিমধ্যে আগুন জ্বলে চলে আনন্দে। জলন্ত কয়লাগুলো আগুন থেকে টেনে বার করে নেওয়া হয়। লোকে তার চারিদিক ঘিরে নাচতে থাকে। তাদের হাসি এবং চীৎকার যেন সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো উঠতে-নামতে থাকে। বুড়ো চু চুয়ান তার নাক কুঁচকে বাঘাকে বুকে জাপটে ধরে। ইউয়ান ৎস তার দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসে। অনেকক্ষণ পরে পুড়ে পুড়ে আগুন নিভে যায়; লোকেরা তাদের বিদ্বেষটা রসিয়ে উপভোগ করে।

ইউয়ান ৎস বলে—"এইবার ঠিক হয়েছে। আমাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়েছে।"

আমার কাকা ও তাঁর গরু

ইয়ে চুন-চিয়েন

ইয়ে চুন-চিয়েন-এর সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় জাপানী যুদ্ধের সময়। ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের সংবাদ-সচিবের দপ্তরের আমন্ত্রণে সভাসমিতি ও কারখানায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। সেই সময় তাঁর ইংরাজিতে লেখা ছোটগল্পের বই বিলেতে ছাপা হয়। এখন ইয়ে চুন-চিয়েন পেইচিং-এর ইংরাজি মাসিক 'চাইনিজ লিটারেচার'-এর সহ-সম্পাদক।

ইয়াংসি নদীর উপকূলে মধ্য-চীনে ছেলেবেলায় আমি কাকার হালের গরুটির সঙ্গে কত খেলা করেছি। গরুটি ছিল ভারি শান্ত আর ভারি পরিশ্রমী, ঠিক যেন গ্রামের চাষীদের ঘরের মেয়েদের মত, তফাত শুধু তাদের মত অমন কেবল বক্‌বক্ করত না। যখন বেচারা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন মাথাটা তার নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিত, আস্তে আস্তে জাবর কাটত আর তার মুখের চারিদিকে ফেনা এসে জমত। কিন্তু হালটা টানতে কখনো সে আপত্তি জানাত না। শুধু মাঝে মাঝে তার ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে আমার কাকার দিকে তার শান্ত চোখ মেলে তাকাত। কাকা থাকতেন হাল ধরে দাঁড়িয়ে। তিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট চাষী—তার সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে তার দেরি হত না। হাল থেকে তাঁর গরুটিকে খুলে আমার হাতে দিয়ে বলতেন, "যাও এবার একে নিয়ে গিয়ে এর সঙ্গে খেলা কর গে।" বলে তিনি নিজে ড্রাগনের মত দেখতে একটা লম্বা অদ্ভুত আকৃতির বাঁশের শিকড়ের চোঙ্ বার করে ধোঁয়া খেতে বসতেন একটা পাথরের উপর ধানের ক্ষেতের পাশে।

প্রথমে আমি তাকে নিয়ে যেতুম নদীর ধারে; সেখানে সে জলে মুখ দিয়ে প্রাণ ভরে জল খেয়ে নিত, অন্ততঃ দশ মিনিট ধরে। আস্তে আস্তে যেমন সে মুখ তুলত, তার কস্ বেয়ে জল ঝরে পড়ত নদীর পৃষ্ঠে—জল পড়ার টুংটাং শব্দটা শোনাতো যেন দূর-থেকে-আসা ভারবাহী ঘোড়ার গলার ঘণ্টা। স্রোতস্বিনী নদীর ওপারে যে সবুজ পাহাড় আর তৃণভূমি তারই দিকে কাকার গরু তার ধীর দৃষ্টি মেলে ধরত।

আমাদের এই তিন হাজার মাইল লম্বা ইয়াংসি নদী মধ্য-চীনের উপত্যকায় পৌঁছে স্ফীত হতে হতে এমন বিস্তৃত হয়ে পড়ে যে এ-কূলে দাঁড়িয়ে ও-কূলের সবুজ মাঠ পাহাড় স্পষ্ট দেখা যায় না—শুধু মনে হয় আবছায়া যাদুময় একটা কিছু। গরুটার এই সবের জন্যে কেমন যেন একটা তৃষ্ণা, কেমন যেন এক রহস্যময় অনুভূতি ছিল বলে মনে হত। একবার এমনি সে নদীর ওপারে চোখ মেলে ধরে গম্ভীর গলায় একটানা ডাক দিতে শুরু করলে।

আমার কাকা উঠে তার কাছে এগিয়ে এসে বল্লেন—"পাগলামি করিস্‌নে—ওদিকে কোনো ষাঁড় নেই।" তার মসৃণ পিঠে আদর করে একটা থাবড়া মেরে বল্লেন—"অমন একটুতেই উত্তেজিত হতে নেই। তোমার মত এমন ভাবপ্রবণ মেয়েমানুষ আমি জীবনে কখনো দেখি নি।" বলে তাকে আবার হালে বাঁধতেন। সঙ্গে সঙ্গে সে আপনা থেকেই অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই ধীর শান্তভাবে সেই কতকালের পুরোনো জমির উপর লাঙ্গল টানতে থাকত।

কাকা ছিলেন অভিজ্ঞ চাষী। তিনি জমি বুঝতেন, যে-জন্তুকে খাটাতেন তাকেও বুঝতেন। শীত যখন শেষ হয়ে যেত তিনি জমি থেকে একমুঠো মাটি তুলে নিতেন; তুলে নিয়ে এক হাতের তেলোয় মাটিটা রেখে অন্য হাতের বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে গুঁড়ো করে গুঁড়োটা ভালো করে শুঁকতেন। শুঁকেই বলতে পারতেন জমিতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে কি না; অর্থাৎ এবারে জমিতে বীজ বুনে লাভ আছে কি না। বীজ বোনা হয়ে যাবার পর জলেব মধ্যে মাটির রঙ দেখেই তিনি বুঝতে পারতেন জমিতে আরও পুষ্টির প্রয়োজন আছে কি না—আর ঠিক কি ধরণের পুষ্টির প্রয়োজন। তিনি বলতেন—"শুয়োরের ময়লা বড্ড কড়া হবে। গরুর গোবর একভাগ আর জল দুভাগ এতেই যথেষ্ট হবে। তাঁর কখনও ভুল হয় নি।

কিন্তু আমার কাকার নিজের কোনো জমি ছিল না। আমার ঠাকুর্দাও ছিলেন কৃষাণ। ঠিক আমার কাকারই মত তিনিও ছিলেন কর্মঠ, যে জমি চাষ করতেন সে জমিও যেমন বুঝতেন, যে গরু খাটাতেন সে গরুও বুঝতেন তেমনি। কিন্তু তিনি মারা যান নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে। যে-জমিদারের জমি তিনি চাষ করতেন তাঁকে ফসলের দুভাগ দিতে হত খাজনা হিসেবে। যে ছোট্ট কুটিরটি রেখে তিনি মারা যান সেটি জমিদারের কাছে বিক্রি করে তবে তাঁর মৃতদেহের জন্যে শবাধার কেনবার পয়সা জোটে। যদিও তিনি ছিলেন অতি সৎ পরিশ্রমী চাষী কিন্তু তিনি যে আর কিছুই রেখে যেতে পারেন নি—এ

রহস্যের কোনো কিনারা আমি আজ অবধি পাই নি। কাজেই আমার কাকার যখন মাত্র দশ বছর বয়েস তখন থেকেই প্রথমে গরু চরিয়ে এবং তারপর চাষী-মজুর হয়ে নিজের পেটের ভাত নিজেকেই উপায় করতে হয়েছে। পঁচিশ বছর হাড়-ভাঙা খাটুনির পর তিনি যা পয়সা জমাতে পেরেছিলেন তাতে করে গো-হাটা থেকে একটি ছোট্ট বাছুর কিনতে পেরেছিলেন। মা যেমন তার শিশুকে লালন করেন তেমনি তিনি তাঁর বাছুরকে পালন করেছেন। প্রতিদিন ভোরে তিনি তাঁর বাছুরের ওঠবার সঙ্গে ঘুম থেকে উঠেছেন আর রাত্রে তারই সঙ্গে একসঙ্গে ঘুমতে গেছেন একই ছাদের নিচে। প্রতিটি ছটাক মেদ মাংস অস্থি সমেত তিলে তিলে তিনি তাকে বাড়তে দেখেছেন—ধীরে ধীরে সে বিকশিত হয়ে উঠেছে এখনকার এই আকৃতিতে—মসৃন দেহ, নম্র আর একটু যেন লাজুক।

কাজেই তিনি এখন সম্পত্তির মালিক—একটি গরু আছে, তা দিয়ে বিঘা দশেক জমি চাষ করতে পারেন। কিন্তু যদিও তিনি দ্রুত মধ্যবয়সের দিকে এমন কি বৃদ্ধবয়সের দিকে এগিয়ে চলেছেন—কারণ, কঠোর পরিশ্রমের ফলে চাষীরা বড় তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়—তবু আজ অবধি তিনি ঘরে গৃহিনী আনতে পারেন নি।

নিজের মনে তিনি নিজেই বল্লেন—“তাতে কি? যতক্ষণ আমার জমি আছে আর গরু আছে—জরুও আমি পেয়ে যাবো।”

তারপর তিনি স্বপ্ন দেখতে বসতেন একটি সংসারের—ঘরে তাঁর গৃহিনী, রান্না-বান্না করে তাঁকে খাওয়াচ্ছে, তাঁর সঙ্গে শুতে যাচ্ছে। জমিদারের অপমানে অথবা তশিলদারের মার-ধোরে তাঁর চোখে যখন জল আসছে, সেই জল সে মুছিয়ে দিচ্ছে। তারপর তিনি স্বপ্ন দেখেন একটি ছেলের—সে-ই করবে তাঁর বংশ-রক্ষা আর সে চালিয়ে যাবে তাঁর পেশা, তাঁর চাষবাসের কার্য। তিনি বলে ওঠেন—“কিন্তু ওঃ, তাকেও যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পঁচিশ বছর পরিশ্রম করতে হয় একটি বাছুর কেনবার জন্যে, তারপর আরো কুড়ি বছর একটি বৌ পাবার জন্যে……” ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে থাকে। তিনি বোঝেন, তার কপালেও আছে কঠোর পরিশ্রম।

সবে মাত্র তিনি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলবার জন্যে খাটতে আরম্ভ করে দিয়েছেন এমন সময় দক্ষিণ চীনে জাতীয়তাবাদীরা আর মজুররা জাতীয় বিপ্লব শুরু করে দিল। মধ্য চীনে তা এলো একটা ঝড়ের মতো—তাইতে যে-সব জমিদার ম্যাজিস্ট্রেটরা অবিরত গ্রামে তশিলদার পাঠাতেন তাঁরা সেই

ঝড়ের মুখে উড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব হল।

বিপ্লবের ফৌজ থেকে একটি ছেলে গ্রামে এসে গ্রামের চত্বরে দাঁড়িয়ে চাষীদের সম্ভাষণ করে বল্লে—"গুরুভার খাজনা দিতে তোমরা আর রাজী নও তো? তোমরা আর জমিদার চাও না তো?

এ-রকম প্রশ্ন তারা এর আগে কখনও শোনে নি, তাই কেউই তার উত্তর দিতে সাহস করলে না।

তাদের মৌনকে সম্মতির নির্দেশ বলে ধরে নিয়ে সে বল্লে, "বেশ, তাহলে তোমাদের ঘাড়ে আর ওসব চাপাবো না।"

আমার কাকা ঘাড় নেড়ে নিজের মনে বল্লেন—"ভালই, এ মন্দ পরামর্শ নয়।"

ছেলেটি বলে চল্লো—"তাহলে তোমাদের একটা চাষী-সংঘ করতে হবে—নিজেদের রক্ষা করবার জন্যে।"

কাকা মনে মনে বল্লেন—"ওরে বাবা, দরকার নেই। আমার অতো সময় কোথা? জমি ফেলে রাখলে, গরুকে উপোসী রাখলে…আমার চলে কি?" তাঁর গরুর দিকে ফিরে তিনি বলেন—"কি রে, ঠিক বলি নি? চল্ লক্ষ্মী মা, খানিকটা খেটে আসি আয়।"

বলে তিনি তাঁর গরু নিয়ে ক্ষেতে চলে গেলেন।

সংঘের কাজ করবার সময় থাকুক আর নাই থাকুক তাঁকে একজন সভ্য করা হল। প্রতি সপ্তাহে এক বেলা তাঁকে গ্রামের চত্বরে সাধারণ অধিবেশনে থাকতে হত; আর একদিনের একবেলা শহরে যেখানে বড় বড় জমিদারেরা থাকেন সেখানে গিয়ে কুচ-কাওয়াজ করতে হত, আর একবেলা নবীন বিপ্লবীদের বক্তৃতা শুনে কাটাতে হত।

এ-সবই তাঁর লাগত একঘেঁয়ে, আর মনে হত সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যাই হোক জমিদাররা ভয়ে পালিয়েছিল। কয়েকটা তশিলদার গুলি খেয়ে মারাও গেল। গ্রামীলদের মনে শান্তি এল আগের চেয়ে। আমার কাকা এই নতুন আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কঠিন বোধ করতে লাগলেন—"আচ্ছা বেশ, আমার গরু নিয়ে আমার ক্ষেতে যতদিন কাজ করতে…পারি…"

কিন্তু শীঘ্রই শহর থেকে নানারকম উল্টো-পাল্টা খবর আসতে লাগলো। কাকা বড় গোলমালে পড়ে গেলেন—তিনি কোনোদিনই রাজনীতি বুঝতেন না। শোনা গেল বিপ্লবী শক্তি দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে; নতুন সরকার

নবীনদের অনেককেই বিতাড়িত করেছেন ; আর নতুন আর পুরাতন শক্তির মধ্যে রীতিমত লড়াই চলেছে। শীঘ্রই চাষীদের সকলের হাতে বন্দুক দেওয়া হল, আর তাদের সংঘের নতুন নামকরণ হল "আত্মরক্ষা বাহিনী।" সমস্ত গ্রামটাই যেন এক বৃহৎ পরিবাবে পরিণত হল। সেই পরিবারেব সকলেরই রইল জমির উপর অধিকার। সকলেই এক হয়ে চাষের কাজে হাত লাগাল। গ্রামের নাপিত হল তাদেব সভাপতি আর দুজন নবীন বিপ্লবী তাদের পরামর্শদাতা।

নাপিত ভায়া গ্রামের চত্বরে দাঁডিয়ে উত্তেজিত স্বরে চীৎকার করে বল্লেন—"গ্রামের যত জমি সব হচ্ছে এখন আমাদের সার্বজনীন সম্পত্তি।" সকলে শুনে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল, কারণ নাপিত এর আগে কখনও প্রকাশ্য জায়গায় পাঁচজনের সামনে দাঁডিয়ে চীৎকার করতে সাহস করে নি। বেচারা ছিল এত গরীব যে একটা আস্তাবলেও তার মাথা গোঁজবার ঠাঁই ছিল না। নাপিত বল্লে—"সবই এখন আমাদের সকলের !"

আমার কাকা আপত্তি করে উঠলেন। তিনি তখনও জানতেন না যে নাপিত গ্রাম-সংঘের সভাপতি হয়েছে ; তিনি বল্লেন—"না হে, নাপিত ভায়া, আমার গরুটি কিন্তু নয়। বাচ্ছা বয়েস থেকে আমি তাকে মানুষ করেছি !"

আমার কাকা কী বলছেন না-বলছেন তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামালো না, কারণ ঠিক তখনই কাছের পাহাড়গুলি থেকে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল।

নবীন বিপ্লবীদের একজন বক্তৃতা দিয়ে উঠল—"আমাদের ধ্বংস করবার জন্য সাবেকি আমলের সৈন্যরা আসছে। নিজের প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে ওদের সঙ্গে আমাদের লড়তে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে জনতা পাগলের মতো ছুটে চল্লো পাহাড়ের দিকে—তাদের পুরোভাগে নাপিতকে নিয়ে। আমার কাকা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন একা গ্রামের চত্বরে। কী যে ব্যাপার কিছুই তিনি বুঝলেন না। গ্রামটি তো ঠিক সেই আগের দিনেরই গ্রাম আছে। সেই কালো টালির ছাদগুলি। মাঝে মাঝে খড়ের চাল ; সেই দেবদারু গাছগুলি। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির মাঝে পাথরে-বাঁধানো রাস্তাগুলি, এ-সবের তো কোনই পরিবর্তন হয় নি, আজন্ম তিনি যেমন দেখে আসছেন তেমনিই আছে। কিন্তু মানুষগুলি বদলে গেছে। নাপিত আর তার মত লোকেরা একেবারে যেন ক্ষেপে গেছে। "কেমন করে হল এটা ?" নিজেকে তিনি নিজেই এই প্রশ্ন করলেন, কিন্তু

কোনো উত্তর পেলেন না। অশান্ত চঞ্চল হৃদয়ে তিনি তাঁর গরুকে নিয়ে গ্রামের অপর প্রান্তে নিরাপদ জায়গায় চলে গেলেন।

বন্দুক ছোঁড়া চল্লো প্রায় দু ঘণ্টা ধরে। তারপর সব চুপ হয়ে গেল। গ্রামীলরা সব নিঃশব্দে ফিরে এল—মুখে একটি কথা নেই। পরামর্শদাতা দুটি অদৃশ্য হয়েছেন। নাপিত ভায়াও আর নেই। কারুরই কথা কইবার মন নেই। কেমন নিঃসঙ্গ বোধ করে কাকা তাঁর গরু নিয়ে তাঁর ক্ষেতে গেলেন; দেখতে গেলেন তাঁর নিজের হাতে-লাগানো ধান গাছগুলি কেমন হয়েছে—এই দুটি হাত তাঁর দশ বছর বয়েস থেকে মাটির কাজে পোক্ত হয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখলেন ক্ষেতের কিনারায় নাপিতের মৃতদেহ পড়ে আছে বন্দুকের গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে। এটা কি হল? তাঁর নিজের জমিতে এমন ভাবে একজন মানুষকে মরতে তিনি কখনো দেখেন নি। রক্ত পড়ে জমির রংটা কেমন বদলে গিয়েছে। কাকার মনে হল সেই মৃত্তিকা জমির ফসলকে প্রভাবিত করবে। তিনি বল্লেন—"আমার পুরোনো বন্ধু নাপিতের রক্তে পুষ্ট চালগুলি কেমন করে আমি খাব?" বলে তিনি উত্তরের জন্যে তাঁর গরুর দিকে তাকালেন। গরুটি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল বোকার মত তাঁর চোখের দিকে চেয়ে। নিঃশব্দে তাঁরা দুজনে পরস্পরকে দেখতে লাগলেন। অবশেষে কি কারণে তিনি নিজেই জানেন না, কাকা হঠাৎ কেঁদে উঠলেন। এর আগে তিনি জীবনে কখনো কাঁদেন নি, যখন আমার ঠাকুর্দা মারা যান তখনও পর্যন্ত না।

তিনি যখন গ্রামে ফিরে এলেন তার আগেই সৈন্যদল গ্রাম দখল করে নিয়েছে। কমার্ডা বল্লেন—"এ মহল্লাটা হচ্ছে ডাকাতদের। দাও গ্রামে আগুন লাগিয়ে।" কয়েকজন সৈনিক খড়ের চালে জ্বলন্ত মশাল ফেলতে লাগল। ভাগ্যক্রমে সৈন্যের দল বেশীক্ষণ গ্রামে রইল না। তারা অন্যান্য মহল্লায় চলে গেল আত্মরক্ষা বাহিনীকে ভেঙে দেবার জন্যে। গ্রামবাসীরা ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিল, নইলে আগুনে পুড়ে সমস্ত গ্রামই ধ্বংস হয়ে যেত। কাকার ঘরের চাল সিকিভাগ পুড়ে গিয়েছিল, তিনি খড় দিয়ে তা কোনোরকমে সারিয়ে নিলেন। এইতে তাঁর তিনটে দিন লেগে গেল। এই তিন দিন তাঁর গরু গ্রামের কাছে নেড়া পাহাড়ে নিজে নিজেই চরে বেড়ালো, বিশেষ কিছু খেতে পেলে না।

কাকা যখন দেখলেন, তার পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে, তিনি বল্লেন—"আহা

আমার বেচারা রে!” তারপর তাঁর মনে পড়ল তাঁর ধানক্ষেতের ধানের কথা। নাপিতের রক্তে তা রঞ্জিত। তিনি তা মুখে দিতে পারবেন না। তখন আবার তিনি বল্লেন—“আহা আমার বেচারা রে!”

গ্রামবাসীরা সবেমাত্র তাদের ঘরগুলিকে সারিয়ে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে আবার কেমন করে জীবন আরম্ভ করা যায়, ঠিক সেই সময় একদল ‘পার্টিসান’ যোদ্ধা এসে গ্রামে উপস্থিত হল। তারা সব চাষী—কাঁধে বন্দুক। তাদের সঙ্গে আরো কয়েকটি অল্পবয়স্ক ছেলে। সেই আগেকার পরামর্শ-দাতাদের মতো দেখতে। তাদের মধ্যে একজন গ্রামের চত্বরে দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীদের সম্ভাষণ করে বল্লে—“সামরিক সৈন্যদল আমাদের নির্মূল করবার, আমাদের আন্দোলনকে দমন করবার চেষ্টা করছে। আমাদের নিজেদের স্বার্থকে আমাদের নিজশক্তি দিয়েই রক্ষা করতে হবে।”

গ্রামবাসীরাও পার্টিসান হয়ে পড়ে সামরিক শিক্ষা নিতে থাকল। আমার কাকাকেও তাদেরই একজন করা হল। প্রতিদিন দু-তিন ঘণ্টা তিনি রাইফেল বন্দুক ছুঁড়তে এবং কেমন করে মানুষ মারতে হয় তাই শিখতেন। যতবারই তিনি বন্দুক ঘাঁটতেন, তাঁর মনে পড়ে যেত বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া নাপিতের মৃতদেহ তাঁর ক্ষেতের কিনারায় পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাত কাঁপতে থাকত, বুক ধড়ফড় করত। এক সপ্তাহ শিক্ষা পাবার পর তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। গ্রাম সংঘের নতুন পরামর্শদাতার কাছে গিয়ে বল্লেন—“বন্দুক ছোঁড়া আমার দ্বারা হবে না মশায়—কোনোমতেই আমি পারব না। আমার এই পুরোনো রীতি পুরোনো পদ্ধতিতে গড়া হৃদয়ে মানুষ মারবার শিক্ষা ঢুকবে না।” বলে তিনি বন্দুক ফিরিয়ে দিলেন।

পরামর্শদাতা বল্লেন—“বেশ তাই হোক। আমরা লোককে জোর করে যোদ্ধা করতে চাই না।”

আমার কাকা গরু নিয়ে চরাতে চলে গেলেন। ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে তিনি কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন—একবার দেখতে লাগলেন রোদের দিকে একবার তাঁর গরুর দিকে। তাঁর গরু চরে-বেড়ানো আর লাঙল-টানা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। তাঁর ক্ষেতের মাটি মানুষের রক্তে রাঙা হয়ে আছে—সেখানে তাঁর চাষ করতে যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তাঁর জাত-ব্যবসা হচ্ছে মাটি চষা। তাঁর হাত-পা চুপ করে বসে থাকতে অভ্যস্ত নয়, তাঁর মন ধান চাষের কথা ভুলবে কি করে? এখন যেমন তাঁর দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্তের

মত ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন কখনো তাঁর অভ্যেস ছিল না। এই প্রথম তাঁর বড় বিশ্রী রকম মন খারাপ হতে থাকে।

কিছুদিন পরে সাবেকি সৈন্যদল আবার ফিরে এল। গ্রামবাসীরা লড়াই করতে এগিয়ে গেল। এবারে যুদ্ধটা হল অতি ভীষণ, কারণ গ্রামবাসীরা এখন বন্দুক ছুঁড়তে শিখে নিয়েছে। আর তাদের লড়াইএর অভিজ্ঞতা থাকায় তারা বেশ ভালো করেই লড়ল। তারা সকলেই নাপিতের মত পাগল হয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে থাকল—একটা সংঘর্ষ হবে শুধু এরই সম্ভাবনায় তারা উন্মত্ত। কিন্তু সাবেকি সৈন্যরা তাদের বড় বড় কামানের সাহায্যে গ্রামের কাছে এগিয়ে এল। ছাদের উপর দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে গুলি ছুটতে থাকল, মর্টার গোলা এসে ক্ষেতের উপর পড়ে গাড়ার সৃষ্টি করল। আমার কাকা দু হাতে কান ঢেকে একটা পাহাড়ের ধারে পাথরের গুহার মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। যুদ্ধ তিনি বোঝেন না, তার শব্দও তিনি শুনতে চান না। দিনের শেষে গ্রামবাসীরা আক্রমনকারী সৈন্যদলকে তারা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে হটিয়ে দিতে সক্ষম হল। আমার কাকা গুঁড়ি মেরে গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন—যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে। প্রথমেই তিনি খুঁজতে গেলেন তাঁর গরুকে, যাকে পাহাড়ে চরতে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। প্রথমটা তাকে খুঁজে পেলেন :না। যখন অন্ধকার হয়ে আসছে, সেই সময় একটা ঝোপের আড়ালে তিনি দেখতে পেলেন একটা গরুর মৃতদেহ রক্তের স্রোতে ভাসছে। ঠিক গ্রামের নাপিতের মতো এরও পেট গুলি লেগে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কাকাকে এগিয়ে আসতে দেখলেই গরুটা ধীরে ধীরে তার লম্বা মসৃণ লেজটি নাড়ত—সেই লেজটি না দেখলে তিনি গরুটাকে নিজের বলে চিনতে পারতেন না। কাকার কান্না এল কিন্তু কাঁদতে পারলেন না। জন্তুটা ছিল কত সুন্দর, কেমন লাজ-নম্র, এখন যেন তাকানো যায় না এত কুৎসিত। তবু তাঁর মনে হল সে যেন তাঁরই শিশু, তাঁরই সৃষ্টি, যাকে তিনি নিজের হাতে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করেছেন।

সে-রাত্রে আমার কাকা চোখের দু পাতা এক করতে পারলেন না। যে-গরুটিকে তিনি তাঁর পঁচিশ বছরের গুরু পরিশ্রমের সঞ্চয় দিয়ে কিনেছিলেন তার কথা ভাবতে থাকলেন। যে-রক্তমাখা জমির চাল তিনি খেতে পারবেন না সেই জমির কথা ভাবলেন আর ভাবলেন সেই গৃহিনীর কথা যাকে তিনি হয়ত আর কোনোদিনই পাবেন না! চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ দুটো খোলা

রেখে এই সবের কথা যতক্ষণ না দিনের আলো ফোটে তিনি চিন্তা করতে থাকলেন। তারপর তিনি পাগলের মতো লাফিয়ে উঠে সোজা চলে গেলেন 'গ্রাম্য বৈঠকে'।

পরামর্শদাতাকে কাকা বল্লেন—"দিন তো মশায়, আমায় একটা বন্দুক।"

ছেলেটি জিজ্ঞেস করলে—"হঠাৎ কি জন্যে?"

—"লড়াই করবার জন্যে।"

ছেলেটির মনে পড়ে তিনি সামরিক শিক্ষা নিতে রাজি হন্ নি। তাই অবিশ্বাসের স্বরে শুধোলো—"সত্যিই কি আপনি লড়বেন, ঠিক তো?"

কাকা দৃঢ়স্বরে বল্লেন—"নিশ্চয়ই।" তারপর গলাটা একটু খাটো করে, যেন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কইছেন এই ভাবে চোখের দৃষ্টি তাঁর সেই প্রকাণ্ড চাষাড়ে হাতের চেটোর উপর নত করে বলতে থাকেন—"এখন হচ্ছে অস্থিরতার যুগ। এখন না আছে গরু, না আছে জোতজমি, না আছে গৃহিনী…………"

ছেলেটি অল্পক্ষণ আমার কাকার রোদে-জলে-পোড়া তামাটে মুখের দিকে নিরীক্ষণ করে দেখলে। সেই মুখে যদিও খানিকটা বিকারের ভাব কিন্তু যে কোনো চাষীর মতো তাঁর অবয়বও অকপট গম্ভীর। সে তাঁকে বন্দুক দেওয়াই স্থির করল।

দুপুরবেলা সাবেকি সৈন্যদের তরফ থেকে আর একটা আক্রমন এল। সমস্ত গ্রামবাসী জড়ো হয়ে তাদের বাধা দিতে গেল। আমার কাকা গেলেন সবার আগে, নাপিত যেমন উত্তেজিত ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনি করে।

এ-যুদ্ধক্ষেত্রে না ছিল ট্রেঞ্চ, না ছিল কাঁটাতারের বেড়া, কাজেই কোনো মহড়া ছিল না। চাষী-ফৌজরা গাছের অথবা পাথরের কিংবা যবক্ষেতের মধ্যেকার শুকনো নালার আড়ালে লুকিয়ে যুদ্ধ করছিল। তারা যে প্রচুর গুলি ছুঁড়ছিল তা নয়। যখন কোনো আক্রমণকারী সৈন্য ভূপৃষ্ঠের কোথায় উঁচু কোথায় নীচু না সমঝে এবং কোথায় কে লুকিয়ে আছে না জেনেই অসাবধানে অগ্রসর হচ্ছিল তখনই তারা গুলি ছুঁড়ছিল। প্রায় প্রত্যেকটি আক্রমনকারী শয়তানই এগিয়ে আসবামাত্র, বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল—বেদনায়, চীৎকার করে অথবা নিঃশব্দে।

আমার কাকা লুকিয়ে ছিলেন একটা ছোট্ট টিপির উপরে একটি কবরের

পিছনে। বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম শব্দে তিনি এত মেতে উঠেছিলেন যে তিনিই একমাত্র এলোপাতাড়ি যেদিকে-সেদিকে সশব্দে গুলি ছুঁড়ে চলেছিলেন। বন্দুকের নলটা বারে বারে তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে লাফিয়ে উঠছে আর বাঁটটা এসে ধাক্কা মারছে কাঁধে, এই অনুভূতিতেই তিনি মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্যহীন গুলি ছোঁড়ার ফলে শত্রু শীঘ্রই তাঁর গোপন স্থানের হদিস পেয়ে গেল। তাঁর থেকে দশগজ মাত্র দূরে হঠাৎ একজন সৈনিক আবির্ভূত হল তাঁর মাথার দিকে বন্দুক বাগিয়ে। তিনিও তাঁর বন্দুক সেই সৈনিকের দিকে উঁচিয়ে ধরলেন। সৈনিকটির রোদে-জলে-পোড়া তামাটে মুখ দেখে মনে হল গ্রামের চাষীদের সঙ্গে এর কোনো তফাৎ নেই—শুধু গায়ে একটা য়ুনিফর্ম, এই যা। কাকা নিজেকে নিজে শুধোলেন—"এই শত্রুকে আমায় মারতে হবে?" উত্তর পাবার আগেই তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁকে গুলি করল। তিনি লুটিয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যার দিকে আক্রমনকারী সৈন্যদল হটে যাওয়ার পর যুদ্ধ যখন শেষ হল গ্রামবাসীরা ফেরবার সময় দেখলে আমার কাকাকে পাওয়া যাচ্ছে না। যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে ভালো করে খোঁজবার পর তারা একটা পাহাড়ের ধারে একটা মৃতদেহ পেল—সেটা অনেকটা তাঁর মতো দেখতে। কিন্তু কেউই নিশ্চিত হতে পারলে না—কারণ মৃতদেহের মাথার অর্দ্ধেকটাই উড়ে গেছে।

অবশেষে আমার কাকার প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ চাষী মৃদুস্বরে বল্লে—"দেখছ না, ঐ প্রকাণ্ড হাতের চেটো দুটো। এ ও ছাড়া আর কেউ নয়।"